বিজ্ঞাপন।

যেমন ভূমিতে বীজ বপন করিলে অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষ উৎপাদন করে, আবার সেই বৃক্ষ হইতে বহুসংখ্যক ফল ও বীজ উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ মনুষ্যের ঐহিক কর্ম্ম সমস্ত কর্ম্মবীজ, এবং পৃথিবী কর্ম্মক্ষেত্র। দেশে কোন লোক যেরূপ কার্য্য করিয়া ধনী অথবা যশস্বী হয়, পরবর্ত্তী বংশধরেরা সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে থাকে ; অতএব তাহাতেই জাতীয় চরিত্র গঠিত হয়। এই জন্যই ইতিহাসে জাতীয় অবস্থা ও জীবনচরিতের বারংবার পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে ইতিহাস ও জীবনচরিতের আদর ছিল না ; সুতরাং লিখিত হয় নাই। অতএব তাহার পুনরাবৃত্তি নিরূপণ করা সুকঠিন।

এখন ইতিহাসের আবশ্যকতা লোকে বুঝিয়াছে। রাজপুতনার এবং ভারতবর্ষের নানা স্থানের অসম্পূর্ণ ইতিহাসও বিলক্ষণ সমাদৃত হইতেছে ; তথাপি বাঙ্গালাদেশের ইতিহাস সংগ্রহে যথোচিত চেষ্টা হয় নাই। বাঙ্গালার ইতিহাস নামে যে সকল ইংরাজী ও বাঙ্গালা গ্রন্থ বিদ্যালয়সমূহে পঠিত হয়, তাহা নিতান্ত অসম্পূর্ণ। তাহাতে হিন্দুরাজত্বের কোন বৃত্তান্তই নাই এবং মুসলমান-রাজত্বের সময় বাঙ্গালী হিন্দুদের কিরূপ অবস্থা, আচার, ব্যবহার ও দেশের শাসনপ্রণালীই বা কিরূপ ছিল, তাহার কোনই বিবরণ নাই। অতএব তাদৃশ ইতিহাস পাঠে দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা কিছুই জানা যায় না। প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস না থাকিলেও প্রাচীন আচার ব্যবহার সম্বন্ধে যে সমস্ত গ্রন্থাদি আছে, তদ্দ্বারা সামাজিক অবস্থা মোটামুটি জানা যায়। আধুনিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থাদি হইতেছে। কিন্তু মুসলমানরাজত্বের মধ্যবর্ত্তী কালের রীতিমত ইতিহাস না থাকায়, প্রাচীন অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া কিরূপে বর্ত্তমান অবস্থায় পরিণত হইল, তাহা জানা যায় না। এই সকল অভাব দূরীকরণ জন্য আমি অষ্টাদশ বৎসর পরিশ্রম করিয়া নানাবিষয়ক বিবরণী সংগ্রহ করত এই গ্রন্থ প্রকাশ করিলাম। প্রচলিত ইংরাজী ও পারসী ইতিহাস, পুরাতন জমীদার-দিগের সনদ ও বংশানুক্রমিক কিংবদন্তী, শেখ শুভোদয়া নামক গ্রন্থ, রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের কুলশাস্ত্র, বল্লালচরিত এবং ভট্টকবিতা, এই সমস্ত মিলাইয়া যথাসাধ্য সত্য নির্ণয়পূর্ব্বক এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছি। যেখানে একই ঘটনা সম্বন্ধে মতান্তর আছে, তন্মধ্যে যেটি সত্য বোধ হইল, আমি কেবল তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। যেখানে সত্যাসত্য ঠিক করিতে পারিলাম না, সেখানে কোন তর্ক না করিয়া বিভিন্ন মতগুলি সমস্তই গ্রহণ করিয়াছি। যে সকল স্থানে

হয় নাই। আবার ইহাও দেখা যায় যে, একপ্রকার প্রাণী অন্যপ্রকার প্রাণিগণকে ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ভক্ষ্যপ্রাণীদের সংখ্যা প্রচুর বৃদ্ধি হইলে পর, ভক্ষকপ্রাণিগণের সৃষ্টি হইয়াছে; কেননা, ভক্ষ্য এবং ভক্ষক যদি একই কালে উৎপন্ন হইত, তবে ভক্ষকগণ ভক্ষ্যপ্রাণীদিগকে খাইয়া নিঃশেষ করিত, নতুবা নিজেরাই অনাহারে মরিত। অতএব ইহা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, সমস্ত প্রাণী এক সময়ে বা একদেশে উৎপন্ন হয় নাই। মনুষ্য সম্বন্ধেও ঠিক তদ্রূপ অনুমান যুক্তি ও শাস্ত্রসঙ্গত। যেমন সিংহ, ব্যাঘ্র, গো, মহিষ, শূকর ও কুক্কুরাদি কতকগুলি প্রাণীর সাধারণ নাম পশু; আর পক্ষবিশিষ্ট কাক, বক, হাড়গিলা, চড়ুই প্রভৃতি কতকগুলি প্রাণীর সাধারণ নাম পক্ষী; তদ্রূপ হস্তপদবিশিষ্ট কতকগুলি প্রাণীর সাধারণ নাম মনুষ্য। তাহারা এক আদিপুরুষের সন্তান নহে এবং তাহারা এক দেশে বা এক সময়ে সৃষ্ট হয় নাই। বিভিন্নপ্রকার পশুপক্ষীদিগের আকৃতি, প্রকৃতি ও বর্ণের যতদূর বিভিন্নতা, বিভিন্নজাতীয় মনুষ্যের বিভিন্নতা তদ্রূপ বা তদধিক। একজাতীয় মনুষ্য অন্যজাতীয় মনুষ্যের মাংস ভক্ষণ করিত। সভ্যতা-বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাদৃশ ব্যবহার হ্রাস হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই। অতএব সমস্ত মনুষ্যজাতিকে এক আদিম মানব-দম্পতির সন্তান বলিয়া অনুমান করা যুক্তি, প্রমাণ এবং হিন্দুশাস্ত্র-বিরুদ্ধ। বাগ্‌দি, পোদ, গারো, কুকি প্রভৃতি জাতি বোধ হয় বাঙ্গালা দেশেই সৃষ্ট হইয়াছিল। তাহারা অন্যস্থান হইতে আসিয়া এদেশে বাস করিতেছে, এরূপ কোন প্রমাণ বা প্রবাদ নাই। পক্ষান্তরে, অন্যান্য অনেক জাতীয় লোক যে, বিভিন্ন সময়ে স্থানান্তর হইতে এদেশে আসিয়া বাস করিয়াছে, তাহার প্রমাণ বা কিংবদন্তী পাওয়া যায়। যাহারা দীর্ঘকাল যাবৎ বাঙ্গালাদেশে বাস করিয়া বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করিতেছে, তাহাদের জাতি ও ধর্ম্মগত পার্থক্য সত্ত্বেও একটি সাধারণ নাম "বাঙ্গালী" হইয়াছে।

বাঙ্গালা ভাষা।

সুদীর্ঘকাল আর্য্যপ্রাধান্য হেতু বাঙ্গালা ভাষার অধিকাংশ শব্দই আর্য্যভাষামূলক। মুসলমান-রাজত্বকালে বহুল পারসী ও আরবী শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে।

ইউরোপীয়েরা অনুমান করেন যে, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রনদ-প্রবাহিত মৃত্তিকা দ্বারা বাঙ্গালা দেশের দক্ষিণ ভাগ নূতন উৎপন্ন হইয়াছে। সেই অনুমান প্রকৃত বলিয়া

বোধ হয় না। কেননা কালীঘাট পীঠস্থানের নাম অতি প্রাচীন শৈবপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। বরং আমি অনুমান করি যে, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মহানদী, গোদাবরী, কাবেরী, ঐরাবতী প্রভৃতি নদীর স্রোতে মহাদেশের কতক ভূমি ভগ্ন হইয়া বঙ্গোপসাগর উৎপন্ন হইয়াছে। সেই সকল মৃত্তিকা সমুদ্রে চালিত হইয়া স্থানান্তরে দ্বীপ উৎপন্ন হইয়াছে। আমার এই অনুমান যে যুক্তিসঙ্গত, তাহা অন্যান্য বৃহৎ নদীর মোহনার প্রতি দৃষ্টি করিলেই বোধগম্য হয়। নর্ম্মদা নদীর মুখে খাম্বাজ উপসাগর হইয়াছে, ইউফ্রেটিস নদীর মুখে পারস্য উপসাগর হইয়াছে, এবং মীনাম ও মেকিয়াং নদী দ্বারা শ্যাম উপসাগর হইয়াছে। এইরূপ প্রত্যেক বেগবতী নদীর মুখে এক একটি ছোট বড় উপসাগর হইয়াছে। নদীর এক স্থান ভাঙ্গে, এবং সেই মাটির দ্বারা অন্য স্থানে চড়া পড়ে। সুতরাং নদী দ্বারা অতি অল্পই মৃত্তিকা সাগরসঙ্গমে নীত হয়। তদ্দ্বারা কোন প্রকাণ্ড ভূখণ্ড উৎপন্ন হয় না। যদি নদীর বালুকা দ্বারা দেশের সীমা বৃদ্ধি হইত, তবে হোয়াংহো, ইয়াংসিকিয়াং নদ দ্বারা চীনের সীমা বৃদ্ধি হইত। নীল নদ, আমেজন, মিসিসিপী প্রভৃতি নদ নদী দ্বারাও অনেক দেশ উৎপন্ন হইত। কিন্তু সর্ব্বত্রই যখন নদীর মোহনায় ভূভাগ বৃদ্ধি না হইয়া বরং সাগরের সীমাই বৃদ্ধি হয়, তখন নদীসমূহের বেগে বঙ্গোপসাগর উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমান করাই সমধিক সঙ্গত। ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন দেশ, ইহার প্রত্যেক স্থানের অবস্থা বারংবার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন যেখানে নিবিড় অরণ্য, পূর্ব্বে কোন সময়ে তথায় মহাসমৃদ্ধ নগর ছিল, তাহার প্রমাণও পাওয়া যায়। সুন্দরবনের স্থানে স্থানেও তদ্রূপ প্রাচীন পুরীর ভগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। তজ্জন্য অনুমান হয় যে, ঐ সকল স্থানেও পূর্ব্বে জনপদ ছিল; পরে মগ ও পর্টুগিজদের দৌরাত্ম্যে ঐ স্থানের অধিবাসিবর্গ স্থানান্তর যাওয়াতে, তদবধি ঐ স্থান জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। ভাগীরথীর সাগরসঙ্গমস্থলে কোন জঙ্গল থাকার বিষয় রামায়ণে উল্লেখ নাই। সুতরাং সুন্দর জনপদ যে দস্যুপীড়নে অধুনা অরণ্যে পরিণত হইয়াছে, ইহাই বিশ্বাসযোগ্য।

মগধ দেশে চন্দ্র গুপ্ত নামে শূদ্রজাতীয় এক মহাবল পরাক্রান্ত সম্রাট্ ছিলেন। কাশীধাম হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তিনি ক্ষত্রিয়দিগের সহিত বৈবাহিক আদান

বাঙ্গালা দেশে ক্ষত্রিয় না থাকার হেতু।

প্রদান করিয়া ক্ষত্রিয়দলে মিলিতে উৎসুক ছিলেন। ক্ষত্রিয়েরা তাঁহার সহ এরূপ আদান প্রদানে ঘৃণা প্রকাশ করায় তিনি দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায় ক্ষত্র-বিনাশে ব্রতী হইয়াছিলেন। বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয় তাঁহা কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল, কতক দেশান্তরে পলায়ন করিয়াছিল। অবশিষ্ট যাহারা তাঁহার বাধ্য হইয়াছিল, তাহারা ক্ষত্রসমাজ হইতে বিচ্যুত হইয়া শূদ্রমধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। এজন্য মগধ-সাম্রাজ্যে কোন বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় ছিল না। বৌদ্ধ বিনাশ ও মগধ-সাম্রাজ্য ধ্বংসের পর ক্ষত্রিয়েরা কাশী, মগধ এবং মিথিলার অধিকাংশ স্থান পুনরায় দখল করিয়াছিল। সেই জন্য ঐ সকল স্থানে পুনরায় ক্ষত্রিয়ের আবাস হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে ক্ষত্রিয়-আধিপত্য না হওয়ায় তথায় পুনরায় ক্ষত্রিয়দের বসতি হয় নাই।

করদ রাজ্য।

আধুনিক সম্রাট্‌গণ তাঁহাদের বিশাল সাম্রাজ্যের দূরবর্ত্তী প্রদেশ শাসনার্থ বেতনভোগী অস্থায়ী শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া থাকেন। প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্রাট্‌দের সময়ে এরূপ রীতি ছিল না। তাঁহারা দূরবর্ত্তী প্রদেশ শাসন জন্য, করদ রাজা নিযুক্ত করিতেন। তৎকালে প্রজার বার্ষিক লভ্যের ⅙ ষষ্ঠাংশ রাজস্ব রূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। করদ-রাজ্যের মধ্যে সেই হারে যে রাজস্ব আদায় হইত, করদ রাজগণ তাহার চতুর্থাংশ নিজ বেতন এবং দশমাংশ আদায়ের ব্যয়স্বরূপ প্রাপ্ত হইতেন। হিন্দীভাষায় ইহাকেই চৌথ ও সরদশমুখী বলে। অবশিষ্ট $\frac{13}{20}$ ভাগ করদ রাজারা নিজ প্রভুর নিকট প্রেরণ করিতেন। করদ রাজারা পুরুষানুক্রমিক ভূম্যধিকারী ছিলেন। তাঁহাদের উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে কেহ কার্য্যনির্ব্বাহের অযোগ্য হইলে, সম্রাট্‌ তাঁহার কার্য্য চালাইবার জন্য কোন ব্যক্তিকে অস্থায়ী রূপে বেতনভোগী কার্য্যনির্ব্বাহক নিযুক্ত করিতেন। সেই কর্ম্মচারীকে সর্ব্বাধিকারী, সরবরাহকার বা ডিঠা বলিত। ডিঠা ব্যতীত প্রাচীন রাজগণের স্বতন্ত্র বেতন-ভোগী শাসনকর্ত্তা ছিল না। এতদ্ব্যতীত আর একপ্রকার করদ রাজা ছিলেন, তাঁহাদিগকে সম্রাট্‌গণ নূতন নিযুক্ত করিতেন না। কোন দুর্ব্বল রাজা প্রবল পরাক্রান্ত রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার-পূর্ব্বক বার্ষিক কর দিতেন। কিংবা তদনুরূপ অল্পশক্তিশালী রাজা কোন প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার উদ্দেশ্যে সাহায্য পাইবার আশায় অন্য কোন

প্রবল পরাক্রান্ত রাজার আশ্রয় লইয়া তাঁহাকে কর প্রদান করিতেন। এইরূপ করদ রাজগণ বশী রাজা বলিয়া অভিহিত হইতেন। বশী রাজগণ নিজ প্রভুকে যত টাকা কর দিতেন এবং যে যে সর্ত্তের অধীন হইতেন, তাহা সন্ধিপত্র দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইত। বশীদিগের প্রদত্ত করকে অম্লুকর বা নালবন্দী বলে। অম্লুকরের পরিমাণ প্রায়শঃ সমগ্র রাজস্বের ১/৬ ভাগ অপেক্ষা কম হইত।

প্রাকৃত ভাষার উন্নতি।

বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সময়ে মগধ দেশে শূদ্র-সাম্রাজ্য ছিল। সেই শূদ্র সম্রাট্‌গণ দেখিলেন যে, বৌদ্ধধর্ম্মে জাতিভেদ নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত হইলে জাতিভেদ উঠিয়া যাইবে। জাতিভেদ উঠিয়া গেলে শূদ্র সম্রাট্ বৈষয়িক শ্রেষ্ঠতাহেতু জনসমাজে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইতে পারিবেন, এই আশায় মগধরাজগণ যথাসাধ্য বৌদ্ধধর্ম্মের পোষকতা করিতে লাগিলেন। নিম্ন শ্রেণীর লোক দলে দলে বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিতে লাগিল। রাজানুগ্রহ লাভের প্রত্যাশায় অল্পসংখ্যক উচ্চজাতীয় লোকও বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিল। অতঃপর সম্রাট্ অশোক স্বয়ং প্রকাশ্য রূপে নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া দিগ্দেশে সেই ধর্ম্ম প্রচার জন্য প্রচারক প্রেরণ করিলেন। এতকাল রাজকার্য্য ও ধর্ম্মকার্য্য প্রভৃতি যাবতীয় উচ্চ কার্য্য সংস্কৃত ভাষায় পরিচালিত হইত। প্রাকৃত ভাষা কেবল সামান্য কার্য্যে ও কথাবার্ত্তায় প্রযুক্ত হইত মাত্র। মগধের বৌদ্ধগণ অধিকাংশই নীচজাতীয় লোক। তাহারা সংস্কৃত ভাষা জানিত না। এ জন্য সম্রাট্ অশোক নিজ রাজকার্য্যে ও ধর্ম্মকার্য্যে মগধদেশীয় প্রাকৃত ভাষা ব্যবহারের আদেশ দিলেন। মাগধী ভাষা পাটলিপুত্র নগরের ভাষা, এজন্য "পাটলি" শব্দের অপভ্রংশে সেই ভাষার নাম পালিভাষা হইল। পালি-ভাষা রাজ-ভাষা এবং ধর্ম্মভাষা রূপে প্রবর্ত্তিত হওয়ায় ক্রমশঃ ইহার উন্নতি হইতে লাগিল। কালের আবর্ত্তনে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধরাজত্ব লোপ হইয়াছে বটে, কিন্তু সংস্কৃত ভাষা আর পূর্ব্ববৎ প্রচলিত হয় নাই। পরবর্ত্তী হিন্দু রাজ-গণের অধিকাংশ রাজকার্য্য স্থানীয় প্রাকৃতভাষাতেই লিখিত ও পঠিত হইয়া আসিতেছে। কান্যকুব্জ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে যে প্রাকৃতভাষা প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার নাম ব্রজ-ভাষা। সেই ব্রজভাষা হইতেই বর্ত্তমান হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে।

জনসমাজের হিত সাধন করাই সকল ধর্ম্মের উদ্দেশ্য এবং মূলমন্ত্র। কিন্তু চিরকালই প্রবল পক্ষ স্বধর্ম্মবিরুদ্ধবাদীদের উপর ঘোর অত্যাচার করিয়া থাকে।* বরং ধর্ম্মবিদ্বেষ বশতঃ লোকে যত অত্যাচার ও অধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকে, অন্য কোন কারণে ততদূর করে না। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম অবস্থায় হিন্দুরা বৌদ্ধদের উপর অত্যাচার করিত। কিন্তু যখন বৌদ্ধধর্ম্ম সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া প্রবল হইয়া উঠিল, তখন বৌদ্ধেরা হিন্দুদের উপর উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিল। কান্যকুব্জবাসী ব্রাহ্মণেরা সেই অত্যাচার নিবারণ জন্য যজ্ঞাগ্নি হইতে কতকগুলি যোদ্ধা উৎপাদন করিয়াছিলেন। সেই যোদ্ধাদিগকে অগ্নিকুল বা অগ্নিসম্ভূত ক্ষত্রিয় বলে। প্রমার, পরিহর, চালুক্য ও চালুমান, এই চারি জন সেই অগ্নিকুলের নেতা ছিলেন। সেই অগ্নিকুলের সাহায্যে ব্রাহ্মণেরা সমগ্র ভারতবর্ষে বৌদ্ধদিগের বিনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার ফলে, কতক বিনষ্ট হইল, কতক দেশ হইতে বিতাড়িত হইল, অবশিষ্ট বশ্যতা স্বীকার করিল। ইহারই নাম পাষণ্ডদলন। এই পাষণ্ডদলন দ্বারা কনোজ ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল এবং কান্যকুব্জ নগর আর্য্যবিস্তার আদর্শ স্থান হইল। কান্যকুব্জ-ব্রাহ্মণদিগকে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ বলিত। তাঁহারাই সকল ব্রাহ্মণের আদর্শ রূপে পূজিত হইতেন। এজন্য গৌড়াধিপতি কান্যকুব্জ হইতে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ আনিয়া নিজ রাজ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন। অগ্নিকুল দ্বারা মগধসাম্রাজ্য ধ্বংস হইলে তথাকার এক রাজকুমার ব্রহ্মদেশে গিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। সেই রাজবংশ আড়াই হাজার বৎসর ব্রহ্মদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশীয় লোকদিগকে যে "মগ" বলে, তাহা মগধ শব্দের অপভ্রংশ। *

অগ্নিকুল।

গৌড়ীয় পঞ্চরাজ্যের ইতিহাস বৈদ্য-রাজ্যারম্ভ হইতেই ধারাবাহিক রূপে পাওয়া যায়। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বৃত্তান্ত পুরাণাদি গ্রন্থে যাহা পাওয়া যায়, তাহা ধারাবাহিক না হইলেও অতীব প্রয়োজনীয় কথা। এজন্য তাহা বিবৃত করা গেল।

---

* মগধ হইতে মগহ, তাহা হইতে মঘ বা মগ। ব্রহ্মদেশের শেষ রাজা থেবাকে ইংরেজেরা ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বন্দী করিয়া তাঁহার রাজ্য আত্মসাৎ করিয়াছেন।

মিথিলাদেশ।

ইহার পূর্ব্বে বরেন্দ্রভূমি, দক্ষিণে গঙ্গা, পশ্চিমে নারায়ণী নদী, উত্তরে নেপাল। বেণ রাজার সময়ে ব্রহ্মাবর্ত্তে চতুর্ব্বর্ণ-মিশ্রণে নানা প্রকার সঙ্কর জাতি উৎপন্ন হইয়াছিল। তন্মধ্যে বিদেহ-নামক সঙ্কর জাতি আসিয়া এই দেশে প্রথমে বাস করে। এই জাতির নাম হইতেই এই দেশের আদিম নাম "বিদেহ" হয়। তাহার পর চন্দ্রবংশীয় মিথি-নামক রাজা এই দেশ জয় করিয়া নিজ রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইতেই এই দেশের নাম মিথিলা দেশ এবং রাজধানীর নাম মিথিলা নগর হইয়াছে। মিথি-বংশ বহুকাল এই দেশে রাজত্ব করিয়াছিল। প্রসিদ্ধ রাজর্ষি জনক এই মিথিবংশীয় ছিলেন। কুরু-পাণ্ডবদের সময়ে এই দেশ মগধরাজ জরাসন্ধের অধীন ছিল এবং তাঁহার করদরাজগণ দ্বারা উক্ত প্রদেশ শাসিত হইত। মগধের নন্দবংশীয় শূদ্র রাজা এবং বৌদ্ধ সম্রাটের সময়েও এই দেশ মগধসাম্রাজ্যের অধীন ছিল; তখন এই দেশ পাল-উপাধিধারী করদরাজগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইত। পাবণ্ডদলনের পর এই দেশের অধিকাংশ স্থান ক্ষত্রিয়গণ অধিকার করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু মিথিলার পূর্ব্বাংশে পালবংশেরই রাজত্ব ছিল। অবশেষে গৌড়াধিপতি বল্লাল সেন গোবিন্দপাল এবং অন্যান্য ক্ষত্রিয় রাজগণকে পরাজিত করিয়া সমগ্র মিথিলা দেশ নিজের অধীন করিয়াছিলেন। তদবধি এই দেশ বৈদ্যরাজ্যভুক্ত হইয়াছিল।

বরেন্দ্রভূমি।

ইহার পূর্ব্বে করতোয়া নদী ও চলনবিল, দক্ষিণে পদ্মানদী, পশ্চিমে মিথিলা, উত্তরে কোচবিহার। দৈত্যরাজ বলির পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে দীর্ঘতমা মুনির ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, ওড্র এবং পুণ্ড্র নামে পাঁচটি ক্ষেত্রজ পুত্র হইয়াছিল। তাঁহারা প্রত্যেকে স্বনামখ্যাত এক একটি রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বঙ্গ এবং পুণ্ড্রের রাজ্য বর্ত্তমান বাঙ্গলা দেশের অন্তর্গত। মালদহ জেলার অন্তর্গত পাণ্ডুয়া নগরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান পুণ্ড্রের অধিকারভুক্ত ছিল। তাঁহার নাম

হইতেই ইহাকে পৌণ্ড্রদেশ এবং ইহার রাজধানীকে পৌণ্ড্রপট্টন বলিত (১)। কালক্রমে বরেন্দ্র-নামক একজন ক্ষত্রিয় পৌণ্ড্র রাজ্য জয় করিয়া সমস্ত বরেন্দ্র-ভূমিতে নিজ প্রভুত্ব স্থাপন করত এই রাজ্যের নাম বরেন্দ্রভূমি রাখিয়াছিলেন, এবং তিনি পৌণ্ড্রপট্টন হইতে সরাইয়া গৌরবনগরে রাজধানী সংস্থাপিত করেন। কালক্রমে এই দেশ মগধসাম্রাজ্যের অধীন হইয়া ক্ষত্রিয়শূন্য হইয়াছিল। বৌদ্ধদিগের প্রাধান্যের সময় পালবংশীয় রাজগণ মগধসম্রাটের অধীনে এই দেশে রাজত্ব করিতেন। তাঁহারা বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন। সেই সময়ে পৌণ্ড্রপট্টনের নাম পাণ্ডুয়া, গৌরবনগরের নাম গৌড়, এবং বরেন্দ্রভূমির নাম বরিন্দা হইয়াছিল। পাষণ্ডদলনের পর এই দেশের পাল-রাজগণ স্বাধীন হইয়া ক্রমে ক্রমে সনাতন ধর্ম্ম গ্রহণ করত শৈব হইয়াছিলেন। পালবংশীয়েরা হিন্দু হইলেও শূদ্র বলিয়া গণ্য হইতেন। মদন পাল এই বংশের শেষ রাজা। তাঁহার পত্নী মন্ত্রীর সহযোগে বিষপ্রয়োগে স্বামি-হত্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেনাপতি শূরসেন-নামক বৈদ্য সেই দুষ্টা রাণী সহ মন্ত্রীকে বন্দী করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করেন এবং মৃত রাজার কোন সন্তান না থাকায় স্বয়ং রাজা হন। তদবধি গৌড়ে বৈদ্যরাজ্য স্থাপিত হইল; কিন্তু বরিন্দার উত্তর ও পূর্ব্ব প্রান্তে তখনও পালবংশীয় কোন কোন রাজার আধিপত্য ছিল। বৈদ্যরাজগণ ক্রমে ক্রমে পালরাজ্য ধ্বংস করিয়া সমস্ত বরিন্দা অধিকার করিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশ।

ইহার পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র, দক্ষিণে পদ্মা, পশ্চিমে বরেন্দ্রভূমি এবং উত্তরে জঙ্গল। ইহার কতকাংশে বঙ্গের রাজ্য ছিল বলিয়া ইহা বঙ্গদেশ বলিয়া অভিহিত হয়। ভগবান্ পরশুরাম ব্রহ্মার মানস-সরোবর হইতে খাল কাটিয়া এই দেশে ব্রহ্মপুত্র নদ আনয়নপূর্ব্বক জলদানের পুণ্যে মাতৃহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। যে স্থানে স্নান করিয়া তাঁহার পাপান্ত হইয়াছিল, সেই

---

(১) পৌণ্ড্রপট্টন স্থলে আধুনিক কেহ কেহ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বলেন, তাহা অশুদ্ধ। চীন ভাষা হইতে অনুবাদ করিতে ঐ ভুল উৎপন্ন হইয়াছে।

স্থান পরশুরামক্ষেত্র ও পৌষনারায়ণী নামে খ্যাত। এই দেশের কতকগুলি ক্ষত্রিয় প্রাণভয়ে পরশুরামের নিকট আপনাদিগকে ধীবর বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল। তাহাদের সন্তানেরাই রাজবংশী। এই দেশও মগধরাজ্যের অধীন এবং ক্ষত্রিয়শূন্য হইয়াছিল। তখন এই দেশ মগধের বৌদ্ধ সম্রাট্‌দিগের অধীন পালবংশীয় করদরাজগণ দ্বারা শাসিত হইত। পাষণ্ডদলনের পর সেই পালগণ স্বাধীন হইয়া ক্রমে ক্রমে শৈব হিন্দু হইয়াছিলেন। পালবংশের ধর্ম্মপাল প্রথম সনাতন ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তৎপুত্র দেবপাল বা দেপাল গৌড় নগর হইতে কয়েকজন কায়স্থ আনিয়া বঙ্গদেশে স্থাপিত করেন এবং তাঁহাদের সহিত বৈবাহিক আদান প্রদান করিয়া সেই সমাজে মিলিত হইয়াছিলেন। তৎপুত্র রামপাল এই বংশের শেষ রাজা। রামপালের পত্নী ও পুত্রবধূ কায়স্থকন্যা; তদীয় রাজ্যের প্রধান কার্য্যকারক সমস্তই কায়স্থ ছিল। রামপালের একমাত্র পুত্র যক্ষপাল এক প্রজার পত্নীকে বলাৎকার করায় অপক্ষপাতী রাজা তাহার প্রাণদণ্ড করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী ও পুত্রবধূ শোকে বিমুগ্ধ হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন। রামপাল নিজে গঙ্গাতীরে গিয়া শিবভক্ত বিজয় সেনকে নিজ রাজ্য প্রদান করত অনশনে প্রাণত্যাগ করিলেন। এই সময় হইতেই বৈদ্যরাজত্বের সূত্রপাত হয়।

রাঢ়দেশ।

ইহার পূর্ব্বে ভাগীরথী, দক্ষিণে উড়িষ্যা, পশ্চিমে মগধ, এবং উত্তরে গঙ্গা। ইহার প্রাচীন নাম প্রাঠদেশ। বৌদ্ধ-সাম্রাজ্যের সময় সেই শব্দ অপভ্রষ্ট হইয়া রাঠ বা রাঢ় নামে পরিণত হয়। এই দেশ বহুকাল মগধদেশের অধীন ছিল। জরাসন্ধের প্রসিদ্ধ রাজধানী পঞ্চকূট এই দেশের অন্তর্গত। মগধের শূদ্র রাজাদের অধীনে এই দেশও ক্ষত্রিয়শূন্য হইয়াছিল। বৌদ্ধ-রাজত্বের সময় এই দেশ পালবংশীয় করদরাজগণ মগধসম্রাটের অধীন হইয়া ভোগ করিতেন। পাষণ্ডদলনের পর এ দেশের উত্তরভাগ গৌড়াধিপতির অধীনে উত্তর রাঢ় নামে খ্যাত হয়। দক্ষিণ রাঢ় স্বাধীন হইয়াছিল। আদিশূর ও তৎপরবর্ত্তী বৈদ্য

রাজারা ক্রমশঃ সমস্ত রাঢ়দেশ অধিকার করিয়া এই দেশ বৈদ্যরাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন।

বকদ্বীপ।

ইহার পূর্ব্বে পদ্মা, দক্ষিণে সমুদ্র, উত্তরে গঙ্গা এবং পশ্চিমে ভাগীরথী। বৌদ্ধদিগের সময় ভাষা অপভ্রষ্ট ও সংকীর্ণ হইয়া ইহার নাম 'বগদি' হইয়াছে। ইহার আদিম অধিবাসীদিগকে বাগদি বলে। ইহা স্বতন্ত্র কোন রাজ্য ছিল না। ইহার উত্তর-ভাগ বরেন্দ্রভূমির, পূর্ব্বভাগ বঙ্গের এবং পশ্চিম ভাগ রাঢ়ের অধীন ছিল। মধ্য ও দক্ষিণ ভাগ জঙ্গলাকীর্ণ ছিল, তাহাতে বাগদিগণ ও বন্য পশুরা বাস করিত। বৈদ্যরাজগণ ক্রমশঃ এই দেশ সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া স্বরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া শান্তি ও সভ্যতা স্থাপন করিয়াছিলেন। ইউরোপীয়েরা এই দেশকে আধুনিক উৎপন্ন বলিয়া অনুমান করেন; কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রাদি দৃষ্টে সেই অনুমান ভ্রান্তিমূলক বোধ হয়।

বৈদ্যরাজত্ব।

সংস্কৃত ভাষায় যাহাকে হূণ দেশ বলে, ইউরোপীয়েরা তাহাকেই সাইথিয়া বলিতেন। এখন মুসলমানেরা সেই দেশকে তুরাণ বলেন এবং ইংরেজেরা সেই দেশকে তুর্কিস্তান বলেন। সেই দেশ হইতে তার্ত্তার জাতি দলে দলে গিয়া ইউরোপ জয় করত তদ্দেশবাসী হইয়াছে। সেই দৃষ্টান্তে ইউরোপীয়েরা অনুমান করেন যে, আর্য্যজাতিও সেইরূপ একদল তার্ত্তার জাতির শাখা। তাহারা সাইথিয়া হইতে আসিয়া ভারতবর্ষ জয় করিয়া এই দেশবাসী হইয়াছে। ভারতের আদিম নিবাসীদের সন্তানেরাই শূদ্র। এই অনুমানের পোষক কোন প্রমাণ নাই, সুতরাং তাহা বিশ্বাসের অযোগ্য।

মাক্ষমুলর-প্রমুখ সংস্কৃতজ্ঞ ইংরেজগণ অনুমান করেন যে, আর্য্যজাতি পারস্ত দেশ হইতে আসিয়া ভারতবর্ষ জয় করিয়া এই দেশে বাস করিয়াছে। এই অনুমান সমর্থন জন্য তাঁহারা দেখান যে, সংস্কৃত ভাষার সহিত প্রাচীন পার্শী অর্থাৎ

জেন্দ ভাষার প্রচুর ঐক্য আছে এবং আচার ব্যবহারেও কতক ঐক্য আছে। অথচ এই দুই জাতির মধ্যে যে প্রাচীন কালে ঘোরতর বিবাদ ও বিদ্বেষ ছিল, তাহাও স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়। বিলাতী পণ্ডিতগণ তদৃষ্টে সিদ্ধান্ত করেন যে, আর্য্য জাতি আদৌ পারস্য দেশে বাস করিয়া দেবতা ও অসুর উভয়কে পূজা করিত। পরে তাহাদের মধ্যে একদল সুর অর্থাৎ দেবগণের ভক্ত হয় এবং অপর দল অসুর-ভক্ত হয়। সেই ধর্ম্মবিদ্বেষে উভয় দলে বিবাদ হইলে, দেবভক্তগণ পরাস্ত এবং স্বদেশ হইতে তাড়িত হইয়া, ভারতে আসিয়াছিলেন এবং এই দেশ জয় করিয়া ইহাতে বাস করিয়াছেন। বিলাতী পণ্ডিতগণের উপরি-উক্ত সিদ্ধান্ত প্রকৃত ঘটনার ঠিক বিপরীত। আর্য্য জাতির অন্যদেশ হইতে ভারতে আসিবার কোন প্রমাণ কোন দেশের কোন পুস্তকে নাই এবং তাদৃশ কোন কিংবদন্তীও কুত্রাপি নাই। বরং মনুসংহিতাতে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, ব্রহ্মাবর্ত্তই আর্য্যজাতির আদিম স্থান, তথা হইতে তাহারা নানা দেশে বিস্তৃত হইয়াছে। ঋগ্বেদ ও জেন্দ অবস্তার শ্লোক সমস্ত তুলনা করিলে জানা যায় যে, আদিম আর্য্যজাতিরা সুরাসুর উভয়-পূজক ছিল। পরে একদল কেবলমাত্র সুরভক্ত এবং অন্যদল কেবলমাত্র অসুরভক্ত হইয়াছিল। তজ্জন্য তাহাদের মধ্যে বিবাদ হইয়াছিল। দেবগণ সুরভক্তদের সহায় হইয়াছিলেন, পক্ষান্তরে অসুর ও রাক্ষসগণ অসুর-ভক্তদের পক্ষ হইয়াছিল। ইহাই দেবাসুরযুদ্ধ। কিছু দিন পরে উভয়ের সন্ধি হইয়াছিল এবং উভয়ে মিলিয়া সমুদ্র মন্থন করিয়াছিল। সমুদ্রমন্থন শব্দের অর্থ আমার বোধ হয় "সামুদ্রিক বাণিজ্য"। সেই যৌত বাণিজ্যে যাহা কিছু লাভ হইয়াছিল, দেবগণ ও দেবভক্তগণ তাহা সমস্তই আত্মসাৎ করাতে পুনরায় উভয় দলে বিবাদ হইয়াছিল। সেই বিবাদে দেবভক্তগণ জয়ী হইয়া বিপক্ষগণকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল। অসুর ও অসুরভক্তগণ সিন্ধুনদের পরপারে পলায়ন করিয়াছিল এবং রাক্ষসগণ পাতালে গিয়া বাস করিয়াছিল; সুতরাং সমস্ত ভারতবর্ষ দেবভক্ত আর্য্যগণের অধিকৃত হইয়াছিল। পাতাল শব্দে পদতলবর্ত্তী দেশ অর্থাৎ পৃথিবীর বিপরীত পৃষ্ঠ। ইউরোপীয়েরা যাহাকে আমেরিকা বলেন, তাহারই নাম পাতাল। আর্য্যগণ যে অতি প্রাচীন কাল হইতে আমেরিকার অস্তিত্ব অবগত ছিলেন, তাহা ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণ দশম মণ্ডল ৯০।৯১।৯২ শ্লোক পাঠ করিলেই স্পষ্ট জানা যায়। আর আদিম আমেরিক লোকদের

চরিত্রে এবং রাক্ষসচরিত্রে সম্পূর্ণ ঐক্যও দেখা যায়। তদ্দারা পৌরাণিক উক্তির সত্যতা প্রমাণ হয়। অধিকন্তু অনুমান হয় যে, রাক্ষসেরা পাতালে যাতায়াতের পথে কতকগুলি অষ্ট্রেলিয়া, পলিনেসিয়া, ফিলিপাইন প্রভৃতি দ্বীপে বাস করিয়াছিল।

পারস্যদেশ শব্দের অর্থ "সিন্ধোঃ পারস্য দেশঃ" অর্থাৎ সিন্ধুনদের পরপারবর্ত্তী দেশ। গ্রীক জাতির কথিত পার্সিয়া শব্দ এই পারস্য শব্দের রূপান্তর মাত্র। এই নামটি দ্বারাই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, পার্সী জাতি আগে ভারতবর্ষে ছিল, পরে সিন্ধুর পশ্চিম পারে গিয়া বসতি করিয়াছিল। মনু ব্রহ্মাবর্ত্ত সম্বন্ধে যেমন বলিয়াছেন "স দেশো দেবনির্ম্মিতঃ" জেন্দ অবস্তাতেও ঠিক সেইরূপ লিখিত হইয়াছে যে "অহুরা মজ্‌দা যত দেশ সৃষ্টি করিয়াছেন, তন্মধ্যে হপ্ত হিন্দব এবং হরহৈতি দেশ সর্ব্বোৎকৃষ্ট"। অহুরা মজ্‌দা শব্দ সংস্কৃত "মস্ত অসুর" শব্দের রূপান্তর। আর হপ্ত হিন্দব শব্দ সপ্তসিন্ধু বা বর্ত্তমান পঞ্জাব বোধক। হরহৈতি শব্দ সংস্কৃত সরস্বতী শব্দের অপভ্রংশ। অহুরা মজ্‌দা বা মস্ত অসুর পার্সীদিগের পরমেশ্বর বোধক শব্দ। ব্রহ্মাবর্ত্ত সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত, সুতরাং হরহৈতি শব্দ যে ব্রহ্মাবর্ত্ত-বোধক, তাহাতে সন্দেহ নাই। জেন্দগণ ব্রহ্মাবর্ত্ত ও পঞ্জাবকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেশ বলায় উহা যে তাহাদের সুখকর আদিম বাসস্থান, তাহা প্রতিপন্ন হয়। অবস্তায় আরও উক্ত হইয়াছে যে "চোরদিগের দলপতি দুরাত্মা ইন্দ্র আমাদের শস্য এবং ধন সর্ব্বদা হরণ বা নষ্ট করে, তজ্জন্য আমরা সতত শঙ্কিত থাকি"। এই বচন দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, দেবভক্তদের উৎপাতে তিষ্ঠিতে না পারিয়া পার্সীরা ব্রহ্মাবর্ত্ত ও পঞ্জাব ত্যাগ করিয়া সিন্ধুনদের পশ্চিম পারে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আবার পুরাণে দেখা যায় যে, মহর্ষি অঙ্গিরা দেবগণের এবং অসুরগণের পুরোহিত ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবগুরু বৃহস্পতি এবং কনিষ্ঠ পুত্র অসুরগুরু সম্বর্ত্ত, উভয়েই দেবাসুর উভয় কুলের পূজ্য ছিলেন। ঐরূপ অসুরগুরু শুক্রাচার্য্যও উভয় কুলের মান্য ছিলেন। ইহা দ্বারা অনুমান হয় যে, দেবভক্ত ও অসুরভক্তদের ধর্ম্ম বিষয়ে বিবাদ তত গুরুতর ছিল না, বরং বিষয় সম্পত্তি লইয়া বিবাদই তাহাদের শত্রুতার প্রধান কারণ। অতএব ইহা নিশ্চিত হইতেছে যে, আর্য্যজাতির আদিম নিবাস ব্রহ্মাবর্ত্ত ছিল, তথা হইতে তাহারা নানা কারণে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। আবার মনুসংহিতা, রামায়ণ এবং মহাভারত দৃষ্টে স্পষ্ট জানা যায় যে, সেই বিদেশপ্রস্থিত

আর্য্যগণমধ্যে প্রায় সকলেই ক্ষত্রিয় ছিল। তাহারা দেশান্তরে গিয়া ব্রাহ্মণের উপদেশ না পাওয়াতে ভ্রষ্টাচারী ও দস্যুবৃত্তিপরায়ণ হইয়াছিল। ভ্রষ্টাচারী অর্থে অন্ন, যোনি এবং ব্যবসায়ে বিচারবিহীন অর্থাৎ যাহাদের আহার বিষয়ে, বিবাহ বিষয়ে এবং ব্যবসায় বিষয়ে কোন বাধা-বিচার নাই।

ব্রহ্মাবর্ত্ত আর্য্য-সদাচারের আদর্শ স্থান ছিল। আর্য্যরাজ্যে শ্বেতবর্ণ ব্রাহ্মণ, রক্তবর্ণ ক্ষত্রিয়, শ্যামবর্ণ বৈশ্য এবং কৃষ্ণবর্ণ শূদ্রদিগের জন্য খাদ্য দ্রব্য, বিবাহ এবং ব্যবসায় বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলী ছিল। বেণ রাজার রাজত্বকালে এবং তৎপরে সেই চতুর্ব্বর্ণ-সংমিশ্রণে কতকগুলি সঙ্কর জাতি উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহাদের জন্যও অধিকাংশ স্থলে ব্যবসায় নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল। পরস্ত্রী-গমনে এবং পরধন-হরণে যেরূপ দণ্ড হইত, তেমনি একজাতীয় লোক অন্য জাতির ব্যবসায় করিলে, আর্য্যরাজ্যে তাহার কঠিন দণ্ড হইত। সেইজন্য যে জাতির নিমিত্ত কোন ব্যবসায় ধার্য্য হয় নাই, তাহারা আর্য্যরাজ্যে জীবিকানির্ব্বাহের উপায় না পাইয়া স্থানান্তরে যাইতে বাধ্য হইত। আবার যে জাতির নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায় ছিল, সেই জাতির কোন ব্যক্তি, জাতিব্যবসায় দ্বারা জীবিকা চালাইতে না পারিলে, অগত্যা স্থানান্তরে যাইত। এই কারণে বিদেহজাতি মিথিলায়, মগধজাতি মগধদেশে, উগ্রক্ষত্র জাতি রাঢ়দেশে এবং অম্বষ্ঠ জাতি বরেন্দ্রভূমিতে গিয়া বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিল *। বাঙ্গালা দেশে অম্বষ্ঠেরা অধিকাংশই চিকিৎসা ব্যবসায় করিত যাহারা অন্য ব্যবসায় করিত, তাহারাও চিকিৎসাকার্য্য কতক জানিত। এজন্য বাঙ্গালা দেশে তাহারা বৈদ্য নামে খ্যাত হইয়াছিল। বাঙ্গালা দেশের বাহিরে বৈদ্য নামে কোন জাতি নাই। মগধদেশে অম্বষ্ঠ জাতিকে অম্বষ্ঠ কায়েত বলে। হিন্দুস্থানে ইহাদিগকে বৈদ্ ঠাকুর বলে। মহারাষ্ট্র দেশে এই জাতিকে পরভূ জাতি, এবং দ্রাবিড় দেশে করণ জাতি বলে।

প্রাচীন কালে অনুলোম-বিবাহ প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণের বিবাহিত-বৈশ্যার গর্ভজাত সন্তানেরাই অম্বষ্ঠ। ব্রাহ্মণ ও শূদ্রাজাত করণ জাতিও বোধ হয় অম্বষ্ঠ সহ মিলিত হইয়াছে। করণ জাতি জারজ সন্তান নহে। কেননা

---

* আধুনিক বাঙ্গালা পুস্তকে অম্বষ্ঠ শব্দ স্থলে অম্বষ্ঠ লেখা হয়, তাহা অশুদ্ধ। (অম্বিকায়াং) অম্বি স্থা ড=অম্বিষ্ঠ। হিন্দুস্থানী পণ্ডিতেরা অম্বিষ্ঠ লিখিয়া থাকেন, তাহাই ব্যাকরণসিদ্ধ।

ব্রাহ্মণের বৈশ্যা বা শূদ্রা উপপত্নীর সন্তান কুত্রাপি অম্বিষ্ঠ বা করণ জাতি বলিয়া গণ্য হয় না। এই সঙ্কর জাতি বাঙ্গালা দেশে এবং দাক্ষিণাত্যে বৈশ্য-শ্রেণীভুক্ত, মগধদেশে কায়স্থশ্রেণীভুক্ত এবং হিন্দুস্থানে ক্ষত্রিয়শ্রেণীভুক্ত।

বৈদ্য ও কবিরাজ শব্দ পণ্ডিত এবং চিকিৎসক এই উভয় অর্থ-প্রতিপাদক। ইংরেজী ডক্টর ও আরবী হেকিম শব্দ ঠিক এই দুই অর্থ-বোধক। তজ্জন্য অনুমান হয় যে, প্রাচীন কালে প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরাই চিকিৎসাকার্য্য করিতেন। প্রাচীন কালে চিকিৎসা-ব্যবসায় ব্রাহ্মণদের একচাটিয়া ছিল। অথচ কলিযুগে ইহা ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছে। তাহাতে অনুমান হয়, ব্রাহ্মণেরা এই ব্যবসায় অম্বিষ্ঠদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কলিকালে কোন ব্রাহ্মণ লোভবশে পুনরায় সেই ব্যবসায় করিয়া অম্বিষ্ঠদিগের জীবিকানির্ব্বাহে ব্যাঘাত না করে, এই উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণের পক্ষে তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

"শব্দকল্পদ্রুম"-নামক অভিধানে "অম্বষ্ঠঃ জারজঃ বৈদ্যঃ" বলিয়া যে লিখিত হইয়াছে, তাহা ভুল বলিয়া বোধ হয়। কেননা অম্বা+স্থা+ড=অম্বস্থ হয়। অম্বষ্ঠ শব্দটি ব্যাকরণশুদ্ধ নহে। আর জারজ শব্দ, বৈদ্য শব্দ এবং অম্বষ্ঠ শব্দ কদাচ তুল্যার্থক হইতে পারে না। "বিশ্বকোষ" অভিধানে পরভূ জাতি স্থলে "প্রভু" শব্দ লিখিত হইয়াছে এবং তাহাদিগকে কায়স্থ বলিয়া লেখা হইয়াছে। তাহাও অশুদ্ধ। পরভূ শব্দের অর্থ পরবর্ত্তী কালে উৎপন্ন জাতি অর্থাৎ আদিম চতুর্ব্বর্ণের পরে উৎপন্ন জাতি। ইহা "প্রভু" শব্দের অপভ্রংশ নহে। আর ব্রাহ্মণের ঔরসে মারাঠী শূদ্রার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি। ইহাদিগকে কায়েত বলা যায় না। আমি যতদূর অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহাতে জানিয়াছি যে, দাক্ষিণাত্যে কায়স্থ জাতি নাই। পরভূ ও করণ জাতিগণকে অম্বিষ্ঠ জাতি-মধ্যে গণ্য করা যায়।

আদিশূর।

পাবগুদলনের পর সমস্ত বরেন্দ্রভূমি একটি রাজ্য ছিল না। গৌড়নগরের পালরাজ্যই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তীর্ণ ছিল। উত্তর রাঢ়দেশও তাহারই অধীন ছিল। উত্তর দিকের দিনাজপুর অঞ্চলে আর একটি পালরাজ্য ছিল। পূর্ব্বদিকে

বগুড়া অঞ্চলে তৃতীয় পালরাজ্য ছিল। ফলতঃ বরেন্দ্রভূমিতে তিন চারিটি রাজ্য ছিল। মদনপাল গৌড়রাজ্যে পালবংশের শেষ রাজা। শূরসেন-নামক একজন বৈদ্য তাঁহার সেনাপতি ছিলেন। মদনপাল ভ্রষ্টা পত্নী-কর্ত্তৃক বিষ-প্রয়োগে নিঃসন্তান অপহৃত হইলে, শূরসেন সেই রাণীকে ও তাহার উপপতিকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া স্বয়ং রাজা হইয়াছিলেন। বৈদ্যজাতির মধ্যে তিনিই প্রথম রাজা; এইজন্য তিনি আদিশূর নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। আদিশূর চতুর্দ্দিকে নিজরাজ্য বিস্তার করিয়া অতিশয় পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে বৈদ্যরাজত্ব-কালেই শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের বাঙ্গলাদেশে বাস আরম্ভ হয়। তাঁহাদের দ্বারাই বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি আরম্ভ হয়। ৯৪৪ শকাব্দের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গৌড়ে বৈদ্যরাজত্ব স্থাপিত হইয়াছিল।

আধুনিক কোন কোন ব্যক্তি অনুমান করেন যে, আদিশূর ও তৎপরবর্ত্তী রাজগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন। এই অনুমানের পোষক কোনই যুক্তি বা প্রমাণ নাই; বরং যুক্তি প্রমাণাদি যাহা পাওয়া যায়, তাহা সমস্তই উক্তপ্রকার অনুমানের বিরুদ্ধ। শূরসেন (আদিশূর) হইতে মাধবসেন পর্য্যন্ত এগার জন রাজা প্রায় তিন শত বৎসর বাঙ্গালা দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। যদি তাঁহারা ক্ষত্রিয় হইতেন, তবে তাঁহাদের জ্ঞাতি কুটুম্ব অবশ্যই বাঙ্গালা দেশে থাকিত। কিন্তু তাদৃশ কোন ক্ষত্রিয় বাঙ্গালা দেশে বা কোন নিকটবর্ত্তী স্থানেই নাই এবং কখন ছিল বলিয়াও জানা যায় না। কোন শ্রেণীর হিন্দু রাজা স্বশ্রেণীর লোক ব্যতীত থাকিতে পারেন না। সুতরাং সেন রাজারা যে ক্ষত্রিয় ছিলেন না, ইহাই তাহার অকাট্য প্রমাণ। দ্বিতীয়তঃ—ক্ষত্রিয়দিগের কোথাও কৌলিক "সেন" উপাধি নাই। তৃতীয়তঃ—রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের কুলশাস্ত্রে ইহাঁদিগকে বৈদ্যজাতীয় বলিয়া উল্লেখ আছে। চতুর্থতঃ—বৈদ্যদিগের মধ্যে লক্ষ্মণসেনের মতের বৈদ্য এবং বল্লালসেনের মতাবলম্বী বৈদ্য এখনও আছে। পঞ্চমতঃ—রামগতি ন্যায়রত্ন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং ইংরেজ ইতিহাস-লেখকগণ সকলেই ইহাঁদিগকে বৈদ্য বলিয়া লিখিয়াছেন। অতএব ইহাঁরা যে বৈদ্যজাতীয় ছিলেন, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

বৈদ্য রাজাদের পুত্র-কন্যাসহ ক্ষত্রিয় রাজাদের পুত্র-কন্যার বিবাহে আদান প্রদান প্রচলিত ছিল। আদিশূর কান্যকুব্জের ক্ষত্রিয় চন্দ্রকেতুর কন্যা চন্দ্রমুখীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এক সময়ে আদিশূরের রাজ্যমধ্যে অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ

প্রভৃতি ঈতি উপস্থিত হইল। রাণী কহিলেন—রাজার পাপে রাজ্যমধ্যে ঈতি হয়। অতএব রাজার চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য। রাজমন্ত্রিগণ এবং রাজা নিজেও তাহাই কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। বাঙ্গালাদেশ বহুকাল বৌদ্ধ রাজার অধীন ছিল। সেই জন্য এদেশীয় ব্রাহ্মণেরা কতক ভ্রষ্টাচারী হইয়াছিল। ধর্ম্ম-শাস্ত্রে ও সংস্কৃত ভাষায় তাহাদের বিজ্ঞতা কম ছিল। অথচ সেই সময়ে কান্যকুব্জ আর্য্যধর্ম্মের এবং বিদ্যার আদর্শ স্থল ছিল। এদেশীয় ব্রাহ্মণেরা চান্দ্রায়ণ যজ্ঞ করাইতে অপারক হওয়ায় রাজা আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চগোত্রীয় পাঁচজন সুপণ্ডিত আনিয়া তাঁহাদের দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন। তাহাতেই তাঁহার রাজ্যের সমস্ত দুর্নিমিত্ত শান্তি হইল। রাজা তদ্দৃষ্টে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রোত্রিয়গণকে প্রচুর দক্ষিণা দিলেন এবং গো অশ্ব শকটাদি দান করিলেন। শ্রোত্রিয়েরা শাস্ত্র-বিদ্যায় যেমন পারদর্শী ছিলেন, শস্ত্রবিদ্যায়ও সেইরূপ ছিলেন। তাঁহারা যেমন ধার্ম্মিক এবং পণ্ডিত ছিলেন, তেমনই বলবান্ বীরপুরুষও ছিলেন। তাঁহারা দূরদেশে যাইতে শাস্ত্র এবং শস্ত্র উভয়ই সঙ্গে লইয়া যাইতেন। তাঁহারা শাপ দ্বারা এবং শর দ্বারা দুষ্ট দমন করিতে পারিতেন।

শ্রোত্রিয়েরা প্রত্যেকে এক একজন ভৃত্যসহ শাস্ত্র ও শস্ত্র লইয়া পদব্রজে গৌড়ে আসিয়াছিলেন। তথায় দক্ষিণা ও প্রতিগ্রহ প্রচুর পরিমাণে পাইয়া তাঁহারা অশ্ব আরোহণে স্বদেশে চলিলেন। তাঁহাদের ভৃত্যগণ তাঁহাদের প্রাপ্তধন শকটে চাপাইয়া তদুপরি আরোহণে প্রভুর পশ্চাতে চলিল। তাঁহারা স্বদেশে পৌঁছিলে, তাঁহাদের প্রতিবেশিগণ তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য দৃষ্টে ঈর্ষাপরবশ হইয়া কহিল "কলৌ বৈশ্যঃ শূদ্রবৎ ;" "সুতরাং তোমরা শূদ্রের পৌরোহিত্য করিয়া পতিত হইয়াছ। আমরা তোমাদের সহ আহার ব্যবহার করিব না।"

উক্ত পঞ্চ শ্রোত্রিয় রাজনিয়োগে গৌড়ে গিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রতিবেশী দ্বিজগণ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া রাজার নিকট অভিযোগ করিলেন। রাজা চেষ্টা করিয়াও দলাদলি মিটাইতে পারিলেন না। তখন সেই পঞ্চ বিপ্র স্বদেশীয়দিগকে "যবন-লাঞ্ছিত হও" বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন এবং নিজ নিজ পরিবার ও দাসদাসীগণ সহ নৌকাপথে পুনরায় গৌড়ে প্রত্যাগমন করিলেন।

রাজা আদিশূর তাঁহাদিগকে পুনরাগত দেখিয়া অতীব হৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহাদিগকে নিজ রাজধানীতে বাস করিতে অনুরোধ করিলেন। শ্রোত্রিয়গণ

কহিলেন "নগরবাসী ব্রাহ্মণেরা লোভী এবং পাপাচারী হয়। আমরা রাজবাটীতে বাস করিব না। আমাদিগকে গঙ্গাতীরে বাসস্থান প্রদান করুন। রাজা অনুসারে গঙ্গা ও মহানন্দা নদীর সংযোগস্থলে তাঁহাদের বাড়ী করিয়া দিলেন এবং তাঁহাদের ভরণ পোষণ জন্য প্রত্যেককে এক একখানি গ্রাম ব্রহ্মত্র দিলেন। তাঁহাদের বাড়ীর পার্শ্বেই তাঁহাদের ভৃত্য ও নৌকার মাল্লাগণের বাড়ী হইল। কাজেই এখানে কনোজীয় লোকের একটি উপনিবেশ স্থাপিত হইল। উক্ত পণ্ডিতগণের আবাস হেতু ঐ স্থান ভট্টশালী গ্রাম নামে খ্যাত হইল। সন ৯৪৪ শকাব্দে ইংরেজী ১০২২ সালে বাঙ্গালা দেশে শ্রোত্রিয়দিগের বাস হইল। ঠিক সেই বৎসরেই মহম্মদ গাজী গজনবী কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ লাঞ্ছিত হইয়াছিল। শ্রোত্রিয়েরা বংশানুক্রমে ১২৬ বৎসর কাল সেই একমাত্র ভট্টশালী গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদের যতই বংশ বৃদ্ধি হইতেছিল, অমনি বৈদ্য রাজারা তাঁহাদিগকে নূতন নূতন ব্রহ্মত্র দিতেছিলেন। কিন্তু শরীকী বিভাগে তাঁহাদের আবাসবাটী অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হইল এবং তাঁহাদের নবলব্ধ ব্রহ্মত্র বাসস্থান হইতে বহুদূরবর্ত্তী হইয়া পড়িল। তাঁহারা সেই অসুবিধা তৎকালীন রাজা বল্লালসেনের নিকট বিজ্ঞাপন করিলেন।

এরূপ অনুমান হয় যে, শ্রোত্রিয়দিগের অনুচর শূদ্রগণ সেই ১২৬ বৎসর একমাত্র ভট্টশালী গ্রামে আবদ্ধ ছিল না। শ্রোত্রিয়েরা বিস্তীর্ণ ব্রহ্মত্র পাইলে তাঁহাদের পরিচারকগণ তহশীলদার স্বরূপ হইয়াছিল। সেই তহশীলদারদের সন্তানগণ মধ্যে অনেকে লেখা পড়া শিখিয়া নানা স্থানে গিয়া নানা ব্যবসায় ও রাজকার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কেননা আমরা দেখিতে পাই যে, রাজা বল্লালসেনের এবং বঙ্গাধিপতি রামপাল রায়ের কতিপয় কর্ম্মচারী কায়স্থ ছিল। আর বল্লালের সময়ে যখন শ্রেণীবিভাগ হইয়াছিল, তখন ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যের মধ্যে কেবল বারেন্দ্র ও রাঢ়ী এই দুইটী মাত্র শ্রেণী হইয়াছিল; কিন্তু কায়স্থদের মধ্যে তিন শ্রেণী দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হয় যে, তাঁহারা বরেন্দ্রভূমি, রাঢ় ও বঙ্গ তিন বিভাগেই বিস্তৃত হইয়াছিলেন। আর ইহাও সহজেই অনুমান করা যায় যে, শ্রোত্রিয়দের বহু ভৃত্য প্রয়োজনীয় ছিল না। তাঁহারা যাহাদিগকে নিজ চাকর না রাখিতেন, তাহাদের প্রতিপালনের কোনপ্রকার সুবিধার জন্য তৎকালীন রাজা ও প্রধান লোকদিগকে অনুরোধ করিতেন। সমস্ত লোক তাঁহাদের

ভক্ত ছিল, এজন্য তাঁহাদের অনুরোধ কদাচ ব্যর্থ হইত না। এখানে ইহাও বলা উচিত যে, শ্রোত্রিয়েরা নিজে কোন চাকরী করিতেন না। কেহ কেহ আবশ্যক মত কোন কোন প্রধান রাজকার্য্য সময়ে সময়ে নির্ব্বাহ করিতেন বটে; কিন্তু বেতনভোগী চাকরী করেন নাই।

সেই ১২৬ বৎসর মধ্যে রাজা আদিশূর তদ্বংশীয় লাউসেন (লবসেন), নবজসেন, ও চন্দ্রসেনের রাজত্ব শেষ হইয়াছিল এবং চন্দ্রসেনের দৌহিত্র বল্লাল সেনের রাজত্ব চলিতেছিল। লাউসেন ও নবজ সেনের কোন বৃত্তান্ত জানা যায় না। কেবল অনুমান হয় যে, তাঁহারা পালবংশীয়দিগের রাজ্যের কতকাংশ অধিকার করিয়া নিজ নিজ রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। চন্দ্রসেনের পুত্র ছিল না। একমাত্র কন্যা প্রভাবতীকে তিনি বিজয়সেনের সহ বিবাহ দিয়াছিলেন। বিজয়সেন শিবভক্ত পরম তপস্বী ছিলেন। চন্দ্রসেন জামাতাকে কহিলেন "বৎস! যাহাকে ঈশ্বর ও জনসমাজ যে কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছেন, সেই কার্য্য করাই তাহার পরম ধর্ম্ম। স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম অবলম্বন মহাপাপ। তুমি রাজকার্য্য কর এবং সেই কার্য্যে ধর্ম্মে মতি রাখিয়া চল। যোগী হইয়া স্বকার্য্য ত্যাগ করিলে পুণ্য না হইয়া পাপ হয়। ভগবান্ রামচন্দ্র ব্রাহ্মণ তপস্বীদিগকে ভক্তি করিতেন, কিন্তু শূদ্র তপস্বীর প্রাণদণ্ড করিয়াছিলেন। সকল লোক তপস্বী হইলে সংসার চলে না। তুমি সর্ব্বদা ঈশ্বরকে স্মরণ রাখ, সেটি ভাল; কিন্তু নিজ ব্যাবসায়িক কার্য্য করিতে অবহেলা করিও না। যদি কোন ভৃত্য নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য না করিয়া কেবল প্রভুর মৌখিক প্রশংসা করিয়া সময় কর্ত্তন করে, তবে কোন প্রভুই তাদৃশ ভৃত্যকে ভালবাসে না, বরং দণ্ডই দেয়। তেমনই তুমি ঈশ্বরের ভৃত্য। ঈশ্বর তাঁহার লক্ষলক্ষ প্রজার ধন প্রাণ রক্ষার্থে তোমাকে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছেন। তুমি সেই কার্য্য না করিয়া ধ্যান ধারণাতে সময় ক্ষেপণ করিলে, অপরাধী হইবে।" বিজয়সেন কহিলেন "আমি রাজা বা রাজপুত্র হইয়া জন্মি নাই। আমি আপনকার জামাতা। আমি সম্পর্কে পুত্রতুল্য, কিন্তু আমি আপনকার উত্তরাধিকারী নহি। সুতরাং আমি রাজকার্য্য না করিলে, আমার কোন পাপ হইবে না। আপনকার দৌহিত্র হইলে তাহাকে এই সকল উপদেশ দিবেন। আমার বিষয়বাসনা নাই; আমি কোন বৈষয়িক কার্য্য করিব না।" রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন "তোমার

বিষয়বাসনা নাই, কিন্তু ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে। নিজ অন্ন বস্ত্রের জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। প্রতিপণ ব্যতীত যাহা কিছু গ্রহণ করা যায়, তাহাতেই অপহরণ হয়। তুমি যদি কোন মূল্য না দিয়া এবং কোন প্রত্যুপকার না করিয়া কাহারও নিকট অন্নবস্ত্র গ্রহণ কর, তবে তাহাও অপহরণ করা হয়।" বিজয় উগ্রভাবে কহিলেন "আচ্ছা, আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, অদ্যাবধি আমি আর পরান্ন গ্রহণ করিব না, পরগৃহে বাস করিব না এবং পরপ্রদত্ত কোন বস্ত্র বা অন্য কোন বস্তু স্পর্শ করিব না।"

বিজয়সেন সন্ন্যাসিবেশে গঙ্গাতীরে কংসহট্টে (কানসাট) চলিলেন। শ্বশুর, শাশুড়ী বা অন্য কাহারও কোন অনুরোধ শুনিলেন না। প্রভাবতী তাঁহার পশ্চাতে চলিলেন। বিজয় জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কোথা যাও?" প্রভাবতী কহিলেন "তুমি যেখানে যাও, আমিও সেখানে যাব; তুমি যে ভাবে থাক, আমিও সেই ভাবেই থাকিব।"

বিজয়—তুমি তত কষ্ট সহিতে পারিবে না।

প্রভা—যাহা তুমি সহ্য করিবে, তাহা আমিও সহিব। স্বামীই স্ত্রীলোকের একমাত্র ঈশ্বর। পত্নীর ইহকাল পরকালের সুখ সমস্তই স্বামিসেবাতেই হয়। তুমি এখানে ছিলে, তজ্জন্যই আমি পিতৃ-গৃহে ছিলাম। তুমি আমাকে সঙ্গে লইয়া যাও, নতুবা প্রাণ বধ করিয়া যাও। আমি প্রাণ থাকিতে তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না।

বিজয়—তবে তুমি বহুমূল্য অলঙ্কার ত্যাগ কর।

প্রভা তৎক্ষণাৎ শাঁখা খাড়ু ব্যতীত সমস্ত অলঙ্কার ত্যাগ করিয়া কহিলেন "আর কি করিব?" বিজয় হাস্য করিয়া কহিলেন "এখন বুঝিলাম তুমি আমার যথার্থ ধর্ম্মপত্নী। তুমি আমার সঙ্গে চল।"

প্রভা "যে আজ্ঞা" বলিয়া স্বামীর পশ্চাতে চলিলেন। চতুর্দ্দিকে সকলে ধন্যবাদ করিতে লাগিল। বিজয়সেন প্রভাবতীসহ কানসাটে গিয়া এক পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন। বিজয় প্রত্যহ জঙ্গল হইতে ফল, মূল, কাষ্ঠ ও বৃক্ষপত্র আনিয়া বাজারে বিক্রয় করিতেন। তাহাতে যে মূল্য পাইতেন, তাহাই সাংসারিক ব্যয় জন্য পত্নীকে দিতেন। কিন্তু নিজে এক মুহূর্ত্তও "শিব শিব বম্ বম্" শব্দ ত্যাগ করিতেন না। প্রভাবতী দাসীর ন্যায় সমস্ত কার্য্য স্বহস্তে করিতেন এবং দিবানিশি "শিবদুর্গা

শিবদুর্গা” নাম জপ করিতেন। রাজা ও রাণী গোপনে প্রভাবতীর আর্থিক সাহায্য করিতে চাহিলেন। প্রভাবতী কহিলেন “আমি গোপনে প্রত্যহ সাহায্য লইলে তাহা কদাচ অপ্রকাশ থাকিবে না; বিশেষতঃ আমার স্বামী তপস্বী, তিনি দেবানুগ্রহে সমস্ত জানিতে পারিবেন। আপনারা যদি সাহায্য করিতে চাহেন, তবে আমার স্বামী যাহা বিক্রয় করেন, আপনারা অন্য লোক দ্বারা তাহাই কিছু বেশী মূল্যে ক্রয় করিবেন। ইহাতে আমার সাহায্য হইবে, অথচ কোন অপরাধ হইবে না।” রাজা, রাণী এবং মন্ত্রী এই পরামর্শই সঙ্গত বোধ করিলেন। তাঁহারা বিজয়সেনের পণ্য যাহা পূর্ব্বে পাঁচ ছয় বুড়ী কোড়ী মূল্যে বিক্রীত হইত, তাহাই এক কাহন মূল্যে ক্রয় করিতে লাগিলেন। বিজয়সেন তাদৃশ মূল্যবৃদ্ধির কারণ বুঝিলেন না। এইরূপে ১১১১ দিন গত হইলে তাঁহার ভাগ্য প্রসন্ন হইল।

বঙ্গদেশের অধিপতি রামপাল রায় পরম শৈব ছিলেন। তিনি নিজের একমাত্র পুত্র যক্ষপালের গুরুতর অপরাধ হেতু প্রাণদণ্ড করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে রামপালের স্বগণ কেহই ছিল না। গঙ্গাতীরে কানসাট তখন তীর্থস্থান ছিল। রামপাল শম্ভুধ্যানে অনশনে জীবন শেষ করিবার জন্য কানসাট আসিলেন। রাত্রিতে মহাদেব রামপালের নিকট আবির্ভূত হইয়া কহিলেন “নৃপসত্তম! তোমার স্ত্রী, পুত্র ও বধূ সকলেই তোমার পুণ্যে কৈলাসে গিয়া তোমার প্রতীক্ষা করিতেছে। তুমি আমার পরম ভক্ত বিজয়সেন ও প্রভাবতীকে রাজ্য দান কর। পরশ্ব দিবস অর্দ্ধপ্রহর বেলায় তোমার উদ্ধার হইবে।” রাজা রামপাল রায় শৈবাদেশ মত বিজয়সেন ও প্রভাবতীকে নিজ উত্তরাধিকারী নির্দ্দেশ করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন। রাজমন্ত্রী দামোদর ঘোষ বিজয়সেনের কুটীরে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের দৈন্যাবস্থা দৃষ্টে তুচ্ছ বোধ করিয়াছিলেন। পরে তাঁহাদের আভিজাত্য ও ধর্ম্মনিষ্ঠা জানিতে পারিয়া নূতন প্রভুকে ভক্তিপূর্ব্বক সম্বর্দ্ধনা করিলেন। বিষয়বিরাগী বিজয়সেন প্রথমতঃ রাজ্যগ্রহণে সম্মত হইলেন না। পরে মহাদেবের আদেশে তিনি রাজ্য গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু তিনি মধ্যাহ্নে আহারান্তে চারিদণ্ড মাত্র রাজকার্য্য করিতেন। তিনি অবশিষ্ট সমস্ত সময় কেবল জপ তপে কাটাইতেন। রাজ্ঞী প্রভাবতী বুদ্ধিমতী ও বিদুষী ছিলেন। মন্ত্রী দামোদর অতিশয় বিচক্ষণ লোক ছিলেন। তাঁহারাই সমস্ত রাজকার্য্য চালাইতেন। বিজয়সেনের পুণ্যবলে তাঁহার প্রজাগণ নীরোগ ও সুখী হইল।

বল্লালচরিত।

ভবদিনাথ-নামক এক দক্ষিণী ব্রাহ্মণ একটী ক্ষত্রিয়জাতীয়া পত্নী লইয়া ত্রিবেণীতে গঙ্গাবাস করিতেছিলেন। তাঁহাদের সন্তান সামন্তসেন ব্রহ্মক্ষত্র। ক্ষত্রিয় ও বৈদ্যেরা ব্রহ্মক্ষত্রগণকে কুলীন জ্ঞান করিত। সামন্তসেন এক বৈদ্য সামন্তের কন্যা বিবাহ করিয়া বৈদ্যজাতিতে মিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহার আহার-ব্যবহার, পুত্র-কন্যার বিবাহ প্রভৃতি সমস্ত সামাজিক ক্রিয়া বৈদ্যদের সহ হইয়াছিল বোধ হয়। তাঁহার পুত্র হেমন্তসেনও বৈদ্যকন্যাই বিবাহ করিয়াছিল। হেমন্তের পুত্র বিজয়সেন গৌড়াধিপতি চন্দ্রসেনের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহারই পুত্র রাজাধিরাজ বল্লালসেন। আধুনিক অনেকে বল্লালসেনকে ব্রহ্মক্ষত্র বলেন। কিন্তু বল্লালচরিত-পাঠে জানা যায় যে, বল্লাল আপনাকে বৈদ্য-জাতীয় বলিয়া পরিচয় দিতেন। সামন্তসেন ব্রহ্মক্ষত্র ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি ও তাঁহার বংশধরেরা বৈদ্যসমাজে মিলিত হওয়ায় তাঁহাদিগকে বৈদ্যজাতীয় বলাই সঙ্গত। প্রাচীন পণ্ডিতেরা সকলেই তাঁহাদিগকে বৈদ্য বলিয়া জ্ঞান করিতেন। কেহ বলেন যে, রাজা আদিশূরের বংশের পর এবং বিজয়সেনের পূর্ব্বে বৈদ্য-রাজত্ব লুপ্ত হইয়া মধ্যে কিছু দিন পালবংশের রাজত্ব হইয়াছিল; তাহা ভুল। আদিশূরের বংশের দৌহিত্রকুলে বল্লালের জন্ম হয়, ইহা বারেন্দ্রকুল-পঞ্জিকায় স্পষ্ট লেখা আছে। যৎকালে আদিশূরের বংশীয়েরা রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময়ে, স্থানে স্থানে পালবংশীয় রাজাও ছিল। তজ্জন্যই ঈদৃশ ভ্রম হইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে আদিশূর হইতে মুসলমান-অধিকার পর্য্যন্ত বৈদ্যরাজত্ব ধারাবাহিক রূপে চলিয়াছিল, তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়।

আধুনিক কেহ কেহ আদিশূরের বংশীয় প্রত্যেক ব্যক্তির নামেই 'শূর' শব্দ যোগ করেন। রাঢ়ী বারেন্দ্র কুলশাস্ত্রে এরূপ নাম নাই এবং বল্লালচরিতেও নাই। পূর্ব্বে এরূপ নাম শুনা যায় নাই। এই সকল নাম কোথা হইতে আবিষ্কৃত হইল, তাহা আমি জানি না। অনুমান হয় যে, রাজা শূরসেনের যেমন আদিশূর উপাধি হইয়াছিল, সেইরূপ তাঁহার বংশীয় লাউসেন, নবজসেন প্রভৃতিরও ভূশূর, মহীশূর প্রভৃতি উপাধি হইয়া থাকিবে। উহা যে প্রকৃত নাম নহে, তাহা নিশ্চিত।

যে সময়ে বিজয়সেন বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময়ে ১০৩৩ শকাব্দে রামপাল নগরে বল্লালসেনের জন্ম হয়। বল্লাল, বিজয়সেনের ঔরস পুত্র নহেন। শৈব বরে বল্লালের জন্ম হওয়া জন্ম বিজয়সেন পুত্রের নাম "বর-লাল" রাখিয়াছিলেন। বল্লাল শব্দ তাহারই অপভ্রংশ। বল্লাল দীর্ঘকায়, বল-বান্, বুদ্ধিমান্, মেধাবী এবং সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত পরমসুন্দরাকৃতি ছিলেন। তিনি চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সেই শস্ত্রবিদ্যায় এবং শাস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় মিষ্টভাষী এবং শিষ্টাচারী কেহ ছিল না।

বল্লালের চৌদ্দ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার মাতামহ সাংঘাতিক পীড়িত হইয়া তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিলেন। বল্লাল ও প্রভাবতী বিজয়সেনের তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। বিজয় কহিলেন "আমি শ্বশুরের কোনরূপ সাহায্য লইব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি বটে; কিন্তু তাহাতে তোমাদের কোন বাধা নাই। তোমরা তাঁহার সন্তান। তাঁহার আসন্ন সময়ে তাঁহার সেবা করা তোমাদের লোকতঃ ধর্ম্মতঃ একান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আমি স্বচ্ছন্দচিত্তে অনুমতি দিতেছি যে, তোমরা তাঁহার নিকট গিয়া শুশ্রূষায় রত হও।" প্রভাবতী পুত্রসহ গৌড়ে গিয়া পিতার চরণ ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। রাজা চন্দ্রসেন হাস্য করিয়া কহিলেন "তোমার কোন দোষ নাই, ক্ষমা কি করিব? তুমি যে পিতৃ-গৃহ ত্যাগ করিয়া স্বামীর অনুসরণ করিয়াছিলে, তাহা উত্তম। তুমি যে সর্ব্বসুখ ত্যাগ করিয়া দাসীর ন্যায় দরিদ্র স্বামীর সেবা করিয়াছ, তাহা শ্লাঘ্য। তোমার রাজ্যলাভ ও সুসন্তানলাভ আমি পরম লাভ জ্ঞান করি। আর বিজয় যে তোমাদিগকে এখানে আসিতে সম্মতি দিয়াছে, তাহাতে আমি তুষ্ট হইলাম। তোমার পুত্রই আমার একমাত্র উত্তরাধিকারী। আমি তাহাকে রাজ্য দিয়া অচিরে গঙ্গাযাত্রা করিব।" বল্লালকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া রাজা চন্দ্র-সেন কানসাটে গমন করিলেন। বল্লাল ও প্রভাবতী তাঁহার সঙ্গে গেলেন। বিজয়সেনও তথায় আসিয়া শ্বশুরের সেবা করিতেন, কিন্তু কদাচ শ্বশুরগৃহে জলগ্রহণও করিতেন না। চন্দ্রসেনের মৃত্যু হইলে তৎপত্নী স্বামীর চিতায় সহ-মৃতা হইলেন। বল্লাল দুই বৎসর গৌড়ে রাজত্ব করার পর তাঁহার ষোড়শ বর্ষ উত্তীর্ণ হইল দেখিয়া বিজয়সেন বল্লালের বিবাহ দিয়া বঙ্গরাজ্যেও তাঁহাকে রাজা করিলেন এবং নিজে সন্ন্যাসী হইয়া তীর্থযাত্রা করিলেন। এই তীর্থযাত্রা হইতে

তিনি আর প্রত্যাগমন করেন নাই। সেতুবন্ধ রামেশ্বরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে।

এইরূপে বল্লাল মাতামহের এবং পিতার উত্তরাধিকারিত্বে গৌড় ও বঙ্গ দুইটি রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনিই সমস্ত বরেন্দ্র-ভূমি, রাঢ়, বঙ্গ, বগদি, মিথিলা জয় করিয়া সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত করিয়াছিলেন, এবং পালরাজবংশ সহ বৌদ্ধ রাজত্বের শেষ চিহ্ন * পর্য্যন্ত নিঃশেষ করিয়া বাঙ্গালাদেশে সনাতন ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে পুনঃ স্থাপন করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন আরও সাতটি দেশের রাজগণ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়া তাঁহাকে অম্বুকর দিতেন। বল্লাল দ্বাদশ রাজ্যের অধিপতি হইয়া বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিলেন, এবং সার্ব্বভৌম সম্রাট্ উপাধি ধারণ করিলেন। এই উপলক্ষে তিনি শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদিগের প্রত্যেককে এক এক সুবর্ণগাভী ও অন্যান্য দ্রব্যাদি দান করিয়াছিলেন। প্রত্যেক সুবর্ণ গাভী ওজনে ১০৮ তোলা ছিল।

ভট্টশালীগ্রাম-নিবাসী শ্রোত্রিয়দিগের সংখ্যা অতিমাত্র বৃদ্ধি হইয়াছিল, তজ্জন্য তাঁহাদের একই গ্রামে বাস করা অসম্ভব হইয়াছিল। তাঁহারা সেই অসুবিধা সম্রাটের নিকট বিজ্ঞাপন করিলে, বল্লাল তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলিকে নিজ প্রকাণ্ড রাজ্যের নানা স্থানে প্রেরণ করিয়া তথায় তাঁহাদের ভরণ-পোষণের যোগ্য ব্রহ্মত্র দিয়াছিলেন। আর একশত ছাপান্ন ঘর শ্রোত্রিয়গণকে নিজ রাজধানীর নিকটেই রাখিয়া এক এক ঘরকে এক এক বিভিন্ন গ্রামে বাসস্থান দিয়া সেই সেই গ্রামেই তাঁহাদের ব্রহ্মত্র দিয়াছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে একশত ঘর গঙ্গার বাম পারে বরেন্দ্রভূমিতে বাসস্থান পাইয়া বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। আর ছাপ্পান্ন ঘর গঙ্গার অপর পারে রাঢ় দেশে ব্রহ্মত্র পাইয়া তথায় বাস করায় রাঢ়ী ব্রাহ্মণ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আর সেই সময়ে যিনি যে গ্রামে বাস করিয়াছিলেন, তদ্বংশীয়েরা সেই গাঁই বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। ইহাই রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগের প্রকৃত কারণ। ইদানীন্তন অনেকে শ্রোত্রিয়দের

---

* বৌদ্ধদের বহু মঠ ও সংঘারাম ছিল। সংঘারাম শব্দটি সংস্কৃত সংগ্রহম্ শব্দের অপভ্রংশ। ইহাতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা একত্র বাস করিতেন। বল্লাল সেই মঠ ও সংঘারামগুলি দেবালয়রূপে পরিণত করিয়াছিলেন।

রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগের অন্যান্য নানারূপ কারণ বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাহার একটিও যুক্তিসঙ্গত হয় না। যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ প্রথম গৌড়ে আগমন করেন, তাঁহাদের নাম বারেন্দ্র মতে নারায়ণ, সুষেণ, কশ্যপ, ধরাধর ও গৌতম। কিন্তু রাঢ়ীয় মতে তাঁহাদের নাম (ভট্ট) নারায়ণ, দক্ষ, শ্রীহর্ষ, বেদগর্ভ ও ছান্দড়। এইরূপ নামের ভিন্নতা দৃষ্টেই বোধ হয় তাঁহাদের ভিন্নতা কল্পিত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে উক্ত নামেরই ভিন্নতা, ব্যক্তির ভিন্নতা নহে। ঘটনা যখন ঠিক একই প্রকার, তখন নামের ভিন্নতা দৃষ্টে ব্যক্তির ভিন্নতা হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ মাত্রে সকলেরই দুইটি করিয়া নাম থাকে। একটি প্রকাশ্য ডাকিবার নাম, আর একটি সঙ্কল্পের নাম। প্রকাশ্য নাম কখন বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ হয়, কখন বা পাঁচকড়ি, বেচারাম, ফকীরচাঁদ প্রভৃতি অসংস্কৃত শব্দও হয়। কিন্তু সঙ্কল্পের নামগুলি সর্ব্বত্রই বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ। ছান্দড় শব্দটি বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ নহে। তদ্দৃষ্টে অনুমান হয় যে, রাঢ়ীয় কুলশাস্ত্রে উক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণের প্রকাশ্য নাম গৃহীত হইয়াছে, আর বারেন্দ্র কুলশাস্ত্রে তাঁহাদের সঙ্কল্পের নাম গৃহীত হইয়াছে। রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগ যে কেবল ব্রাহ্মণের মধ্যে আছে, তাহা নহে। বৈদ্য, কায়স্থ এবং অধিকাংশ অপর জাতির মধ্যেও আছে। বঙ্গরাজ রামপাল কর্ত্তৃক বহুসংখ্যক কায়স্থ পূর্ব্ববঙ্গে স্থাপিত হওয়ায় কায়স্থদিগের মধ্যে রাঢ়ী, বারেন্দ্র এবং বঙ্গজ, এই তিন শ্রেণী হইয়াছিল। পরে আবার কায়স্থদের মধ্যে উত্তররাঢ়ী ও দক্ষিণরাঢ়ী বিভাগ হওয়ায় কায়স্থের চারি শ্রেণী হইয়াছে। এই সকল শ্রেণী ও গাঁই বিভাগ যে কেবল বাসস্থানের নাম অনুসারে হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে লোকের বাসস্থান যত কেন পরিবর্ত্তিত না হউক, তজ্জন্য তাহাদের শ্রেণী বা গাঁই পরিবর্ত্তন হয় নাই।

যতদিন শ্রোত্রিয়েরা সকলেই একমাত্র ভট্টশালী গ্রামে বাস করিয়াছিলেন, ততদিন তাঁহারা আপনাদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া জ্ঞান করিতেন না। তাঁহারা কনোজের ভাষা, পরিচ্ছদ, আচার, ব্যবহার সমস্তই আপনাদের মধ্যে ঠিক রাখিয়াছিলেন। বাঙ্গালী লোকেও তাঁহাদিগকে পশ্চিমা ঠাকুর বলিত। পরে যখন তাঁহারা এক এক ঘর এক এক বিভিন্ন গ্রামে গিয়া বাস করিলেন, তখন সমস্ত বাঙ্গালীর মধ্যে এক ঘর পশ্চিমা ঠাকুর পূর্ব্ববৎ পার্থক্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। কোন কোন বিষয়ে বাঙ্গালী লোকে তাঁহাদের অনুকরণ

করিল, আবার কোন কোন বিষয়ে তাঁহারা বাঙ্গালীর অনুকরণ করিলেন; ফলতঃ তদবধি তাঁহারা ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালী হইলেন।

সভ্য জাতির মধ্যে সম্মান অতীব আদরণীয় পদার্থ। সম্মান লাভার্থে অথবা সম্মান রক্ষার্থে লোকে বহু কষ্ট স্বীকার করিতে পারে; এমন কি ধন, প্রাণ সর্ব্বস্ব দিতে পারে। সম্মান লাভার্থে সমস্ত প্রজা সৎপথে চলিবে, এই উদ্দেশ্যে বল্লালসেন কৌলীন্য মর্য্যাদা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শ্রোত্রিয়গণ মধ্যে যাঁহারা নবগুণবিশিষ্ট * ছিলেন, বল্লাল তাঁহাদিগকে কুলীন উপাধি দিয়াছিলেন। আর যাঁহারা অন্যূন ছয়টী গুণবিশিষ্ট, তাঁহারা সিদ্ধ শ্রোত্রিয়; অবশিষ্ট সমস্তই কষ্ট শ্রোত্রিয় হইয়াছিলেন। বৈদ্যদিগের মধ্যে যাহারা ধার্ম্মিক ও গুণবান্, সম্রাট্ তাহাদিগকেই কুলীন করিলেন। কায়স্থদিগের মধ্যে যাহারা শ্রোত্রিয়দের পরিচারক-সন্তান, বল্লাল তাহাদিগকেই কুলীন উপাধি দিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, শ্রোত্রিয়দের পরিচারক শূদ্রেরা অনেকে অবস্থা উন্নত করিয়াছিল। তন্মধ্যে দত্ত-গোষ্ঠীয়দের অবস্থাই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছিল। তাহারা আপনাদিগকে পরিচারক-সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করিয়া আনুযাত্রিক বলিয়া পরিচয় দিল। কিন্তু ঘোষ, বসু, গুহ ও মিত্র-বংশীয় পরিচারক-সন্তানদের সাক্ষ্য দ্বারা দত্ত-গোষ্ঠীর পরিচারকত্ব প্রমাণ হওয়ায় সম্রাট্ তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অকুলীন করিলেন। তজ্জন্য ঘোষ, বসু, গুহ ও মিত্রগোষ্ঠী কায়স্থদের মধ্যে কুলীন হইল; আর দত্তগোষ্ঠী এবং অপর অনুচর-সন্তানগণ সকলেই অকুলীন হইল †। ইহারাই এক্ষণে মৌলিক কায়স্থ নামে খ্যাত। তিলী, তাঁতি, কামার, কুমার প্রভৃতি সৎশূদ্রদের গুণ ও সঙ্গতি দেখিয়া তাহাদের শ্রেষ্ঠ লোকদিগকে বল্লাল কুলীন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদিগকে তিনি কুলীন উপাধি দেন নাই। তাহাদের কুলীনেরা মানী বা পরামাণিক নামে খ্যাত। অবশিষ্ট অপশূদ্রদের বল্লালী মর্য্যাদা হয় নাই। বল্লাল

---

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯

* আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং নিষ্ঠা শান্তি স্তপো দানং নবধা কুললক্ষণং॥

† রাজা রামপাল প্রভৃতি যে সকল উন্নত অবস্থাপন্ন শূদ্র কায়স্থ জাতিতে মিলিত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও অকুলীন। কৃত্রিম কায়স্থ অনেক হইয়াছে, কিন্তু তাহারা কেহই কুলীন হইতে পারে নাই।

সেই সকল মর্য্যাদা পুরুষানুক্রমিক করেন নাই। তিনি নিয়ম করিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক ছত্রিশ বৎসর অন্তে এক এক বার বাছনি হইবে, এবং তাহাতে গুণ ও কর্ম্ম দৃষ্টে পুনরায় কুলীন অকুলীন নির্ব্বাচিত হইবে। সুতরাং কুলমর্য্যাদা লাভার্থে সকলেই ধার্ম্মিক এবং গুণবান্ হইতে চেষ্টা করিবে। বল্লালের সেই আশা প্রথম প্রথম কতক সফলও হইয়াছিল। কিন্তু লক্ষ্মণসেনকৃত ব্যবস্থায় সেই কৌলীন্যপ্রথায় যে কুফল হইয়াছিল, তাহা পরে বর্ণিত হইবে।

শ্রীকৃষ্ণচরিতই কলিযুগে বড় মানুষের আদর্শ বলিয়া গণ্য ছিল। বল্লালও ঠিক সেই চরিত্রের লোক ছিলেন। অতি প্রাচীন বড় লোকদের যেমন সর্ব্বত্রই একই চরিত্র দেখা যায়, কলিযুগে বড়লোকদের চরিত্র তদ্রূপ নহে। তাঁহারা বহুরূপীর ন্যায় অবস্থানুসারে বিভিন্ন চরিত্র ধারণ করিতেন। বল্লালও সেইরূপ ছিলেন। তিনি গুরুজনের নিকট পরম ভক্ত, পিতামাতার নিকট আদরের ছেলে, যজ্ঞস্থলে পরম ধার্ম্মিক ও দাতা, সভা মধ্যে পণ্ডিত, যুদ্ধস্থলে মহাবীর, শত্রুদমনে চতুর প্রবঞ্চক এবং উপপত্নী-আগারে লম্পট মাতাল ছিলেন। পণ্ডিতেরা "বল্লালো নৃপসত্তমঃ" বলিয়া তাঁহার প্রশংসা করিতেন, এবং প্রজা ও ভৃত্যগণ "নৃপেষু বল্লালঃ শ্রেষ্ঠঃ" বলিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিত। তিনি ৪২ বৎসর কাল সর্ব্বজন-প্রশংসনীয়রূপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। যদি শেষ পর্য্যন্ত সেই ভাব চলিত, তবে বল্লাল একজন দেবাবতার বলিয়া গণ্য হইতে পারিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এমন দুইটি ঘটনা ঘটিল, যাহার জন্য সেই বল্লাল সর্ব্বজননিন্দিত হইয়া শেষ জীবন অতিবাহিত করিলেন।

এখন যেমন বৈদ্য ও কায়স্থ জাতি মধ্যে জিগীষা ভাব চলিতেছে, পূর্ব্বে বৈদ্য ও বৈশ্য মধ্যে তদ্বৎ জিগীষা ছিল। বাঙ্গালা দেশের বৈশ্যেরা সুবর্ণবণিক্, স্বর্ণকার, গন্ধবণিক্ এবং শঙ্খবণিক্ এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে সুবর্ণবণিকেরাই সর্ব্বাপেক্ষা ধনী ও প্রবল ছিল। বল্লভানন্দ শেঠ (শ্রেষ্ঠী) তাহাদের নেতা ছিলেন। তাঁহার যোল কোটি টাকার সঙ্গতি ছিল। বাঙ্গালা দেশে বৈদ্যেরাও বৈশ্যশ্রেণীতেই গণ্য ছিল। বৈদ্যেরা রাজপদ লাভ করিলে অন্যান্য বৈশ্যেরা তাহাদের সহ স্পষ্ট কোন বিবাদ করিত না। কিন্তু সুবর্ণবণিকেরা বৈদ্যদিগকে ভয় না করিয়া, তাহাদের সহ জেদ বাদ করিয়া চলিত। তাহাদিগকে অপদস্থ করিতে বৈদ্য রাজাদের ইচ্ছা প্রবল ছিল। কিন্তু সুযোগ

অভাবে কিছুই করিতে পারেন নাই। বল্লালের সময়ে সেই বিষয়ে একটি সুযোগ উপস্থিত হইল।

কুন্দন আচার্য্য নামক এক ব্রাহ্মণের বাটীতে অর্দ্ধরাত্র-কালে এক ব্রাহ্মণ অতিথি উপস্থিত হইল। কুন্দন বাড়ীতে ছিলেন না। তাঁহার পত্নীর হাতে কোন রোকড় টাকা কড়ী ছিল না। এত রাত্রিতে ধারে কোন দ্রব্য পাওয়া যায় না। অথচ অতিথিসেবা না করিলেও অধর্ম্ম হয়। দ্বিজপত্নী এই সঙ্কটে পড়িয়া রাজদত্ত সুবর্ণ ধেনু গচ্ছিত রাখিয়া মণিদত্ত নামক সুবর্ণবণিকের দোকান হইতে পঞ্চ বুটিকা (এক পয়সা) মূল্যের দ্রব্য আনিয়া অতিথির ভোজন করাইলেন। পরদিন কুন্দন গৃহে আসিয়া পত্নীর নিকট বৃত্তান্ত শুনিলেন এবং মণিদত্তের নিকটে গিয়া দ্রব্যমূল্য লইয়া স্বর্ণগাভী প্রত্যর্পণ করিতে বলিলেন।

মণিদত্ত দেখিল, সুবর্ণগাভীর মূল্য ষোল শত টাকা এবং নিজ প্রাপ্য কেবল এক পয়সা মাত্র। সে দুর্লোভের বশীভূত হইয়া সমস্ত ঘটনাই অস্বীকার করিল। কুন্দন নগরপালকে সংবাদ দিলেন। এদিকে মণিদত্ত সুবর্ণগাভী ভাঙ্গিয়া একটি ঢেঁপা তৈয়ারী করিল। নগরপাল সেই ঢেঁপার ওজন ঠিক ১০৮ তোলা দেখিয়া সন্দিহান হইল এবং ঢেঁপা সহ বণিক্‌কে বিচারার্থ চালান করিল। বল্লাল স্বয়ং সেই মকদ্দমার বিচার করিতে বসিলেন। এই উপলক্ষে সমস্ত সুবর্ণবণিক্‌-দিগকে পাতিত করা তাঁহার মনস্থ ছিল। মণিদত্ত বল্লভানন্দের ভাগিনেয়, সম্রাট্ তাহা জানিতেন। এজন্য তিনি বল্লভানন্দ শেঠকে ডাকিয়া ঐ সোণার গোলাতে অন্য কিছু মিশ্রিত আছে কি না তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। বল্লভ ভাগিনার স্নেহে মিথ্যা বলিলেন। বল্লাল তখন অন্যান্য সুবর্ণবণিক্‌দিগকে ডাকিয়া একে একে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা সকলেই তাহাদের দলপতি বল্লভানন্দের উক্তি সমর্থন করিল। তাহার পর বল্লাল গন্ধবণিক্ ও শঙ্খবণিক্‌দের মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা কহিল "আমরা সুবর্ণপরীক্ষায় সুপটু নহি, মহারাজ স্বর্ণকারদিগকে জিজ্ঞাসা করুন"। সম্রাট্ স্বর্ণকারদিগকে তলপ করিলেন। বল্লভানন্দ নিজ মিথ্যাবাক্য ধরা পড়িবে বুঝিয়া উৎকোচ দ্বারা স্বর্ণকারদিগকে বশীভূত করিলেন। তাহারাও শেঠের উক্তিই পোষণ করিল। কুন্দন সেই স্বর্ণ-তোলা নিজ স্বর্ণ-গাভীর বিকৃতি বলিয়া জিদ করিতে লাগিলেন। বল্লাল কাশীধাম হইতে স্বর্ণকার আনিলেন। তাহাদিগকে এরূপ সাবধানে

পরিবেষ্টিত রাখিলেন যে, তাহাদের সহ কেহ কোন রূপের চুক্তি করিতে পারিল না। সেই স্বর্ণকারেরা অষ্টধাতু ও অলক্তক-মিশ্রিত স্বর্ণ ঠিক ঢেঁপাতে প্রমাণ করিল। বল্লাল সেই বিদেশীয় স্বর্ণকারদিগকে পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলেন। সোণার ঢেঁপা এবং ক্ষতি পূরণ দিয়া কুশল আচার্য্যকে বিদায় দিলেন। তাহার পর স্বর্ণকার ও সুবর্ণবণিক্‌দিগকে পাতিত করিয়া কহিলেন "অদ্যাবধি এই সুবর্ণকীটেরা শিষ্টার কৃমি অপেক্ষাও অপকৃষ্ট গণ্য হইবে"। তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি নিঃসাৎ অর্থাৎ জব্দ হইল। তিনি তাহাদের মাথা মোড়াইয়া বগদির দক্ষিণাংশে নির্ব্বাসিত করিলেন। তাহারাই এখন সোণার বানিয়া এবং স্যাকরা নামে পরিচিত।

বাঙ্গালাদেশের আভ্যন্তরিক ইতিহাসে এই ঘটনা অতিগুরুতর। তাহার ফলাফল এখনও বাঙ্গালাদেশে বিদ্যমান আছে। এই জন্য এই বৃত্তান্ত বিস্তৃতরূপে লিখিলাম। স্বর্ণবণিক্ ও স্বর্ণকারদের পতনে দেশের অবস্থা যেরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে লিখিতেছি—

১। বল্লালের মাসিক লক্ষ নিষ্ক আয় ছিল। দশটাকা মূল্যের স্বর্ণ-মুদ্রার নাম নিষ্ক*। সুতরাং বল্লালের প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের বার্ষিক আয় মোট এক কোটি বিংশতি লক্ষ টাকা ছিল। তৎকালে সমস্ত দ্রব্যের মূল্য কম ছিল। সুতরাং তখন এই আয় অসাধারণ বলিয়া গণ্য ছিল। তথাপি তাহাতে বল্লালের ব্যয় সংকুলান হইত না। তাঁহার সদসৎ ব্যয় অত্যন্ত বেশি ছিল। তিনি সর্ব্বদাই ঋণগ্রস্ত ছিলেন। সুবর্ণবণিক্ ও স্বর্ণকারদের সমস্ত ধন জব্দ হওয়ায় বল্লালের দারিদ্র্য মোচন হইল। যে ধন কয়েক জন বণিকের নিজস্ব ছিল, বল্লালের দানশীলতায় সেই ধন সমস্ত সাম্রাজ্যে বিস্তৃত হইল। তাঁহার রাজ্যে দরিদ্র কেহই থাকিল না। কোন ব্যক্তির প্রচুর আয় সত্বেও সর্ব্বদা অনাটন থাকিলে তাহার দারিদ্র্যকে লোকে এখনও "বল্লালী দারিদ্র্য" বলে। ইদানীং মুর্শিদাবাদের নবাবেরও ঠিক বল্লালের ন্যায় দরিদ্র অবস্থা হওয়ায় ঐরূপ দারিদ্র্যকে "নবাবী দারিদ্র্য"ও লোকে বলিয়া থাকে।

---

* তখন এক তোলা স্বর্ণের মূল্য ১০৲ টাকা ছিল। এখন স্বর্ণের মূল্য বৃদ্ধি হইয়া এক তোলার দাম ২৫৲ টাকা হইয়াছে।

২। সুবর্ণবণিক্‌দের পতনে বণিকের সংখ্যা কম হওয়ায় শুঁড়ী ও তিলী জাতীয় কতকগুলি লোক সম্রাটের অনুমতি লইয়া দোকানদারী ও মহাজনী ব্যবসায় আরম্ভ করিল। সংস্কৃত ভাষায় বণিক্‌দিগকে "সাধু" বলে। ব্রজ-ভাষায় তাহার অপভ্রংশে "সাহু" বলে। বাঙ্গালা ভাষায় আবার "সাহু" শব্দের স্থানে "সাউ" বলে। সৌ, সাহা এবং সাঃ শব্দ সেই সাউ শব্দ হইতে উৎপন্ন। বাণিজ্যব্যবসায়ী শুঁড়ী ও তিলীদের সেই "সাহা" উপাধি হইয়াছে বটে, কিন্তু সামাজিক কার্য্যে তাহারা পূর্ব্ববৎ শুঁড়ী ও তিলী বলিয়াই গণ্য হইতেছে।

৩। স্বর্ণকারদিগের পতনে লৌহকারেরাই কতকটা স্বর্ণকারের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিল। তজ্জন্য স্বর্ণকার ও লৌহকার উপাধি লুপ্ত হইয়া উভয় ব্যবসায়ীদিগেরই "কর্ম্মকার" উপাধি হইয়াছে। বাঙ্গালা ভিন্ন অন্য কুত্রাপি "কর্ম্মকার" উপাধি কোন জাতির নাই। অন্যত্র সোনার এবং লোহার উপাধি চলিত আছে।

বল্লভানন্দ শেঠের কন্যা পদ্মিনী বল্লালকে প্রতিফল দিবার জন্য ছদ্মবেশে বল্লালের প্রমোদকাননে উপস্থিত হইল। সম্রাট্ মত্ত অবস্থায় তাহাকে বকুল বৃক্ষের ছায়ায় দেখিতে পাইলেন। পদ্মিনীকে পরম সুন্দরী যুবতী দেখিয়া বিমোহিত বল্লাল তাহাকে নিজ উপপত্নী করিলেন। সুন্দরী নিজ পরিচয় না দিয়া কেবল মাত্র কহিল "আমি ব্রাহ্মণী নহি"। সম্রাট্ অল্পদিন মধ্যেই পদ্মিনীর বশীভূত হইলেন। তিনি তাহার উচ্ছিষ্ট সুরা পান করিলেন; তিনি তাহার বাধ্য হইয়া সন্ধ্যা পূজা ত্যাগ করিলেন এবং স্বীয় উপবীত পদ্মিনীর চরণে সমর্পণ করিলেন। তখন পদ্মিনী আপনাকে হড্ডিকা বলিয়া পরিচয় দিল।

বল্লালের স্ত্রী পুত্র গুরু পুরোহিত এবং অমাত্য ভৃত্যগণ বারংবার তাঁহাকে হড্ডিকা ত্যাগের জন্য অনুরোধ করিল। তিনি হাস্যমুখে কহিলেন "আমি কাহাকেও ত্যাগ করিতে জানি না, সুতরাং আমি তাহা পারিব না। আমি কখন কাহাকেও কটু নিষ্ঠুর বাক্য বলি নাই, এবং বলিতে পারিব না। আমি কাহাকেও প্রতি-পালন করিতে অস্বীকার করি নাই, এবং তাহা করিতে পারিব না। আমার চক্ষুলজ্জা অত্যন্ত অধিক, আমি তাহা ত্যাগ করিতে পারিব না। ইহাতে ঈশ্বর আমার ভাগ্যে যাহা ঘটান, তাহা আমার অনিবার্য্য"। সম্রাটের এই অযোগ্য অথচ যথার্থ উত্তর শুনিয়া সকলেই চিন্তিত হইল। বল্লালের [illegible]-

ব্যাপী নিন্দা হইল। তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন হড্ডিকাকে বিদূরিত করিবার মানসে একদল সেনা সংগ্রহ করিলেন। নিজ জননী, গুরু, পুরোহিত এবং বৈদ্য সামন্তগণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া লক্ষ্মণ সেন বলপূর্ব্বক হড্ডিকাকে দেশান্তর করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু যখন বল্লাল তাঁহাকে নিবারণ করিতে সম্মুখীন হইলেন, তখন লক্ষ্মণের সেনাগণ সম্রাটের সহ যুদ্ধ না করিয়া পলায়ন করিল। লক্ষ্মণ নিজ জননী ও কতকগুলি বৈদ্য সামন্ত লইয়া রাঢ় দেশে গিয়া স্বাধীন হইলেন। বল্লাল সংবাদ পাইয়া পুত্রকে পত্র লিখিলেন "বৎস! তুমি আমার একমাত্র পুত্র এবং দ্বাদশ রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী। তুমি একমাত্র রাঢ় দেশের রাজা হইয়া নির্ব্বোধের কার্য্য করিয়াছ। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, তুমি আসিয়া সমস্ত সাম্রাজ্য গ্রহণ কর। আমি তীর্থবাস করিতে যাই।" লক্ষ্মণ পিতার পত্র পাঠে অতীব লজ্জিত হইলেন, কিন্তু মাতার প্রবর্ত্তনায় পিতার নিকট আসিলেন না। বল্লাল, পুত্রের কোন দণ্ড করিলেন না; বরং পুত্রবধূর অভিপ্রায় জানিয়া তাহাকেও রাঢ়ে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি লক্ষ্মণের বিদ্রোহের সাক্ষী কোন ব্যক্তিকেই কোন দণ্ড করেন নাই। লক্ষ্মণসেনের সহ যে সকল বৈশ্য রাঢ় দেশে গিয়াছিল, তাহারা রাঢ়ীয় বৈশ্যদের সহ মিলিত হইয়াছিল। তাহাদের অম্বষ্ঠ-নীতি মত উপনয়নাদি চলিতেছে। যাহারা বরেন্দ্রভূমিতে ছিল, তাহারা বল্লালের সহ সমাজবদ্ধ থাকায় হড্ডিকা-সংস্পৃষ্ট বলিয়া তাহাদের উপনয়ন হইত না। পদ্মিনী যে প্রকৃত পক্ষে বৈশ্যকন্যা, তাহা প্রকাশ হইলেও বারেন্দ্র বৈশ্যেরা অপকৃষ্ট ভাবেই ছিল। গত বিশ বৎসর মধ্যে তাঁহারাও প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপবীত ধারণ করিতেছেন।

বল্লালের গুরু পুরোহিত এবং সভাস্থ পণ্ডিতেরা দেখিলেন যে, সম্রাট্ অপজাতিসংস্রবে ভ্রষ্টাচার ও পতিত হইয়াছেন। তাঁহার নিকটে থাকিলে সংস্রবদোষ অবশ্য ঘটিবে। এজন্য তাঁহারা দূরদেশে গিয়া বাস করিলেন। রাজপুরোহিত ভীম ওঝা কালিয়াগ্রামবাসী ছিলেন। তদ্বংশীয়েরা অদ্যাপি কালিয়াই গোষ্ঠী বলিয়া পরিচিত। সেই ভীম ওঝা কালিয়া গ্রাম ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে গিয়া ছাতক নামক গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। তখন পূর্ব্ববঙ্গে আর শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ছিল না। এজন্য ভীমের সন্তানদিগকে লোকে "বাঙ্গাল

ওঝা” বলিত। এই সময়ে কতকগুলি শ্রোত্রিয় দক্ষিণ বাঙ্গালায় গিয়া নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে বাস করিয়াছিলেন। গৌড় নগর একবারে শ্রোত্রিয়শূন্য হইয়াছিল। তথাপি বল্লাল কোনরূপ কটু ব্যবহার করেন নাই। বরং হাতক, নবদ্বীপ ও শান্তিপুর-প্রস্থিত বিপ্রগণের ভরণ পোষণ জন্য তথাতেই তাঁহাদিগকে ব্রহ্মত্ব দিয়াছিলেন। বল্লালের জামাতা হরিসেন বকদ্বীপে গিয়া বনমধ্যে বাস করিয়াছিলেন। সম্রাট্ তাঁহাকেও সেই স্থলে “জামাইভাতা” দিয়াছিলেন। ঐ স্থান এখন যশোর জেলায় অবস্থিত এবং সেনহাটী নামে খ্যাত।

এইরূপে সুবর্ণবণিক্‌দের পতনে বহুলোকের অবস্থা পরিবর্ত্তন, ব্যবসায় পরিবর্ত্তন ও বাসস্থান পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল; যাহার ফলাফল অদ্যাপি বাঙ্গালাদেশে অধিকাংশই বিদ্যমান আছে। বল্লাল সর্ব্বজননিন্দিত ও সজ্জনপরিত্যক্ত হইয়া আট বৎসর হড্ডিকা-প্রেমে বিমুগ্ধ থাকিলেন। তাহার পর চৌষট্টি বৎসর বয়সে বল্লালের কঠিন ব্যারাম হইল। বল্লাল অতি সুষ্ঠকায় ছিলেন, তাঁহার ব্যারাম কদাচিৎ হইত, বিশেষতঃ গুরুতর ব্যাধি পূর্ব্বে কখন হয় নাই। এক্ষণে বৃদ্ধকালে সর্ব্বপ্রথম কঠিন পীড়া হওয়ায় চিকিৎসকেরা সেই রোগ সাংঘাতিক বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। সম্রাট্ লক্ষ্মণসেনকে নিকটে আনিতে দূত পাঠাইলেন এবং স্বয়ং গঙ্গাতীরে কানসাটে চলিলেন। সেই স্থানে একদিন সন্ধ্যার পর হড্ডিকা মলিন বেশে বল্লালের নিকটে আসিয়া উগ্রভাবে কহিল “বল্লাল! আমি হড্ডিকা নহি, আমি বল্লভানন্দ শেঠের কন্যা পদ্মিনী। রাজা যে প্রজার নিকট কর গ্রহণ করেন, সেই প্রজার সর্ব্বদা হিত সাধন করাই রাজধর্ম্ম। নতুবা রাজা দস্যুতুল্য হন এবং গৃহীত কর অপহরণ করা হয়। তুমি জাতিবিদ্বেষের পরবশ হইয়া রাজধর্ম্ম লঙ্ঘন করিয়া কূটবিচারে আমার পিতৃকুলকে পাতিত করিয়াছ। আমিও প্রতিহিংসা-পরবশ হইয়া সতীধর্ম্ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক তোমার ভোগ্যা হইয়াছিলাম এবং তোমাকে ও তোমার স্বজাতিগণকে পাতিত করিয়াছি। অন্যের অনিষ্ট করিব না বলিয়া আমার প্রতিজ্ঞা ছিল। তজ্জন্য তোমার প্রচুর রক্ষা হইয়াছে, নতুবা আমি তোমার দ্বারা ব্রহ্মহত্যা গোহত্যা সকলই করাইতে পারিতাম। যাহা হউক, আমার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। তোমার আসন্ন সময়ে আমি তোমার আর কোন অনিষ্ট করিতে চাই না। তুমি নিজকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর। আমি তোমার অন্নে পালিত হইয়া কপটতা পূর্ব্বক তোমার যে সকল অনিষ্ট করিয়াছি, সেই পাপ

বিমোচন জন্য গঙ্গাতে আত্মবিসর্জ্জন করিতে মনস্থ করিয়াছি। তুমি আমাকে যে সকল রত্নালঙ্কার দিয়াছিলে, তাহা গ্রহণ কর"। এই বলিয়া পদ্মিনী বস্ত্রাবদ্ধ অলঙ্কারাদি সম্রাটের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া অতি দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। বল্লাল ডাকিলেন, পদ্মিনী ফিরিল না। তিনি পদ্মিনীকে ফিরাইয়া আনিতে ভৃত্যদের প্রতি আদেশ করিলেন। কিন্তু তাহারা পদ্মিনীর কোন উদ্দেশ পাইল না। সম্রাট্ গম্ভীর ভাবে স্বীয় অপকর্ম্ম স্মরণ করিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় দিন পূর্ব্বাহ্ণে লক্ষ্মণসেনের পুত্র দ্বাদশবর্ষীয় মধুসেন আসিয়া পিতামহের বন্দনা করিল। বল্লাল তাহার পরিচয় পাইয়া আহ্লাদে উঠিয়া বসিলেন এবং মধুকে বক্ষে ধারণ করিয়া বারংবার চুম্বন করিলেন। এই সময়ে তিনি তিনটি শ্লোক পড়িয়াছিলেন, তাহার অর্থ এই যে—

(১) আমি যত্ন পূর্ব্বক যে বিষবৃক্ষ রোপণ করিয়া পঞ্চামৃত দ্বারা সেচন করিয়াছিলাম, কি আশ্চর্য্য যে, এই অমৃত ফলটি সেই বিষবৃক্ষেই উৎপন্ন হইয়াছে।

(২) আশ্চর্য্যই বা কিরূপে বলি, যখন সর্প ব্যাঘ্রাদি মারাত্মক হিংস্র জন্তুর শরীর হইতে এমন সমস্ত মহৌষধ প্রস্তুত হয়, যদ্দ্বারা উৎকট ব্যাধি আরাম হয় এবং মুমূর্ষু লোকের প্রাণ রক্ষা হয়।

(৩) অথবা আমার স্ত্রী পুত্র আমার পাপের উপভোগ্য নরকস্বরূপ। আর সর্ব্বপ্রকার মধু হইতে সুমধুর যে এই মধু (মধুসেন), সে আমার পিতৃপুণ্যের ফল।

লক্ষ্মণসেন গোপনে কানসাটের সংবাদ এরূপ যোজনা করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, প্রতি দণ্ডে দণ্ডে তাঁহার নিকট সমাচার পৌঁছিত। তিনি পদ্মিনীর আত্মবিসর্জ্জন-বার্ত্তা পাইবা মাত্র আট জন পণ্ডিত সহ মধুসেনকে কানসাটে পাঠাইয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সমস্ত পণ্ডিতগণ বল্লালের সভা ত্যাগ করিয়াছিলেন। এখন মধুসেন সহ সমাগত পণ্ডিতগণ পাইয়া বল্লাল শাস্ত্রমত প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। তদুপলক্ষে গঙ্গাস্নান ও পরিশ্রমে বৃদ্ধ সম্রাটের রুগ্নদেহ একবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল। চিকিৎসকেরা নাড়ী ধরিয়া কহিলেন "মহারাজ! সময় আগত"। বল্লাল কহিলেন "আমিও প্রস্তুত। পৃথিবীতে যত প্রকার সুখ হইতে পারে, আমি তাহা সমস্তই দীর্ঘ কাল ভোগ করিয়া বিতৃষ্ণ হইয়াছি। আমার একমাত্র দুঃখ ছিল যে, অন্তিম কালে আমার

সন্তানগণ কেহই নিকটে নাই। শ্রীমান্ মধুকে পাইয়া আমার সেই দুঃখেরও অবসান হইয়াছে। সংসার দুঃখসাগর ; তাহা হইতে এই সময়ে অবসর লওয়াই ক্ষেম। আমার রাজত্ব, প্রভুত্ব, ধনসর্ব্বস্ব আমি সমস্তই মধুকে দিলাম। এই মধুই আমার একমাত্র উত্তরাধিকারী। আমাকে অবিলম্বে গঙ্গাতে লইয়া চল।” আজ্ঞাপেক্ষী ভৃত্যগণ তাঁহাকে গঙ্গাবক্ষে লইয়া গেল। বল্লাল নাভি পর্য্যন্ত গঙ্গা-জলে ডুবাইয়া ইষ্ট মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে তারকব্রহ্ম রাম নাম উচ্চৈঃস্বরে উদ্‌গীত হইল। সহসা ব্রহ্মরন্ধ্র স্ফুটিত হইয়া অগ্নিশিখার ন্যায় প্রাণ-বায়ু নির্গত হইল। বঙ্গের অদ্বিতীয় সম্রাট্ বল্লালসেনের কীর্ত্তিময়ী মানবলীলা শেষ হইল। দ্রুতগামী জলকার যোগে লক্ষ্মণসেনের নিকট সমাচার প্রেরিত হইল। মধুসেন রাজপ্রতিনিধিরূপে মৃত সম্রাটের মুদ্রাঙ্ক ভাঙ্গিতে এবং দেহ অগ্নি-সাৎ করিতে আদেশ করিলেন। তিনি নিজেই পিতামহের অগ্নিকার্য্য যথাসময়ে সমাপন করিয়া পূরক পিণ্ড দিলেন।

লক্ষ্মণসেন।

লক্ষ্মণসেন কানসাটে আসিয়া পিতার অন্তিম শ্লোকত্রয় শুনিয়া শোকে অশ্রু-পাত করিলেন। তিনি কহিলেন “আমি যথার্থই বিষবৃক্ষ ; আমার ন্যায় কুপুত্রের দায় গ্রহণ অনুচিত। পিতা মধুকে উত্তরাধিকারী নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সুতরাং রাজত্ব সঙ্গতরূপে তাহারই প্রাপ্য”। তিনি শোকে রোদন করিলেন। বৈদ্য সামন্তেরাও বল্লালের গুণরাশি স্মরণ করিয়া আক্ষেপ করিল। উপস্থিত পণ্ডিতেরা কহিলেন “মধু নাবালক ; সে সদাশয় হইলেও তাহা দ্বারা সাম্রাজ্য শাসন চলিতে পারে না। সে রাজা হইলে অশাসন ও পরিবেদন দুইটি দোষ হইবে। অতএব আপনি রাজত্ব গ্রহণ করুন। শাস্ত্রমতে ঋকৃথ ভোগে পিতাপুত্রে ভিন্নতা নাই। নাবালক মধু রাজা হইলেও আপনি তদুপরি কর্ত্তা আর আপনি রাজা হইলেও মধু যুবরাজ। সুতরাং স্বর্গীয় সম্রাট্ রাজত্ব মধুকে দিলেও তজ্জন্য আপনকার রাজত্ব গ্রহণে কোন দোষ হইবে না। প্রজার সুপালন দ্বারা রাজার সর্ব্বপাপ ধ্বংস হয়। কুরুরাজ দুর্য্যোধন বহুপাপী হইয়াও প্রজাপালনে সুব্রত হেতু স্বর্গ-লাভ করিয়াছিলেন। অতএব আপনি রাজত্ব গ্রহণ করিয়া প্রজা পালনে ব্রতী

হউন। তদ্দ্বারাই সর্ব্বপাপ-বিমুক্ত হইয়া অন্তিমে স্বর্গলাভ করিতে পারিবেন। যদি অভিষেকের পূর্ব্বেই পাপক্ষয় করিতে চান, তবে যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করুন। মনে কোনরূপ দ্বিধা রাখিবেন না”। লক্ষ্মণসেন পিতৃদ্রোহপাপ ক্ষয় জন্য ১০৮টি জলাশয় খনন করাইয়া উৎসর্গ করিলেন। পরে তিনি ও তদনুচর বৈদ্য সামন্তগণ রাজদ্রোহপাপ শান্তি জন্য চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। এই সকল কার্য্যে প্রায় দুই বৎসর গত হইল। তাহার পর লক্ষ্মণসেন অভিষিক্ত হইয়া রাজতিলক ধারণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার মন সর্ব্বদা নিরুৎসাহ থাকিত। যখন পিতার অন্তিম শ্লোক তাঁহার মনে উদয় হইত, তিনি তখনই অশ্রুপাত করিতেন। লক্ষ্মণসেন স্বায়ত্ত পঞ্চরাজ্যের অধীশ্বর হইলেন। কিন্তু বশী রাজারা তাঁহাকে কর দিলেন না। এইরূপ ঘটনা নূতন নহে। হিন্দুদের মধ্যে এরূপ ঘটনা প্রায় সর্ব্বদাই ঘটিত। কোন সার্ব্বভৌমের অভাব হইলে বশী রাজারা অমনি প্রপন্ন হইতে চেষ্টা করিত। নিজ পরাক্রম না দেখাইয়া কেবল মৃত সম্রাটের উত্তরাধিকারিস্বত্বে কেহ বশী রাজাদের নিকট অনুকর পাইত না, সুতরাং রাজ্য প্রাপ্তি মাত্র কেহ সার্ব্বভৌম হইত না। লক্ষ্মণসেন অবাধ্য বশী রাজাদিগকে বাধ্য করিতে চেষ্টা করেন নাই, সুতরাং তিনি সার্ব্বভৌম সম্রাট্ উপাধি প্রাপ্ত হন নাই।

লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের পঞ্চদশ বর্ষে শ্রোত্রিয়দিগের দ্বিতীয় বার বাছনি করিয়া কৌলীন্য মর্য্যদা দানের সময় হইল। রাজা নিজ সভাসদ্ পণ্ডিতগণ লইয়া বাছনি করিলেন। তৎকালে কোন সাধারণ পরীক্ষার নিয়ম ছিল না। দুই চারি দিনের পরীক্ষা দ্বারাও প্রকৃত বিদ্যা বুদ্ধির পরিমাণ ঠিক হয় না। বিশেষতঃ ধর্ম্মশীলতার পরিমাণ নিরূপণ জন্য কোন সাধারণ পরীক্ষাই হইতে পারে না। সুতরাং লক্ষ্মণসেনের কৃত নির্ব্বাচন যে খুব বিশুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। এই বাছনি ক্রমে কাহারও উন্নতি হয় নাই, বরং কয়েক শ্রেণীর কয়েক জন লোকের অধঃপতন হইয়াছিল। বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে ভরদ্বাজগোত্রীয় ভাদড় গাঁই কুলীনেরা পতিত হইয়া সিদ্ধ শ্রোত্রিয় হইলেন। রাঢ়ী শ্রেণীর মধ্যে কতকটি কুলীন পতিত হইয়া “বংশজ” নামে খ্যাত হইলেন। বারেন্দ্র মধ্যে বংশজ নাই। এবার বাছনিক্রমে যাঁহাদের মর্য্যাদা পূর্ব্বাপেক্ষা কম হইল অথবা যাঁহারা বাঞ্ছিত উন্নতিলাভে অযথা নিরাশ হইলেন, তাঁহারা মহা গোলযোগ উপস্থিত করিলেন। তাহাতে ক্রমশঃ তর্কবিতর্ক, রাগারাগি, গালাগালি, অবশেষে মারামারি পর্য্যন্ত

হইল। যাহার আশা ভঙ্গ হইল, তিনি রাজাকে ও নির্ব্বাচক পণ্ডিতগণকে শাপ দিতে দিতে চলিয়া গেলেন। পিতার ন্যায় লক্ষ্মণের তেজস্বিতা ছিল না। বল্লাল হাস্যমুখে ভিন্ন কটুমুখে কথা কহিতেন না, কাহারও কোন দণ্ড করিতেন না, অথচ তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেন; কেহ তাঁহার প্রতিবাদ করিতে সাহস পাইত না। কিন্তু এই উপলক্ষে অনেকগুলি শ্রোত্রিয় রাজা লক্ষ্মণসেনকে প্রচুর তিরস্কার করিলেন এবং অভিসম্পাত পর্য্যন্ত করিলেন। লক্ষ্মণসেন বিবেচনা করিলেন যে, নির্ব্বাচনপ্রথা প্রচলিত থাকিলে এইরূপ গোলযোগ প্রত্যেক বাছনি উপলক্ষেই হইবে। অতএব তিনি নির্ব্বাচনপ্রথা একবারে উঠাইয়া দিয়া নিয়ম করিলেন যে "এই অবধি কৌলীন্য মর্য্যাদা বংশানুক্রমিক হইবে এবং পুত্র-কন্যার বিবাহের উৎকর্ষ অপকর্ষ দ্বারা সেই মর্য্যাদা হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারিবে। পুনরায় আর বাছনি করিয়া মর্য্যাদা প্রদান করা হইবে না।

শ্রোত্রিয়দিগের বাছনি করিতে বিষম গোল দেখিয়া রাজা বৈদ্য কায়স্থাদি অন্য কোন জাতির বাছনি করিলেন না। যাহার যে মর্য্যাদা ছিল, তাহাই বংশানুক্রমিক থাকিল। কেবল পুত্র-কন্যার বিবাহ দ্বারা সেই মর্য্যাদা হ্রাস বৃদ্ধির এক মাত্র উপায় করা হইল।

এই নূতন নিয়ম দ্বারা নির্ব্বাচনের গোলযোগ শান্তি হইল বটে, কিন্তু অন্যান্য সহস্র দোষ উপচিত হইল। শ্রোত্রিয়গণ বহুব্যয় করিয়া কুলীনে কন্যাদান করিয়া কুল মর্য্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিল। কুলীনেরা অর্থলোভে বহুবিবাহ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ জীবিকা নির্ব্বাহ জন্য বিবাহই একমাত্র ব্যবসায় করিয়া তুলিলেন। কুলীন কন্যাদের বিবাহ কেবল নামমাত্র হইত। তাহারা প্রায় সমস্ত জীবনকাল পিতৃগৃহেই থাকিত। যে যে মহদ্‌গুণে প্রথম কৌলীন্য মর্য্যাদা লাভ হইত, কুলীনপুত্রেরা সে সমস্ত গুণ উপেক্ষা করিয়া কেবল বিবাহ বিষয়ে কুল রক্ষা করত সম্পূর্ণ কুলগৌরব ভোগ করিতে লাগিলেন। কষ্ট শ্রোত্রিয়ের সন্তান সহস্র গুণবান্ হইয়াও নিকৃষ্টই থাকিলেন। তাঁহাদের অনেকেরই বিবাহ হইত না। বিবাহ বিষয়ে এইরূপ বৈষম্য হেতু ব্যভিচার দোষ উৎপন্ন হইল। কষ্ট শ্রোত্রিয় ও বংশজদিগের বিবাহ না হওয়ায় বংশলোপ হইতে লাগিল। ফলতঃ যে সদুদ্দেশে বল্লাল কৌলীন্য মর্য্যাদা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা না হইয়া সেই মর্য্যাদা অসংখ্য অনিষ্টের কারণ হইয়াছিল।

মহারাজ লক্ষ্মণসেন অতি সুন্দর দীর্ঘ পুষ্ট বলবান্ ছিলেন। তিনি অস্ত্র ও অশ্বচালনে সুপটু ছিলেন। তিনি বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, জিতেন্দ্রিয় এবং ধর্ম্মশীল ছিলেন। তিনি সদ্বক্তা, প্রজাবৎসল, অপক্ষপাতী, সুবিচারক, একান্ত গুণগ্রাহী এবং শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন। কিন্তু অস্থিরচিত্ত, অনুদ্যোগী ছিলেন। তাঁহার সাহস এবং কষ্টসহিষ্ণুতা বোধ হয় কম ছিল। তিনি মাতার পরামর্শে পিতার অবাধ্য হইয়াছিলেন এবং পিতৃশাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তজ্জন্য পরে সর্ব্বদা আক্ষেপ করিতেন। তাঁহার মাতার গলৎকুষ্ঠ রোগ হইলে তিনি মাতাকে বলিয়াছিলেন "স্ত্রীজাতির পক্ষে স্বামী মহাগুরু। তুমি স্বামীর সহ সদ্ব্যবহার কর নাই। তোমারই কুপরামর্শে আমিও পিতার সহ সদ্ব্যবহার করিতে পারি নাই। তোমার এই ব্যাধি সেই মহাপাপের ফল"। তাঁহার মাতা ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দিলেন "তুই যেমন আমার কলঙ্ক উদ্‌ঘোষণ করিলি, তেমনি তোর চিরস্থায়ী কলঙ্ক হইবে"। এইরূপে অস্থিরচিত্ত রাজা পিতার ও মাতার শাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন এবং উভয় শাপই ফলিয়াছিল।

লক্ষ্মণসেনের প্রজাপালনপ্রণালী অতীব উৎকৃষ্ট; এমন কি, অতুল্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি প্রত্যেক প্রজার অবস্থা ও চরিত্র তদন্ত করিতেন এবং প্রত্যেকের অভাব মোচন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহের সদুপায় করিয়া দিতেন। তাঁহার রাজ্যে নিতান্ত দরিদ্র কেহই ছিল না। "অভাবে স্বভাব নষ্ট" একটি প্রসিদ্ধ কথা। তাঁহার রাজত্বে কাহারও অভাব না থাকায় চুরি ডাকাতী প্রভৃতি কুকর্ম্ম করিতে কাহারও প্রবৃত্তি ছিল না। তিনি সুবর্ণবণিক্‌দের পাতিত্য খণ্ডন করেন নাই বটে; কিন্তু তাহাদিগকে পুনরায় বাণিজ্য ব্যবসায় করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। তিনি শিল্প, বাণিজ্য, কৃষিকার্য্য ও সঙ্গীতবিদ্যার উন্নতি সাধনে বিশেষ যত্নশীল ছিলেন। তিনি শ্রোত্রিয়দিগকে বিদ্যার এবং ধর্ম্মচর্চ্চার জন্য সর্ব্বদা উৎসাহ দিতেন। তিনি নিজে পণ্ডিত ছিলেন। তিনি পণ্ডিতদিগের পরীক্ষা করিয়া যথেষ্ট পুরস্কার দিতেন। তজ্জন্য তাঁহার রাজত্বে বাঙ্গালা দেশ আর্য্যবিদ্যার প্রধান স্থল হইয়াছিল। চিকিৎসাবিদ্যার প্রতি তাঁহার অনুরাগ সর্ব্বাপেক্ষা বেশি ছিল। তিনি বৈদ্যগণকে বলিতেন যে "চিকিৎসাই আমাদের জাতীয় বিদ্যা; যেমন গায়ত্রীহীন ব্রাহ্মণ, যুদ্ধবিমুখ ক্ষত্রিয়, আয়ুর্ব্বেদবিহীন বৈদ্যও তদ্রূপ জঘন্য"। তিনি বৈদ্যদিগকে প্রত্যেক বস্তুর গুণ নির্ণয় জন্য আদেশ দিয়া-

ছিলেন এবং সেই কার্য্যের সাহায্য জন্য বিজ্ঞ কবিরাজদিগকে "রোম্‌থা" যোগাইতেন।

হিন্দুরাজ্যে প্রাণদণ্ডের অপরাধীদিগকে চারি প্রকারে প্রাণদণ্ড করা হইত। (১) মশানে লইয়া কালীদেবীর সম্মুখে বলিদান, (২) শূলে দেওয়া, (৩) হাত পা বাঁধিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ, (৪) সজীব অবস্থায় মাটিতে পুতিয়া ফেলা। অতি সম্ভ্রান্তবংশীয় অপরাধীদিগের প্রথম প্রকারে প্রাণদণ্ড করা হইত। আর মহাব্যাধিযুক্ত অপরাধীদিগের চতুর্থ প্রকারে প্রাণদণ্ড হইত। প্রথম ও চতুর্থ প্রকারে দণ্ডনীয় অপরাধীরা রোম্‌থা হইত না। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারের অপরাধী মধ্যে যাহাদিগকে সবল ও সুস্থদেহ দেখা যাইত, চিকিৎসকেরা তাহাদিগকে রাজার নিকট চাহিয়া লইয়া "রোম্‌থা" করিতেন। রোম্‌থাদিগের কপালে উল্‌কি দ্বারা "রোম্‌থা" এই শব্দটি চিরস্থায়ী রূপে লিখিয়া দেওয়া হইত। রোম্‌থাদের দেহ এবং প্রাণ কবিরাজদের সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন ছিল। কবিরাজেরা তাহাদের শরীরে ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিতেন। কোন্ ঔষধ খাইলে বা মালিশ করিলে মনুষ্যদেহে কি ফল হয়, তাহা নিরূপণ জন্য কবিরাজেরা সেই বস্তু রোম্‌থা-দিগকে খাওয়াইতেন বা মালিশ করিতেন। তাহাতে রোম্‌থার ব্যারাম হউক বা মৃত্যু হউক, তজ্জন্য কবিরাজের কোন অপরাধ হইত না। কখন বা রোম্‌থাকে বাঁধিয়া তপ্তৈতল বা ঘৃতপূর্ণ কটাহে ফেলিয়া দিয়া "মহামাষ তৈল, মহামাষ ঘৃত" তৈয়ারী করা হইত। অন্য সময়ে রোম্‌থারা কবিরাজের ভৃত্যের কাজ করিত। কখন বা কবিরাজেরা তুষ্ট হইয়া কোন কোন রোম্‌থাকে বাড়ী যাইতে ছুটি দিতেন অথবা একবারেই মুক্তি দিতেন। কবিরাজেরা মুক্তি দিলে রোম্‌থার পূর্ব্ব অপরাধের জন্য আর কোন দণ্ড হইত না। ইংরেজ রাজত্বে রোম্‌থা না পাওয়ায় কবিরাজদিগের অনেক ঔষধ এখন তৈয়ারি হয় না।

রোম্‌থা।

লক্ষ্মণসেনের যত্নে, ব্যয়ে এবং উৎসাহে বাঙ্গালী বৈদ্যেরা চিকিৎসাবিদ্যায় পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিল। কালক্রমে রাজকীয় সাহায্য অভাবে, অর্থাভাবে, ঔষধের সামগ্রী অভাবে বৈদ্যচিকিৎসার গুণ বিস্তর হ্রাস হইয়াছে বটে, তথাপি আর্য্য চিকিৎসাবিদ্যায় অন্য কেহ অদ্যাপি বাঙ্গালীদের তুল্য হইতে পারে নাই। নাড়ীজ্ঞান বাঙ্গালী চিকিৎসকের তুল্য অন্য কোন জাতীয় চিকিৎসকের নাই।

লক্ষ্মণসেন জিতেন্দ্রিয়, অপক্ষপাতী সুবিচারক ছিলেন। তিনি যদি শান্তিময় সময়ে রাজা হইতেন, তবে তাঁহার চিরস্থায়ী সুযশ হইত। কিন্তু তাঁহার সময়ে সকল গুণ অপেক্ষা যুদ্ধবিক্রম অধিকতর প্রয়োজনীয় ছিল, অথচ সেই গুণ লক্ষ্মণের নিতান্ত কম ছিল। সেই জন্য তিনি চিরস্থায়ী কলঙ্কভাগী হইলেন এবং বিদেশে নিঃসহায় অবস্থায় মানবলীলা সংবরণ করিলেন।

লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের পঁয়তাল্লিশ বর্ষে যখন তাঁহার বয়স প্রায় আশীবৎসর, সেই সময়ে শেখ জালালুদ্দীন নামক একজন মুসলমান সাধু (দরবেশ) পারস্য দেশের তব্‌রেজ নগর হইতে ভ্রমণ করিতে করিতে গৌড় নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেন সেই সাধুর অসাধরণ গুণগ্রাম দৃষ্টে তাঁহাকে বাইশ হাজার বিঘা ভূমি নিষ্কর দিয়াছিলেন। সেই বাইশ হাজারী পীরপাল এখনও মালদহ জেলায় বিদ্যমান আছে। সেই মুসলমান সাধুর বৃত্তান্ত লইয়া "শেখ শুভোদয়া" নামক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সেই গ্রন্থ হইতে বৈদ্যরাজবংশের কতক বিবরণ জানা যায়।

শেখশুভোদয়া।

রাজা লক্ষ্মণসেন সেই দরবেশের প্রমুখাৎ শুনিলেন যে, তাঁহার রাজধানী অচিরে মুসলমানেরা অধিকার করিবে। রাজা নিজ সভাস্থ পণ্ডিতগণকে তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করায় তাঁহারাও গণনা করিয়া সেই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেন। ইহাতে লক্ষ্মণসেনের মনে ঘোর বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। তিনি মধুসেনের উপর রাজ্যভার দিয়া নিজে কতিপয় পণ্ডিত সহ নবদ্বীপে গিয়া গঙ্গাবাস করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপ তৎকালে ভাগীরথীর পবিত্র-সলিল-পরিবেষ্টিত প্রকৃত দ্বীপ ছিল এবং তীর্থ স্থান বলিয়া গণ্য ছিল। নবদ্বীপ রাজধানী ছিল না অথবা সমৃদ্ধ নগর ছিল না। তথায় কোন দুর্গ ছিল না এবং সৈন্যের ছাউনী ছিল না। তথায় কোন রাজকার্য্য হইত না এবং রাজপরিবারও তথায় থাকিত না। লক্ষ্মণসেন একাকী তথায় কতিপয় পণ্ডিত ও ভৃত্য সহ থাকিয়া জপ তপ পূজা এবং ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনায় সময় ক্ষেপণ করিতেন মাত্র। রাজা তথায় কেবল একবৎসর দশমাস মাত্র থাকার পর ঐ স্থান মুসলমান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল।

রামপ্রসাদ নামক একজন ক্ষত্রিয় বা পাঞ্জাবী ক্ষেত্রি গজনীপতি সাহেবুদ্দীন মহম্মদ গোরী কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া উক্ত সম্রাটের গোলাম হইয়াছিল। সে মুসলমান

ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কুতুবুদ্দীন নাম ধারণ করিয়াছিল এবং আদিষ্ট কার্য্যে দক্ষতা দেখাইয়া উক্ত সম্রাটের প্রিয়পাত্র হইয়াছিল। সম্রাটের কোন সন্তান ছিল না। তাঁহার প্রিয়তম চল্লিশ জন গোলামই তাঁহার পুত্রবৎ হইয়াছিল। সেই গোলামের দলমধ্যে উক্ত কুতুবুদ্দীন এবং এলদোস খাঁ সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। গোরীর মৃত্যুর পর এলদোস খাঁ সিন্ধুর পশ্চিম পারে এবং কুতুবুদ্দীন সিন্ধুর পূর্ব্বপারে স্বাধীন সম্রাট্ হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রভুর জীবদ্দশায় যখন কুতুব দিল্লীর শাসক মাত্র ছিলেন, সেই সময়ে তিনি নিজের অধীন সেনাদল লইয়া অযোধ্যা, প্রয়াগ ও কাশীধাম পর্য্যন্ত জয় করিয়া নিজ অধিকার বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাহার পর কুতুবুদ্দীন মগধ ও গৌড়রাজ্য জয় করার জন্য নিজ সেনাপতি বখ্‌তিয়ার গিল্‌জীকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে নবোৎসাহে মুসলমানেরা সর্ব্বত্রই অজেয় হইয়াছিল। বখ্‌তিয়ার অতি সহজেই মগধ রাজ্য অধিকার করিলেন। তিনি শুনিলেন যে, পঞ্চরাজ্যের অধিপতি লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপে বাস করেন। এজন্য তিনি ঐ স্থানই রাজধানী বিবেচনায় তাহাই আক্রমণ করিতে চলিলেন। তিনি ভাগীরথীর পশ্চিম পারে জঙ্গলে সমস্ত সেনা সহ গোপনে থাকিলেন এবং তাজীম খাঁর অধীনে সতর জন মাত্র অশ্বারোহী ছলপূর্ব্বক তোরণদ্বার অধিকার জন্য পাঠাইলেন। তাজীম প্রচার করিলেন যে, তাঁহার উপরিস্থ সেনাপতি সহ বিবাদ হওয়ায় তিনি গৌড়াধিপতির নিকট চাকরী প্রার্থনায় আসিয়াছেন। তাজীম বিনা বাধায় গঙ্গাপার হইয়া রাজবাটীর তোরণদ্বারে প্রবেশ করিলেন। তথায় সৈন্য সামন্ত অল্প দেখিয়া হঠাৎ আক্রমণ দ্বারা রক্ষিগণকে নষ্ট করিয়া তোরণদ্বার অধিকার করিলেন। রাজভৃত্যেরা স্বল্পকাল মধ্যে তাঁহাদিগকে নিষ্কাশিত করিতে পারিল না। সংবাদ পাইয়া বখ্‌তিয়ার অবশিষ্ট সেনা লইয়া মুক্ত তোরণদ্বার দিয়া রাজবাটীতে প্রবেশ করিলেন। লক্ষ্মণসেনের যুদ্ধোপযোগী কোন আয়োজনই ছিল না। তাঁহার রাজধানী গৌড় নগর যবনেরা অধিকার করিবে জানিয়া তিনি রাজধানী ত্যাগ করিয়া দূরদেশে নবদ্বীপে বাস করিতেছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাই প্রথম আক্রান্ত হইল। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি দ্রুতগামী নৌকা-যোগে জগন্নাথক্ষেত্রে পলায়ন করিলেন। তথায় বন্ধুহীন অবস্থায় তিনি মনোদুঃখে গতাসু হইলেন।

নবদ্বীপ অধিকার করায় বাঙ্গালা দেশের কোন অংশই যবনদিগের হস্তগত হইল না। একটি লোকও তাহাদের অধীনতা স্বীকার করিল না। তাহাদিগকে

দেখিয়া প্রজাগণ পলায়ন করিত। তাহারা কেবল লুঠ পাট করিয়া জীবন ধারণ করিত। মূল্য দিয়াও তাহারা কোন দ্রব্য কিনিতে পাইত না। এই অবস্থায় বখ্‌তিয়ার গৌড়নগর আক্রমণ করিতে চলিলেন। লক্ষ্মণসেন যে কলঙ্কপঙ্কে বাঙ্গালীর নাম ডুবাইয়াছিলেন, মধুসেন তাহা কতক উদ্ধার করিয়াছিলেন। গৌড়নগর সহজে বিজিত হয় নাই। বহু যুদ্ধের পর পাঠানেরা গৌড়নগর অবরোধ করিল। ইংরেজী ১২০৩ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপ পাঠানদিগের হস্তগত হয়। আর ১১২৭ শকাব্দে অর্থাৎ ইংরেজী ১২০৫ খৃষ্টাব্দে গৌড়নগর যবনাধিকৃত হয়। সুতরাং মধুসেন যে এক বৎসরের অধিককাল পাঠানদিগের সহ যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাহারা ঐ স্থান হানা দিয়া দখল করিতে পারে নাই। তিন মাস অবরোধের পর রসদ নিঃশেষ হওয়ায় রাজা মধুসেন রাজধানী ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে প্রস্থান করিলেন। গৌড় বখ্‌তিয়ারের হস্তগত হইল। সেই সঙ্গে সমস্ত বরেন্দ্রভূমি, রাঢ়, মিথিলা এবং বগদির পশ্চিমভাগ পাঠানদিগের অধিকৃত হইল। রাজা মধুসেন কেবল বঙ্গদেশে এবং বগদির পূর্ব্বাংশে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। বিজয়ী পাঠানেরা মহোৎসাহে পূর্ব্ববঙ্গ আক্রমণ করিল। এই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে একডালা নামে এক অভেদ্য দুর্গ ছিল। যে স্থানে পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র নদের সম্মিলন হইয়াছে, ঠিক সেই স্থানে এই দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই দুর্গ প্রায় দুইশত বৎসর হইল সম্পূর্ণ জলমগ্ন হইয়াছে। ইহার প্রাচীর প্রায় ৮ হাত পুরু ছিল এবং গাঁথনি অতীব দৃঢ় ছিল। কেহ হানা দিয়া এই দুর্গ জয় করিতে পারিত না। নৌকাপথে রসদ ও নূতন সৈন্য আনিবার সুবিধা থাকায়, এই দুর্গ অবরোধ করিয়া কোন ফল ছিল না। তজ্জন্য এই দুর্গ অজেয় বলিয়া বিখ্যাত ছিল। স্থানীয় লোকে বলে যে "রাজা বিক্রমাদিত্য বিক্রমপুর নগর স্থাপন করিয়া তাহাতে এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন"। বিক্রমাদিত্য-নামীয় বহু রাজা ছিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। নামের একতা হেতু অনেক সময়ে একজনের কার্য্য অন্যে আরোপিত হয়। আমি যত দূর তদন্ত করিয়াছি, তাহাতে অনুমান হয় যে, উজ্জয়িনীর প্রসিদ্ধ সম্রাট্ বিক্রমাদিত্য এই একডালার দুর্গ-স্থাপক নহেন।

বখ্‌তিয়ার পূর্ব্ববঙ্গ আক্রমণ করিলে রাজা মধুসেন একডালার দুর্গে আশ্রয় লইলেন। বখ্‌তিয়ার কিছুই করিতে পারিলেন না, বর্ষার প্রারম্ভে ফিরিয়া

আসিলেন। দ্বিতীয় বৎসর পুনরায় পাঠানেরা পূর্ব্ববঙ্গ আক্রমণ করিল। মধুসেন আসামরাজের সাহায্যে তাহাদিগকে বিমুখ করিয়া দিলেন। বখ্তিয়ার ক্রুদ্ধ হইয়া আসাম দেশ আক্রমণ করিলেন। তথায় জঙ্গল মধ্যে বহু সৈন্য একত্র সমাবেশ করা অসাধ্য হইল। সেই সময়ে সুযোগ পাইয়া আসামীরা পাঠান-দিগকে আক্রমণ করিয়া পরাজয় করিল। জঙ্গলের জলবায়ুতে রুগ্নদেহ এবং পরাজয়ে ভগ্নমনে বখ্তিয়ার গৌড়ে ফিরিয়া আসিয়াই লীলা সংবরণ করিলেন। খৃঃ ১২০৭ সালে এই ঘটনা হয়। ইহার পর বহু দিন পর্য্যন্ত মুসলমানেরা পূর্ব্ববঙ্গ আক্রমণ করে নাই। পশ্চিমবঙ্গে পাঠান রাজ্য এবং পূর্ব্ববঙ্গে বৈদ্যরাজ্য স্থির ছিল। সেই সময়ে বহুসংখ্যক সুব্রাহ্মণ পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। বৈদ্যের সংখ্যা পূর্ব্ববঙ্গে প্রচুর, অথচ বরেন্দ্রভূমিতে অতি অল্প। ইহাতে জানা যায় যে, বৈদ্যেরা প্রায় সমস্তই এই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে গিয়া বাস করিয়াছিল। মধুসেন, কেশবসেন, শুকসেন এবং মাধব (দনুজ) সেন মোট চৌষট্টি বৎসর মুসলমানদের প্রতিকক্ষতা করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন। অবশেষে নবাব তোগরলবেগ নৌকাপথে আসিয়া হঠাৎ আক্রমণ দ্বারা একডালার দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করিলেন। মাধবসেন পরাজিত হইয়া নৌকাপথে ত্রিপুরারাজ্যে পলাইতেছিলেন; পথি-মধ্যে ঝড় হইয়া সপরিবারে জলমগ্ন হইলেন। তাহাতেই বৈদ্যরাজবংশ সমূলে নিঃশেষ হইল এবং সমস্ত বাঙ্গালা দেশ পাঠানরাজ্য হইল। খৃঃ ১২৬৮ সাল।

পুরাতন শ্রোত্রিয়েরা এই বৈদ্যরাজবংশের অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন। সেই প্রশংসা কিছুমাত্র অসঙ্গত বোধ হয় না। তাঁহারা ক্ষত্রিয় রাজাদের ন্যায় যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন না। বল্লালসেন ভিন্ন অন্য কাহারও বিশেষ বীরত্বখ্যাতি দেখা যায় না। কিন্তু সদাচার, সুবিচার এবং প্রজাপালন বিষয়ে তাঁহারা ক্ষত্রিয় রাজাদিগের অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ক্ষত্রিয় রাজারা প্রায়ই মূর্খ ছিল। কিন্তু বৈদ্য রাজারা সকলেই বিদ্বান্ এবং বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বল্লাল ও লক্ষ্মণসেনের রাজ্যমধ্যে কোন প্রজা দরিদ্র ছিল না, কেহ ভিক্ষুক ছিল না এবং কেহ চোর ছিল না। বৈদ্যরাজবংশের সুশাসনই বাঙ্গালাদেশের উন্নতির মূল। তাঁহারা যে নিতান্ত দুর্ব্বল ছিলেন, তাহাও বোধ হয় না। কেননা তাঁহাদের যত বড় বিস্তীর্ণ রাজ্য সম্পূর্ণ আয়ত্ত ছিল, তত বড় রাজ্য ক্ষত্রিয় রাজাদের খুব কম দেখা যায়।

রাজা লক্ষ্মণসেন বিনা যুদ্ধে পলায়ন করায় মুসলমান ইতিবেত্তা ফেরেস্তা তাঁহাকে তুচ্ছ করিয়া "লছমনিয়া" বলিয়া লিখিয়াছেন। তাহা হইতেই ইংরেজী ইতিহাসে এবং তদনুরূপ বাঙ্গালা ইতিহাসে লাক্ষ্মণ্যসেন বা দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেন রাজা এবং নবদ্বীপ তাঁহার রাজধানী বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। তাহা সমস্তই ভুল। নবদ্বীপ কখন রাজধানী ছিল না এবং লাক্ষ্মণ্যসেন নামে কোন রাজাও ছিল না। মীর ফর্জন্দ হোসেন লিখিয়াছেন যে, পারসীতে তুচ্ছার্থে নামের উত্তর 'ইয়া' প্রত্যয় হয়। তাহাতেই কাপুরুষ লক্ষ্মণসেনকে লছমনিয়া লেখা হইয়াছে।

"সতর জন পাঠান অশ্বারোহী বাঙ্গালা দেশ জয় করিয়াছিল" বলিয়া যাহারা বাঙ্গালীর অপবাদ করে, তাহারা মিথ্যা নিন্দুক মাত্র। সতর জন পাঠান সমস্ত বাঙ্গালা দেশ দূরে থাকুক, নবদ্বীপের ন্যায় অরক্ষিত পল্লীগ্রামও জয় করিতে পারে নাই। সতর জন পাঠান চাকরী প্রার্থনার ভাণ করিয়া নবদ্বীপে রাজবাটীর তোরণদ্বারে প্রবেশ করিয়াছিল এবং বিশ্বাসঘাতকতা-পূর্ব্বক দৌবারিকদিগকে হত্যা করিয়া তোরণদ্বার অধিকার করিয়াছিল। রাজ-ভৃত্যেরা স্বল্পকাল মধ্যে তাহাদিগকে নিষ্কাশিত করিতে পারিল না। ইতিমধ্যে অবশিষ্ট পাঠান সৈন্য আসিয়া সেই মুক্ত তোরণদ্বার দিয়া রাজবাটীতে প্রবেশ করিল। লক্ষ্মণসেনের যুদ্ধের আয়োজন কিছুই ছিল না। তিনি হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া অগত্যা পলায়ন করিলেন। নবদ্বীপ পাঠানদের হস্তগত হইল। ঈদৃশ ঘটনা হইতে বৃদ্ধ রাজার কিংবা বাঙ্গালীদের দৌর্ব্বল্য বা ভীরুতা কিছু-মাত্র প্রমাণ হয় না। যখন কামান বন্দুকাদি অনিবার্য্য অস্ত্র ছিল না, তখন সঙ্কীর্ণ স্থানে অত্যল্প লোকে বহু লোকের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে পারিত। ইহা যুক্তিসিদ্ধ এবং ইতিহাসে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখা যায়। টাস্-কেনীর রাজা লার্স্‌পোর্সেনা সম্মুখ যুদ্ধে চল্লিশ হাজার রোমান সৈন্য পরাজয় করিয়াছিলেন, অথচ টাইবর নদের সেতুমুখে তিন জন মাত্র রোমান বীর পোর্সেনার নব্বই হাজার যোদ্ধার গতিরোধ করিয়াছিল। তুরস্ক সেনাপতি সালারুদ্দীন তিরাশী হাজার সৈন্য লইয়া ছয় লক্ষ খৃষ্টান সৈন্য পরাজিত করিয়া-ছিলেন, অথচ সেই পরাজিত পলায়িত খৃষ্টানদিগের মধ্যে কেবল বিরানব্বই জন যোদ্ধা যেরুশালমের তোরণদ্বারে সালারুদ্দীনের সমস্ত সৈন্যের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিয়াছিল। সুতরাং ১৭ জন পাঠান যে সহস্র বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে

নবদ্বীপের তোরণদ্বারে আত্মরক্ষা করিয়াছিল, তাহা এক পক্ষের অসাধারণ বীরত্বের অথবা অন্য পক্ষের একান্ত দৌর্ব্বল্যের প্রমাণ নহে।

মুসলমানদিগের প্রথম উন্নতির সময়ে তাহারা সর্ব্বত্রই অজেয় হইয়াছিল। কোন দেশের কোন জাতিই তাহাদের বিপক্ষতা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। সেই সময়ে যে তাহারা বাঙ্গালা দেশ জয় করিয়াছিল, ইহাও বাঙ্গালীর দৌর্ব্বল্যের প্রমাণ নহে। বরং বাঙ্গালীরা যে পঁয়ষট্টি বৎসর কাল তাহাদের প্রতিকক্ষতা করিয়াছিল, তাহাই যথেষ্ট গরিমার বিষয়। পুরাতন বাঙ্গালীরা যে দুর্ব্বল বা ভীরু ছিল না, এই গ্রন্থে তাহার প্রচুর উদাহরণ পাঠকবর্গ দেখিতে পাইবেন। রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গেই বৈদ্যদিগের বিক্রম বিলুপ্ত হইয়াছিল। ইহার পর বৈদ্যেরা বিদ্যা বুদ্ধির জন্য অনেকে প্রসিদ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু কখন কেহ বীরত্বের খ্যাতি লাভ করে নাই। কিন্তু বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও চণ্ডালগণ অনেকে বিলক্ষণ শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশ করিয়াছে। তাহারা বারংবার পাঠান মোগলের প্রতিযোগিতা করিয়াছে এবং সময়ে সময়ে তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া তাহাদের উপর আধিপত্য করিয়াছে। এই গ্রন্থে কেবল একটাকিয়া ভাদুড়ী বংশের, এবং রাজা প্রতাপাদিত্যের ও সীতারাম রায়ের বৃত্তান্ত লিখিত হইল। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক বীরবংশের বৃত্তান্ত পরে অন্য গ্রন্থে লিখিত হইবে। জেলা রঙ্গপুরে কাঁকিনার রাজারা বারেন্দ্র কায়স্থ। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বরাবর কোচবেহার-রাজের সেনাপতি ছিলেন এবং তাঁহারা পাঠান, মোগল ও ভুটিয়াদের সহ পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ করিয়াছেন। দিনাজপুরের মহারাজের পূর্ব্বপুরুষেরা বরাবর বাঙ্গালার নবাবদিগের সেনাপতি থাকিয়া বাঙ্গালা দেশের উত্তর দিক্ রক্ষার্থ নিযুক্ত ছিলেন। গুণ্ডং ও রাহিরবন্দের রাজারা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরাও নবাবের সেনাপতিরূপে বাঙ্গালার উত্তর-পূর্ব্বদিক্ রক্ষা করিতেন। রাঙ্গামাটিয়ার রাজারা উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থ ছিলেন। পরে আসামের কলতা কায়েতের সহ আদান প্রদানে কলতা কায়েত হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা আসাম-রাজের সেনাপতি ছিলেন। ঔরংজীব বাদশাহের প্রসিদ্ধ সেনাপতি নবাব মীরজুম্লাকে তাঁহারাই পরাজয় করিয়া আসাম হইতে তাড়াইয়াছিলেন। বাঙ্গালার নবাবদিগের অধিকাংশ সৈন্য ও সেনাপতি বাঙ্গালী ছিল। নবাব শিরাজদ্দৌলা ও

মীরকাশীম যে সৈন্য লইয়া ইংরেজের সহ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহারও অধিকাংশ বাঙ্গালী ছিল। ইংরেজদিগের দেশীয় সেনা মধ্যেও প্রথম প্রথম অনেক বাঙ্গালী যোদ্ধা ছিল। গ্রীক্ ও পর্টুগিজদের ন্যায় আমি কল্পিত গল্প দ্বারা স্বজাতির গৌরব করিতে চাই না। আমি যাহা লিখিব, তাহার কিছুই অমূলক গল্প নহে। ফলতঃ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেরা যেমন বুদ্ধির জন্য প্রসিদ্ধ, তেমনই বীরত্বের জন্যও প্রসিদ্ধ ছিলেন। বাস্তবিক, বীরত্ব কোন দেশবিশেষের বা জাতিবিশেষের গুণ নহে। প্রয়োজন ও সুযোগ দ্বারা এই গুণ উৎপন্ন হয় এবং অভ্যাস দ্বারা বৰ্দ্ধিত হয়। বীরত্ব প্রকাশের সুযোগ নাই এবং অভ্যাস নাই বলিয়াই বাঙ্গালীরা এখন নিৰ্ব্বীর্য্য হইয়াছে। নীলকরদিগের দৌরাত্ম্য-সময়ে সলোপের সান্যাল, বালিয়াকান্দির চৌধুরী, ভাওয়ালের রাজা, রাজাপুরের রাণী এবং নড়াইলের বাবুরা বিলক্ষণ বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন। সিপাই-বিদ্রোহকালে প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (The fighting Munsif) বীরত্বখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং বাঙ্গালীরা চিরকাল ভীরু বলিয়া অনুমান ভ্রম ও কুসংস্কার-মূলক।

গৌড়ীয় পঞ্চরাজ্য পাঠানদিগের অধিকৃত হইলে তাহারা মিথিলারাজ্য মগধ দেশের সহ মিলিত করিয়া শুবে বেহার নাম দিয়াছিল। অবশিষ্ট চারিটি রাজ্য দ্বারা শুবে বাঙ্গালা গঠিত করিয়াছিল। এই দুই শুবায় কদাচিৎ পৃথক্ পৃথক্ নবাব নিযুক্ত হইত। সচরাচর একজন নবাবই এই দুই শুবা শাসন করিতেন। গৌড় নগরে নবাবের রাজধানী ছিল। সুবর্ণগ্রাম, সপ্তগ্রাম, পাটনা ও সাসারাম, এই চারিটি স্থানে চারি জন শরীফ বা উপনবাব ছিল। তাহারা নিকটবৰ্ত্তী প্রদেশের রাজা, ভূঁইয়া ও গাঁইয়াদিগের নিকট রাজস্ব আদায় করিয়া নবাব-সরকারে পাঠাইত। ঐ পাঁচটি নগরে দুর্গ ছিল। তাহাতে কতকটি পাঠান সৈন্য থাকিত। ঐ সকল নগরের আশে পাশে পাঠান সর্দ্দারদিগের জাগীর এবং মুসলমান সাধুদিগের পীরপাল ছিল। অবশিষ্ট সমস্ত দেশ হিন্দু জমীদারেরাই শাসন করিতেন। কিন্তু সেই সকল জমীদারদের জমীদার উপাধি ছিল না। বৃহৎ জমীদারদিগের "রাজা" "মহারাজ" উপাধি ছিল। আর ক্ষুদ্র জমীদারগণের গাঁইয়া ও ভূঁইয়া উপাধি ছিল। রাজা মহারাজগণের অধীনেও অনেক গাঁইয়া, ভূঁইয়া ছিল। মোগল-

রাজত্বকালে সেই সকল রাজা মহারাজদের জমীদার উপাধি হইয়াছিল। তাঁহাদের অধীন গাঁইয়া ভূঁইয়াদের উপাধি তালুকদার হইয়াছিল। আর যে সকল গাঁইয়া ভূঁইয়া কোন রাজার অধীন ছিল না, তাহাদের উপাধি হুজুরী তালুকদার হইয়াছিল। তাহারা নবাব-সরকারে রাজস্ব দিত।

পাঠানেরা কুটিল রাজনীতি জানিত না। রাজ্য মধ্যে জরিপ জমাবন্দি কিংবা অন্য কোন পাকা বন্দোবস্ত ছিল না। জমীদারেরা যে রাজস্ব দিত, এবং বণিকেরা যে শুল্ক দিত, তাহাই নবাবদিগের আয় হইত। তাহা হইতে নিজ ব্যয় বাদে অবশিষ্ট টাকা নবাবেরা দিল্লীর সম্রাট্‌কে পাঠাইতেন। জরিমানা ও উপঢৌকন স্বরূপে নবাবেরা যাহা পাইতেন, তাহা তাঁহাদের নিজস্ব ছিল। তাহার জন্য কোন হিসাব নিকাশ বাদশাকে দিতে হইত না। নবাবেরা সম্রাট্‌কে মালগুজারী দিতেন বটে, কিন্তু নিজ নিজ শুবায় তাঁহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিতেন। সেইরূপ, জমীদারেরা নবাবকে রাজস্ব দিয়া নিজ নিজ চত্বরে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতেন। প্রভু কখন অধীনগণের আভ্যন্তরিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না।

রাজা মহারাজদিগের রীতিমত অভিষেক হইত এবং তাঁহাদের কেবল এক জন মাত্র উত্তরাধিকারী হইত। তাঁহাদের অপর দায়াদগণ ভরণ পোষণ জন্য আয়মা পাইত। গাঁইয়া ভূঁইয়াদের অভিষেক হইত না এবং তাহাদের উত্তরাধিকারিগণ শাস্ত্রমত দায় ভাগ করিয়া লইতেন। জমীদারগণের উত্তরাধিকারে বিবাদ হইলে অথবা দুই জমীদারের মধ্যে রাজ্যের সীমানা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসা যুদ্ধ কিংবা সালিশ দ্বারা হইত। কদাচিৎ পরাজিত পক্ষ নবাবের দরবারে নালিশ করিত। ঈদৃশ নালিশ করা নিতান্ত কাপুরুষের কার্য্য বলিয়া গণ্য ছিল। নবাবের কর্ম্মচারী সমস্তই ঘুষখোর ছিল। বিবাদের পক্ষগণ মধ্যে যে বেশী টাকা ব্যয় করিতে পারিত, বিবাদে প্রায়শঃ তাহারই জয় হইত। সুতরাং পরাজিত পক্ষ নালিশ করিয়া প্রায়ই কোন ফল পাইত না। তজ্জন্য ঈদৃশ নালিশ অতি অল্পই হইত। জমীদারদিগের অধীন প্রজারা কখন নবাব দরবারে নালিশ করিতে যাইত না। নবাবেরাও তাদৃশ প্রজা সাধারণ সম্বন্ধে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতেন না। সুতরাং সাধারণ প্রজার সহ নবাবের কোন সম্বন্ধ ছিল না।

বেহার প্রদেশে অধিকাংশ জমীদার ক্ষত্রিয় ছিল, অবশিষ্ট ব্রাহ্মণ ছিল। বাঙ্গালা দেশে ক্ষত্রিয় না থাকায় ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থেরাই সমস্ত দেশের জমীদার ছিল। কোন নিকৃষ্টজাতীয় লোক ভূম্যধিকারী হইতে পারিত না। নবাব কিংবা শরীফগণ কোন ছোট লোককে কখন কখন গাঁইয়া ভূঁইয়া নিযুক্ত করিতেন। কিন্তু প্রজারা তাদৃশ জমীদারকে মান্য করিত না এবং সুযোগ পাইলেই হত্যা করিত। পাঠান রাজত্ব দৃঢ়ীভূত হইলে, নবাবেরা হিন্দু জমীদারদিগকে বিচ্যুত করিয়া পাঠান সর্দ্দারগণকে জমীদারী দিতে পারিতেন। কিন্তু নবাবেরা তদ্রূপ চেষ্টা বা ইচ্ছা করেন নাই। তাহার অনেকগুলি কারণ ছিল। বাঙ্গালাদেশে এক্ষণে যেরূপ অরক্ষণীয় সমতল ক্ষেত্র, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। নদী, হ্রদ ও জঙ্গল দ্বারা বাঙ্গালাদেশ অতি দুর্ভেদ্য স্থান ছিল। ঈদৃশ দুর্গম দেশের অভ্যন্তরে স্বল্পসংখ্যক পাঠান ছড়াইয়া পড়িলে হিন্দুগণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইবার ভয় ছিল। যদি পাঠান সর্দ্দারের সঙ্গে উপযুক্ত সৈন্য সামন্ত থাকিত, তবে তাহাদের ব্যয়েই সমস্ত রাজস্ব নিঃশেষ হইত; নবাবের ভাণ্ডারে কিছুই প্রেরিত হইত না। অধিকন্তু পাঠান সর্দ্দারেরা অনেকেই লেখা পড়া জানিত না, আদায় তহশীল কার্য্য কিছুমাত্র বুঝিত না, অথচ অতিশয় উগ্রপ্রকৃতি এবং বহুব্যয়ী ছিল। তাহারা যুদ্ধস্থলে যেমন বীর ছিল, তেমনই আবার শান্তি সময়ে নিতান্ত অলস ও বিলাসী ছিল। তাহাদিগকে জমীদারী দিলে তাহারা উপযুক্ত পরিমাণে রাজস্ব আদায় করিতে পারিত না এবং যাহা আদায় করিত, তাহাই ব্যয় করিয়া ফেলিত। সুতরাং নবাবের নিকট মালগুজারী দিতে পারিত না। সেই বাকির জন্য পীড়াপীড়ি করিলে অমনি পাঠান সর্দ্দার বিদ্রোহী হইত। এই সমস্ত কারণে নবাবেরা পাঠানদিগকে দেশের অভ্যন্তরে জমীদারী দিতেন না। সুতরাং বাঙ্গালাদেশ মুসলমানদিগের অধিকৃত হইলেও দেশের অভ্যন্তরে হিন্দুরাজ্যই চলিতেছিল।

যে সময়ে পশ্চিমবঙ্গে পাঠানরাজত্ব এবং পূর্ব্ববঙ্গে বৈদ্যরাজত্ব চলিতেছিল, সেই সময়ে বালিহাটী গ্রামে (বর্ত্তমান ঢাকা জেলায় বালিয়াটী) মহাত্মা উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর জন্ম হয়। তাঁহার তুল্য পণ্ডিত বাঙ্গালা দেশে এ পর্য্যন্ত আর কেহ হয় নাই। তাহার তীর্থপর্য্যটন সময়ে চিত্রকূট পর্ব্বতে শঙ্করাচার্য্য সহ সপ্তাহকালব্যাপী যে তর্ক বিতর্ক বিচার হয়, তাহাই দিগ্দেশবিখ্যাত। দাক্ষিণাত্য

বাসী শঙ্করাচার্য্য বেদবিস্তায় পারদর্শী ছিলেন বটে, কিন্তু বুদ্ধিমান্ বাঙ্গালী পণ্ডিতের ন্যায় সুতার্কিক ছিলেন না। শঙ্কর যে তর্কে মণ্ডন পণ্ডিত ও তৎপত্নী উভয়ভারতীকে পরাজয় করিয়াছিলেন, উদয়নের সম্মুখে তাহা খাটিল না *। উদয়নাচার্য্যের রচিত কুসুমাঞ্জলি, তীর্থমাহাত্ম্যং প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ আছে, তাহা বাঙ্গালাদেশের বাহিরে প্রচার নাই। এই মহাত্মার বংশে যত পণ্ডিত, যত রাজা এবং যত বীরপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তত বাঙ্গালাদেশের অন্য কোন বংশেই দেখা যায় না। এই মহাবংশের একটি শাখার ইতিহাসই প্রধানতঃ এই গ্রন্থের বর্ণনীয় †।

---

* শঙ্করঃ শঙ্করস্যাংশস্তু দয়নো নারায়ণঃ স্বয়ম্।

† বৃহস্পতি ভাদুড়ীর পুত্র উদয়ন আচার্য্য। তাঁহার পঞ্চম পুরুষে কৃষ্ণ ভাদুড়ী। কৃষ্ণের পুত্র সুবুদ্ধি খাঁ, কেশব খাঁ এবং জগদানন্দ রায়। তাঁহাদের সন্তানই একটাকিয়া রাজবংশ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বাঙ্গালাদেশ মুসলমান-অধিকারভুক্ত হইলে, দেড় শত বৎসরকাল দিল্লীর সম্রাটের অধীন ছিল। তাহার পর বিকৃতবুদ্ধি মহম্মদ তোগলকের অত্যাচারে সাম্রাজ্য ভঙ্গ হইতে আরম্ভ হয়। শুবায় শুবায় নবাবেরা স্বাধীন হইয়াছিল। বাঙ্গালার নবাব সমসুদ্দীন তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রথম পথপ্রদর্শক। এখন নানা কারণে বাঙ্গালাদেশে মুসলমানের সংখ্যা অতিমাত্র বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন বাঙ্গালাদেশে যত মুসলমান আছে, পৃথিবীর অন্য কোন দেশেই এই পরিমাণ স্থানে এত অধিক সংখ্যক মুসলমান নাই। কিন্তু সমসুদ্দীনের সময়ে সমস্ত বাঙ্গালা ও বেহারে চৌত্রিশ হাজারের বেশী মুসলমান ছিল না। সমসুদ্দীন বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, সেই স্বল্পসংখ্যক মুসলমানগণের সাহায্যে তিনি কদাচ সম্রাটের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন না। অধিকন্তু বিদ্রোহকালে সেই সকল মুসলমান তাঁহার স্বপক্ষে থাকিবে কি না তাহাও অনিশ্চিত। এজন্য তিনি একদল হিন্দু-সেনা সংগ্রহ করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি নিজ হিন্দু-কর্ম্মচারীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমাদের হিন্দুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?" তাহারা কহিল "হিন্দুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুলীন, আর কুলীনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আমরা যতদূর জানি, দামনাশের সান্যাল এবং ভাজনীর ভাদুড়ী।" সেই কথা শুনিয়া নবাব দামনাশ হইতে শিখাই (শিখিবাহন) সান্যালকে এবং ভাজনী হইতে সুবুদ্ধিরাম ভাদুড়ী, কেশবরাম ভাদুড়ী এবং জগদানন্দ ভাদুড়ীকে আহ্বান করিয়া নিজ উদ্দেশ্য সাধনে নিযুক্ত করিলেন। জগদানন্দ পারসী ভাষা জানিতেন; নবাব তাঁহাকে "রায়" উপাধি দিয়া দেওয়ান (রায়রাইয়াঁ) করিলেন। আর শিখাই, সুবুদ্ধি ও কেশবকে "খাঁ" উপাধি দিয়া সেনাপতিপদে বরণ করিলেন। সান্যাল ও ভাদুড়ীত্রয় নবাবের কর্ম্ম স্বীকার করিয়া হিন্দুদের স্বাভাবিক প্রভুভক্তি অনুযায়ী নবাবের উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হইলেন। একবৎসর মধ্যেই নবাবের ভাণ্ডারে মহাযুদ্ধের উপযুক্ত অর্থ ও রসদ সঞ্চিত হইল। আর পঞ্চাশ হাজার হিন্দু-সেনা সংগৃহীত ও সুশিক্ষিত হইল। নবাব তাঁহার হিন্দু-কর্ম্মচারীদের যোগ্যতা এবং প্রভুভক্তি দর্শনে অতীব

তুষ্ট হইলেন। তাঁহার মুসলমান-সেনাগণ বিপক্ষে যোগ না দিতে পারে এই উদ্দেশ্যে তিনি কতকগুলি মুসলমান-সৈন্য সেই হিন্দু-সেনাপতিদের অধীনে দিলেন। আবার কতকটি হিন্দু-সৈন্য লইয়া মুসলমান-সেনাপতির অধীনস্থ করিলেন। হিন্দু ও মুসলমানগণ পরস্পরকে দৃঢ় বিশ্বাস করিত না। সুতরাং নবাবের নিজ সৈন্যদের মধ্যে ষড়যন্ত্র বা বিদ্রোহের আশঙ্কা থাকিল না। এইরূপে আট ঘাট বাঁধিয়া সম্‌সুদ্দীন "শাঃ" অর্থাৎ স্বাধীন রাজা উপাধি গ্রহণ করিলেন। সম্রাট্ মহম্মদ তোগলক এবং পরে ফেরোজ তোগলক কোন মতে সমসুদ্দীনকে আয়ত্ত করিতে না পারিয়া অবশেষে তাঁহার স্বাধীনতা স্বীকার করিলেন। এই অবধি দুইশত বৎসরকাল বাঙ্গালা ও বেহার একটি স্বাধীন সাম্রাজ্য ছিল। তৎকালে সম্রাট্ বা বাদশাঃ বলিলে দিল্লীর সম্রাট্‌কেই বুঝাইত, এজন্য বাঙ্গালার সম্রাট্‌দিগকে "গৌড়-বাদশাঃ" বলা হইত।

সান্যাল এবং ভাদুড়ীত্রয়ই সম্‌সুদ্দীনের উন্নতির প্রধান সহায় ছিলেন। এজন্য তিনি তাঁহাদিগকে দুইটি প্রকাণ্ড জাগীর দিয়াছিলেন। শিখাই সান্যালের জাগীর পদ্মার উত্তরে চলনবিলের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। সান্যালগড় বা সাঁতোড়ে তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার জাগীরের বার্ষিক মুনাফা একলক্ষ টাকা ছিল। যদিও গৌড়বাদশাহের দরবারে শিখাইর খাঁ উপাধি ছিল, তথাপি শিখাই বা তদ্বংশীয়েরা কখন মফঃস্বলে খাঁ উপাধি গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা ঐশ্বর্য্যজ্ঞাপক অন্য কোন উপাধিও ধারণ করেন নাই। তাঁহারা কুলপতির সন্তান বলিয়া অত্যন্ত কুলাভিমানী ছিলেন। তজ্জন্য তাঁহারা নিজ সান্যাল উপাধিই বরাবর স্থিরতর রাখিয়াছিলেন। শিখাই সান্যালের তিন পুত্র (১) বলাই সাঁতোড়ে রাজা হন, (২) কানাই কুলের রাজা বা কুলপতি এবং (৩) সত্যবান্ বা প্রিয়দেব ফৌজদার। সেই সত্যবানের পুত্র রাজা কংসরাম বাদশাঃ।

ভাদুড়ীত্রয়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুবুদ্ধি খাঁ জাগীর পাইয়া রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার জাগীর চলনবিলের উত্তরে ছিল। নিজ চলনবিলও এই দুই জাগীর-দারের অধিকৃত ছিল। ভাদুড়ীর জাগীর চাকলে ভাদুড়িয়া (ভাতুড়িয়া) নামে খ্যাত হইয়াছিল। পণ্ডিতেরা সেই নাম সংস্কৃত করিয়া "ভাদুড়ীচক্র" বলিতেন। এই জাগীরের মুনাফা একলক্ষ টাকার অধিক ছিল। সুবুদ্ধি খাঁ তাহাতে প্রায়

স্বাধীন রাজার ন্যায় ছিলেন। তিনি নিজ নামে মুদ্রা ছাপিতেন না এবং বার্ষিক এক টাকা গৌড়বাদশাকে নজর দিতেন। এজন্য তদ্বংশীয় রাজাদিগকে "এক-টাকিয়া রাজা" বলিত। তাহার পর সুবুদ্ধি খাঁ, কেশব খাঁ এবং জগদানন্দ রায়ের সন্তানেরা সকলেই "একটাকিয়া ভাদুড়ী" বলিয়া পরিচিত হইতেন। খাঁ, সিংহ এবং রায় এই তিনটি উপাধি ইঁহাদের প্রসিদ্ধ। একটাকিয়া ভাদুড়ীবংশে অন্য কোন উপাধি নাই।

গৌড়বাদশাহের সেনাপতি হইলেই হিন্দুদের খাঁ উপাধি হইত। তাঁহাদের সম্মান বৃদ্ধি হইলে খাঁ সাহেব বলা যাইত। বঙ্গীয় রাঢ়ী ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থের মধ্যেও খাঁ উপাধি আছে। কিন্তু "খাঁ সাহেব" উপাধি বাদশাহী দর্বারে একটাকিয়া ভাদুড়ীদের ভিন্ন অন্য কাহারও হয় নাই। বাঙ্গালাদেশ ভিন্ন অন্যত্র কোন হিন্দুর খাঁ উপাধি নাই। একটাকিয়াদের মধ্যে যিনি রাজা হইতেন, প্রথম প্রথম কেবল তাঁহারই "খাঁ সাহেব" উপাধি হইত। রাজার ভ্রাতাদের মধ্যে যিনি সৈনিক বিভাগে কর্ম্ম করিতেন, তাঁহার সিংহ উপাধি হইত, আর যিনি দেওয়ানী বিভাগে কর্ম্ম করিতেন, তাঁহার রায় উপাধি হইত। তাহার পর ক্রমশঃ ঐ সকল উপাধি বংশানুক্রমিক হইয়াছিল। সিংহ উপাধি ক্ষত্রিয়-দিগেরই প্রসিদ্ধ। পশ্চিমপ্রদেশে অনেক ব্রাহ্মণেরও সিংহ উপাধি আছে। বাঙ্গালাদেশে একটাকিয়া ভাদুড়ীবংশে ও সুসঙ্গের রাজবংশে ভিন্ন অন্য কোন ব্রাহ্মণের সিংহ উপাধি নাই।

"রায়" এবং মহারাষ্ট্রদেশীয় "রাও" উপাধি "রাজ"শব্দের অপভ্রংশ। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে দেখা যায় যে, মহারাজ শব্দের অপভ্রংশে "মহারায়" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে "মহা" কথাটুকু ত্যাগ করিয়া রাজ শব্দ স্থানে রায় শব্দ বা রাও শব্দ চলিত হইয়াছে। তাহারই স্ত্রীলিঙ্গে রায়ণী বা রাণী শব্দ হইয়াছে। রাজা ও রাণী উপাধি অনেক মুসলমানের আছে। কিন্তু রায় এবং রাও উপাধি কুত্রাপি কোন মুসলমানের নাই। জগদানন্দের বংশে রায় উপাধি এবং সুবুদ্ধি খাঁর ও কেশব খাঁর বংশে খাঁ ও সিংহ উপাধি এখনও আছে।

বরেন্দ্রভূমিতে "চলনবিল" নামে একটি অতি প্রসিদ্ধ বিস্তীর্ণ হ্রদ আছে। পূর্ব্বে তাহার আয়তন আরও বেশী ছিল। বহুসংখ্যক নদ নদী ও শাখানদী

এই হ্রদে পতিত হইয়াছে, আর কয়েকটি নদী ও সোঁতা এই হ্রদ হইতে নির্গত হইয়াছে। সেই সকল নদ নদী দ্বারা আনীত বালুকায় এই হ্রদ ক্রমশঃ পূর্ণ হইয়া যাইতেছে। বর্ষাকালে এই হ্রদের মধ্যস্থল হইতে চারিদিক্ দৃষ্টি করিলে স্থল কূল কিছুই দৃষ্ট হয় না। বোধ হয় যেন সেই প্রকাণ্ড জলরাশি অর্দ্ধবর্ত্তুলাকার আকাশের সহ মিলিত হইয়াছে। হ্রদের জল সর্ব্বাংশে গভীর নহে। গ্রীষ্মকালে অনেকাংশের জল শুষ্ক হইয়া যায়। প্রতি বৎসর নূতন পলি পড়ায় এই শুষ্ক অংশের ভূমি অতি উর্ব্বরা। বিনা পরিশ্রমে বা অত্যল্প পরিশ্রমে সেই জমিতে প্রচুর শস্য হয়। ভাতুড়ীচক্র ধনধান্যপরিপূর্ণ অতি সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল। পুরাতন-অবস্থা-অপরিজ্ঞাত ব্যক্তির নিকট ভাতুড়িয়ার লক্ষ টাকা রাজস্ব সামান্য বোধ হইতে পারে। কিন্তু তাহাদের জানা উচিত যে, তখন জিনিসের দাম অতি কম ছিল। তখন এক টাকায় আট দশ মণ চাউল মিলিত। এখন একমণ চাউলের দাম চারি পাঁচ টাকা। এক্ষণে দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় টাকার মূল্য সেই অনুপাতে কমিয়া গিয়াছে। তখনকার একলক্ষ টাকা সুতরাং এখনকার ত্রিশ চল্লিশ লক্ষ টাকার তুল্য ছিল। তখন সমস্ত বাঙ্গালা বেহারের অধিপতি গৌড়বাদশাহের বার্ষিক লভ্য পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বেশী ছিল না। তখন বিদেশী দ্রব্যের আমদানী অতি কম ছিল। এখন আমরা যত প্রকার দ্রব্য প্রয়োজনীয় বোধ করি, তখন এত দ্রব্য প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য ছিল না। সুতরাং একটাকিয়াদের বার্ষিক লক্ষ টাকা মুনাফায় অতি ধূমধামে রাজত্ব চলিত।

চলনবিলের উত্তরাংশে একটি দ্বীপে ভাতুড়িয়ার রাজধানী ছিল। তখন সর্ব্বদা রাজবিপ্লব ও দস্যুভয় থাকাতে বড় মানুষেরা নিসর্গসংরক্ষিত দুরাক্রম্য স্থানে বাসস্থান করিতে চেষ্টা করিতেন। তাহা না যুটিলে কৃত্রিম উপায়ে বাসস্থান সুরক্ষিত করিতেন। প্রাচীন রাজধানী সমস্তই পর্ব্বত, জঙ্গল, জলাশয় বা মরুভূমি দ্বারা বেষ্টিত অতি দুর্ভেদ্য স্থানে স্থাপিত হইত। ভাতুড়িয়ার রাজধানী যেমন জলাশয় দ্বারা বেষ্টিত, তেমনি আবার দুর্গ প্রাচীরাদি কৃত্রিম উপায়ে সংরক্ষিত ছিল। আদৌ সমস্ত দ্বীপই প্রাচীরবেষ্টিত ছিল, পরে নদীস্রোতে সঞ্চিত বালুকা দ্বারা প্রাচীরের বাহিরে পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে চড়া পড়ায় সেই দিকে পরিখা খনন করা হইয়াছিল, আবার পরিখার উপর দুইটি কাঠের পুল

নির্ম্মিত হইয়াছিল। জলপথে সর্ব্বদা যাতায়াতের সুবিধা থাকায় এখানে বাণিজ্যের একটি প্রধান মণ্ডী ছিল। নগরে প্রচুর দ্রব্য আমদানী হইত, সুতরাং বহু লোক সত্ত্বেও এখানে কোন দ্রব্য দুর্ম্মূল্য ছিল না। নগরের চতুর্দ্দিক্‌বর্ত্তী জলে স্রোত ছিল। তাহাতে নিক্ষিপ্ত ময়লা সেই স্রোতে সুদূরে বাহিত হইত। এজন্য নগরে মিউনীসিপালিটী না থাকিলেও স্থানটি বেশ স্বাস্থ্যকর ছিল।

নগরের বাহিরে বিল ভরাট জমিতে কেহ বাস করিতে পারিত না। তথায় কেবল বাগান, কৃষিক্ষেত্র এবং পশুচারণ ভূমি ছিল। তাহাতে কখন কখন কৃষক, পশুপালক এবং রজকেরা সামান্য কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া অস্থায়ী ভাবে বাস করিত। কোন শত্রু-আক্রমণের আশঙ্কা হইলে অমনি সেই সকল সামান্য কুটীর দগ্ধ করা হইত, পরিখার পুল ভাঙ্গা হইত এবং আবশ্যক হইলে শস্য-ক্ষেত্রাদিও নষ্ট করা হইত। কোন বিপক্ষ আসিয়া নগরের বাহিরে কোন খাদ্যদ্রব্য এবং বাসস্থান না পায়, ইহাই প্রধান লক্ষ্য ছিল। নগরের উত্তর প্রান্তে একটি, পূর্ব্বে একটি ও দক্ষিণে দুইটি এবং পশ্চিমে তিনটি দুর্গ ছিল। এই জন্য সেই নগরের নাম সাতগড়া হইয়াছিল। পণ্ডিতেরা সেই নাম সংস্কৃত করিয়া "সপ্তদুর্গা" বলিতেন।

প্রাচীরবেষ্টিত নগর উত্তর দক্ষিণে লম্বা ছিল। তাহার সর্ব্বোত্তরে দুর্গবদ্ধ রাজবাটী, রাজার ঠাকুরবাড়ী, অতিথিশালা এবং বাগান ছিল। পশ্চিমদিকে অধিকাংশ দেশোয়ালীর বাস ছিল এবং সমস্ত মুসলমান-সিপাহী ও কর্ম্মচারিগণ পশ্চিম পাড়ায় বাস করিত। ঐ দিকেই তাহাদের মস্‌জীদ, দর্গাঃ এবং ইমাম-বাড়ী ছিল। সমস্ত ব্রাহ্মণের বাস পূর্ব্ব পাড়ায় ছিল। বৈদ্য কায়স্থদেরও কতক পূর্ব্ব পাড়ায় থাকিত। তাহাদের ক্রীত দাস দাসী স্ব স্ব প্রভুর বাড়ীর একপার্শ্বে বাস করিত। নগরের মধ্যভাগে বাজার, থানা এবং কারাগার ছিল। অবশিষ্ট সমস্ত লোক দক্ষিণ পাড়ায় বাস করিত। বাজারের রাস্তাগুলি বেশ পরিসর ছিল, কিন্তু পাড়ার ভিতর গলি সমুদায় অতি সঙ্কীর্ণ ছিল।

হিন্দু মুসলমানে কোন বিবাদ না হয় এই উদ্দেশ্যে সাতগড়ায় কয়েকটি বিশেষ নিয়ম ছিল। সাতগড়ায় কেহ শূকর আনিতে পারিত না এবং মুসলমানের পর্ব্বদিনে শঙ্খধ্বনি করিতে পারিত না। মুসলমানেরা নিজ পর্ব্ব উপলক্ষে রাজকীয় সাহায্য পাইত। মুসলমান সাধুরা নিষ্কর ভূমি অর্থাৎ

পীরপাল পাইত; কেহ কেহ নগদ টাকা বৃত্তি পাইত। পক্ষান্তরে তাহারা গোহত্যা ও গোমাংস ভক্ষণ করিতে পারিত না; পিতৃকুলে বিবাহ করিতে পারিত না। ইহা ভিন্ন মুসলমানেরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অনেক হিন্দু-ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছিল। সান্যাল-রাজ্যে ও ভাদুড়ী-রাজ্যে মুসলমানদের উত্তরাধিকারিত্ব হিন্দু দায়ভাগ অনুসারে হইত। অথচ তদ্বিষয়ে কোন রাজনিয়ম ছিল না। সুবুদ্ধি খাঁ যে উদ্দেশ্যে এই সকল নিয়ম করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ সফল হইয়াছিল। যে সময়ে হিন্দু মুসলমানে এবং মুসলমানে মুসলমানে সর্ব্বদা কাটাকাটি মারামারি হইত, সেই সময়ে সাতগড়ায় মুসলমানেরা নির্ব্বিবাদে বংশানুক্রমে বিশ্বস্তরূপে একটাকিয়া রাজবংশের চাকরী করিয়াছিল। তাহারা কখন রাজার সহ কোন বিবাদ করে নাই, হিন্দুদের সহ কোন বিবাদ করে নাই এবং নিজেরাও পরস্পর কোন গুরুতর বিবাদ করে নাই। একটাকিয়া রাজবংশের প্রতি সেই মুসলমানদের যে অচলা ভক্তি ছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

জাগীরদারেরা প্রকৃত পক্ষে গৌড়-বাদশাহের চাকর ছিলেন। তাঁহারা যে নিষ্কর ভূমি ভোগ করিতেন, তাহাই তাঁহাদের বেতনস্বরূপ ছিল। তাঁহারা স্বয়ং বা প্রতিনিধি দ্বারা বাদশাহের দর্বারে উপস্থিত থাকিতেন এবং তাঁহার হুকুম অনুযায়ী কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ইহাতে জাগীরদারদের লাভ ভিন্ন ক্ষতি ছিল না। তাঁহাদের প্রতিনিধিরা ফৌজদার অর্থাৎ সেনাপতি নামে অভিহিত হইতেন। গৌড়-বাদশাহগণ যাবতীয় রাজকার্য্য সেই ফৌজদারদের সহ পরামর্শ করিয়া করিতেন। প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তা কিংবা অন্য কোন সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারীর পদ খালি হইলে ফৌজদারগণ-মধ্য হইতে কোন কোন ব্যক্তি মনোনীত হইতেন, সুতরাং ফৌজদারদের অর্থ এবং সম্মান উভয়ই লাভ হইত। সমসুদ্দীনের অধীনে কেবল চারিজন হিন্দু-ফৌজদার ছিল, অবশিষ্ট সমস্তই মুসলমান ফৌজদার। সুবুদ্ধি খাঁর পক্ষে তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র মধুসূদন খাঁ এবং শিখাই সান্যালের পক্ষে তাঁহার তৃতীয় পুত্রের পুত্র কংসরাম সান্যাল (খাঁ) ফৌজদার ছিলেন।

সমসুদ্দীন সুবর্ণগ্রামের নিকট ব্রজযোগিনী (বজ্রযোগিনী) গ্রামে একটি পরম সুন্দরী নবযুবতী বিধবা ব্রাহ্মণকন্যা দেখিয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে আহরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার হিন্দু-ফৌজদারগণ এই কার্য্য রাজধর্ম্মের বিরুদ্ধ বলিয়া

কন্যাটির মুক্তি প্রার্থনা করিল। বাদশাঃ কহিলেন "যদি কোন ব্রাহ্মণ তাহাকে বিবাহ করে, তবে আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারি। নতুবা আমি নিজে তাহাকে নিকা করিব। আমি এই সুন্দর ফুলটি কদাচ বৃথা নষ্ট হইতে দিব না।" বাদশাঃ স্বয়ং তাহাকে নিকা করিয়া তাহার নাম ফুলমতী বেগম রাখিয়াছিলেন *। তিনি ফুলমতীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া নিজের পূর্ব্বপত্নী ও তৎসন্তানদের প্রতি একবারে মমতাশূন্য হইয়াছিলেন। ফুলমতীর গর্ভে সম্সুদ্দীনের তিন পুত্র এবং কয়েকটি কন্যা হইয়াছিল। বৃদ্ধকালে সম্সুদ্দীন ফুলমতীর জ্যেষ্ঠ পুত্র নাবালক ময়জুদ্দীনকে নিজ উত্তরাধিকারী রূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। ফৌজ-দার কংসরামকে তাহার অভিভাবক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আর সমস্ত হিন্দু মুসলমান ফৌজদার ও প্রধান কর্ম্মচারিগণকে ময়জুদ্দীনের পক্ষ সমর্থন জন্য শপথ করাইয়াছিলেন। ভাবী বিবাদ-আশঙ্কা নিবারণ জন্য তিনি নিজ প্রথম পক্ষের স্ত্রী ও সন্তানগণকে পাণ্ডুয়ার দুর্গে আটক করিয়া তাহাদের ভরণ পোষণ জন্য মাসিক কেবল এক হাজার টাকা মাত্র তন্‌খা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন।

বাদশাহের মৃত্যু হইবা মাত্র তাঁহার সমস্ত প্রযত্ন ব্যর্থ হইল। অধিকাংশ মুসলমানেরা জ্যেষ্ঠ কুমারদের পক্ষ হইয়া তাহাদিগকে মুক্ত করিল এবং বড় বেগমের জ্যেষ্ঠ পুত্র গয়সুদ্দীনকে সিংহাসনে বসাইতে চেষ্টা করিল। চতুর মধুসূদন খাঁ কোন পক্ষেই যোগ দিলেন না, কেবল কংসরাম একাকী ময়জুদ্দীনের পক্ষে থাকিলেন। ফুলমতী দেখিলেন, বিবাদ করিলে সুফলের আশা নাই। এজন্য তিনি ঘোষণা করিলেন যে "যদিও স্বর্গীয় সম্রাট্ ময়জুদ্দীনকে নিজ উত্তরাধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তথাপি সেই আদেশ রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতিবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপালনীয় নহে। 'রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা হয় এবং অন্যান্য পুত্রগণ যথোপযুক্ত আয়মা † পায়' ইহাই সকল দেশের সকল ধর্ম্মের বিধান। সেই নিয়মের বিরুদ্ধ চেষ্টা করিলে রাজবিপ্লবে প্রজাপীড়ন হইবে এবং

* ফুলমতী বেগমের পূর্ব্বনাম ও পরিচয় এখন পাওয়া যায় না।

† আয়মা শব্দ আরবী ভাষা-মূলক। কোন রাজপুত্র বা অপর বড় মানুষের ভরণ পোষণ জন্য প্রদত্ত ভূমির নাম আয়মা। ইহা সংস্কৃত নানুকর শব্দের প্রায় তুল্য।

রাজ্যের নানারূপ অমঙ্গল হইবে। অতএব জ্যেষ্ঠ কুমার (শাঃ জাদা) গয়সুদ্দীনই সম্রাট্ হইবে। আর ময়জুদ্দীন প্রভৃতি সমস্ত কুমারগণ আয়মাভোগী হইয়া গয়সুদ্দীনের আজ্ঞাকারী থাকিবে।"

ফুলমতী ঘোষণানুযায়ী প্রস্তাব করিয়া গয়সুদ্দীনের নিকট দূত পাঠাইলেন। সেই সঙ্গে গৌড়ের রাজছত্র, দণ্ড এবং সিংহাসনও গয়সুদ্দীনকে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার ন্যায্য এবং শান্ত প্রস্তাবে গয়সুদ্দীন এবং সমস্ত পাঠান-সর্দ্দারগণ সম্মতি দেওয়া উচিত বোধ করিলেন। কিন্তু বড় বেগম সক্রোধে কহিলেন "ফুলমতী খানকী এবং তাহার সন্তানেরা হারামজাদা। তাহারা আমাদের বহুকষ্ট দিয়াছে। এখন বিপদ্ দেখিয়া তাহারা ভাল মানুষ হইয়াছে। তাহাদিগকে কিছুই দিব না। তাহারা আমাদের দাস দাসী হইয়া থাকিবে।" মাতার প্রবর্ত্তনায় গয়সুদ্দীন ফুলমতীর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। তখন ফুলমতী সর্ব্বপ্রধান পাঠান সেনাপতি জুনা খাঁকে সালিশ মান্য করিয়া গৌড়ে আহ্বান করিলেন। জুনা খাঁ গৌড়ে আসিলে ফুলমতী বস্ত্র, অলঙ্কার এবং সুগন্ধি দ্রব্যে সুসজ্জিতা হইয়া তাঁহার সহ নিভৃতে সাক্ষাৎ করিলেন। জুনা খাঁ তাঁহার সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া নিকার প্রস্তাব করিলেন। ফুলমতী কহিলেন "তুমি যদি আমার পুত্রদিগকে নিরাপদ্ করিয়া দিতে পার, তবে তোমার ন্যায় সুন্দর ও সুযোগ্য লোককে নিকা করিতে আমি পরম সন্তোষ লাভ করিব।" জুনা খাঁ অমনি ময়জুদ্দীনের পক্ষ হইয়া কংসরামের সহ যোগ দিলেন। তখন সুবিধা বুঝিয়া মধু খাঁও তাঁহাদের সহযোগী হইলেন। তাঁহাদের তিন জনের একত্রিত সৈন্য পাণ্ডুয়া আক্রমণ করিল। গয়সুদ্দীন ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ পরাজিত ও নিহত হইলেন। তাঁহার দলবল সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইল। বড় বেগম ও তাঁহার কন্যাগণ দাসীরূপে বিক্রীত হইল।

যুদ্ধ শেষ হইবামাত্র জুনা খাঁ ফুলমতীকে নিকা সম্পাদন করিতে অনুরোধ করিলেন। কংসরাম নিশ্চয় জানিতেন যে, জুনা খাঁ বেগমকে নিকা করিলে নিজের কোন কর্ত্তৃত্ব থাকিবে না। এজন্য তিনি জুনা খাঁকে বিনাশ করিতে সংকল্প করিয়া রাখিয়াছিলেন। গয়সুদ্দীনের দলবল বিনষ্ট হইবামাত্র কংসরাম জুনা খাঁর আত্মীয়গণকে উচ্চ কর্ম্ম দিয়া পরস্পর দূরবর্ত্তী বিভিন্ন স্থানে পাঠাইলেন। এই উপায়ে জুনা খাঁকে নিঃসহায় করিয়া কংস তাহাকে হঠাৎ বন্দী

করিলেন এবং বিশ্বাসঘাতক বলিয়া প্রাণদণ্ড করিলেন। ইহাতে তাঁহার আত্মীয়গণ ক্ষেপিয়া উঠিল বটে, কিন্তু তাহারা পূর্ব্বে কিছুই না জানায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে পারে নাই। পক্ষান্তরে কংস পূর্ব্বেই তাদৃশ বিপক্ষগণের প্রতিকার জন্য সমস্ত উদ্‌যোগ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার বীরবর পুত্র জনার্দ্দন সান্যাল, পাঠানেরা একত্র সমবেত হইবার পূর্ব্বেই, তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া একে একে বিনাশ করিলেন। তখন কংসরায় "রাজা" উপাধি গ্রহণ করিয়া ময়জুদ্দীনের অভিভাবক ও ফুলমতীর উপপতিরূপে গৌড় সাম্রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

অধিকাংশ পাঠান সামন্তগণ গয়সুদ্দীনের পক্ষ হইয়া যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছিল। তাহার পর আবার জুনা খাঁর আত্মীয় পাঠান সর্দ্দারগণ বিনষ্ট বা দেশত্যাগী হইয়াছিল। এই দুই কারণে মুসলমান কর্ম্মচারিগণের সংখ্যা অতিশয় কম হইয়াছিল। কংসরাম সেই সমস্ত পদে হিন্দুকর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মীর ফর্জন্দ হোসেন লিখিয়াছেন যে, "রাজা কংস অতিশয় মুসলমান-বিদ্বেষী ছিলেন। তিনি তাহাদের প্রতি ঘোর অত্যাচার করিতেন এবং মুসলমান সর্দ্দার ও ফৌজদারদিগকে পদচ্যুত করিয়া হিন্দুদিগকে সেই সকল কর্ম্ম দিয়া নিজ পরাক্রম বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ময়জুদ্দীনকে বিনাশ করিয়া স্বয়ং সম্রাট্ হওয়া তাঁহার অভিপ্রায় ছিল"। কিন্তু এই সকল কথার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তিনি মুসলমানদের প্রতি যে কিছু দণ্ড করিয়াছিলেন, রাজবিপ্লবই তাহার একমাত্র কারণ; ধর্ম্মবিদ্বেষ তাহার হেতু বলা যায় না। কারণ শান্তিস্থাপনের পর তিনি কোন মুসলমানকেই বিনাশ কিংবা কর্ম্মচ্যুত করেন নাই। সাধারণ লোকে তাঁহাকে কংসরাম বাদশাঃ বলিত বটে, কিন্তু তিনি নিজে কখন বাদশাঃ উপাধি গ্রহণ করেন নাই অথবা ময়জুদ্দীনকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করেন নাই। যুদ্ধবিপ্লবে বহুসংখ্যক মুসলমান বিনষ্ট হওয়ায়, কংস তাহাদের স্থানে হিন্দুদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু স্বপক্ষীয় মুসলমানদেরও প্রচুর উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। সেই জন্য মীর ফর্জন্দ হোসেনের উক্তি পক্ষপাতদূষিত বলিয়া বোধ হয়।

কংসরামের শাসনসময়ে ব্রহ্মদেশের মগরাজ অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি আরাকানের রাজাকে দূরীকৃত করিয়া তাহার সমস্ত রাজ্য

নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন এবং ত্রিপুরার রাজার অধিকাংশ রাজ্য দখল করিয়া লইয়াছিলেন। আরাকান-রাজ মৌসং আসিয়া রাজা কংসরামের শরণাপন্ন হইলেন। কংসরাম ত্রিশ হাজার সৈন্য সহ নিজ পুত্র জনার্দ্দনকে তাঁহার সাহায্যার্থে পাঠাইলেন। তাঁহারা মেঘনা-নদী পার হইলে, ত্রিপুরার রাজা জনার্দ্দনের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন। জনার্দ্দন বহু যুদ্ধে মগদিগকে পরাজয় করিয়া আশ্রিত রাজদ্বয়কে স্ব স্ব রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত ও প্রসন্ন করিলেন। তাঁহার বীরত্ব, সদ্ব্যবহার জন্য তিনি সর্ব্বত্র প্রশংসিত হইলেন। তিনি গৌড়ে প্রত্যাগমন করাই আমনি পাটনার নবাবী পদে নিযুক্ত হইলেন। তিনি পূর্ব্বে বারংবার মুসলমানদিগকে পরাজয় করিয়াছিলেন, এক্ষণে মগদিগকে পরাজয় করিয়া তিনি "বজ্রবাহু" উপাধিপ্রাপ্ত হইলেন। তাঁহাদের উন্নতি দ্বারা সাঁতোড় রাজ্যেরও প্রচুর উন্নতি হইয়াছিল এবং সাম্রাজ্যের সমস্ত হিন্দুদিগের সমুন্নতি হইয়াছিল।

কংসরাম প্রভূত পরাক্রম সহ অতি প্রশংসিতরূপে সাতবৎসরকাল গৌড়-সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে ময়জুদ্দীন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন। তাহার পর একবৎসর গত হইল অথচ কংসরাম ময়জুদ্দীনের হাতে রাজ্য ছাড়িয়া দিলেন না। ইহাতে ময়জুদ্দীনের মনে সন্দেহ এবং ক্রোধ হইল। তিনি কংসরামের বিনাশে চেষ্টিত হইলেন। তিনি প্রকাশ্যে কোন বিবাদ না করিয়া বরং অধিকতর আনুগত্য করিতে লাগিলেন। ফুলমতীর এক দাসী ময়জুদ্দীনের ধাত্রী ছিল। সম্রাট্ তাহার দ্বারা পাণের খিলিতে তীক্ষ্ণ বিষ প্রয়োগ করিয়া কংসরামের জীবন শেষ করিলেন এবং সেকেন্দর উপাধি গ্রহণ করিয়া প্রকাশ্যরূপে শাসন-ভার স্বহস্তে লইলেন। তিনি নিজ মাতাকেও এক প্রকোষ্ঠে আটক করিয়া রাখিলেন।

কংসরামের পুত্র বজ্রবাহু তৎকালে পাটনায় নবাব ছিলেন। তিনি পিতার অপহত্যার সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র জলন্ত কোপে পিতৃহন্তা শত্রুর বিরুদ্ধে চলিলেন। গঙ্গা পার হওয়া কালে ময়জুদ্দীন তাঁহাকে প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া গৌড়ের দুর্গে আশ্রয় লইলেন। জনার্দ্দন গৌড়নগর অবরোধ করিলেন। ময়জুদ্দীন বিপদে পড়িয়া মাতার নিকট সদুপদেশ জিজ্ঞাসা করিলেন। কংসরামের অপহত্যা জন্য ফুলমতী ময়জুদ্দীনকে খুব তিরস্কার করিলেন। তিনি কহিলেন "সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার ক্ষমতা যখন

তোমার নাই, তখন রাজ্যশাসন হস্তগত করিবার জন্য বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া দেওয়ানজীকে বিনাশ করিলে কেন? রাজা কংস আমার সম্পূর্ণ বাধ্য ছিল। তুমি আমাকে বলিলে আমি নির্ব্বিবাদে সমস্ত শাসনভার তোমার হাতে দেওয়াইতে পারিতাম। এখন প্রকাশ্য যুদ্ধে আমি কি করিতে পারি? আমি স্ত্রীলোক, আমার সাধ্য কি? তুমি মধুসূদন খাঁকে স্বপক্ষ করিতে চেষ্টা কর। নতুবা রক্ষার কোন সদুপায় হইবে না।" ফুলমতী উভয়পক্ষের মধ্যে সন্ধিস্থাপন জন্য মধুখাঁকে আহ্বান করিলেন। তিনি যে উপায়ে জুনা খাঁকে বশীভূত করিয়াছিলেন আবার সেই উপায়েই মধুখাঁকে বশীভূত করিলেন। মধুখাঁ অমা... করিতে সাহসী হইলেন না। মধুখাঁ সন্ধির প্রস্তাব করিয়া বজ্রবাহুর নিকট দূত পাঠাইলেন। এদিকে নানাপ্রকার চক্রান্তমূলক চিঠিসমূহ গোপনভাবে বজ্রবাহুর সামন্তদের নামে পাঠাইতে লাগিলেন, যাহা বহু কষ্টে ধরা পড়ে।

সেই সকল চিঠি পাইয়া বজ্রবাহু অলীক ভ্রমে পতিত হইলেন। তাঁহার বিশ্বাস হইল যে "আমার অধিকাংশ সৈন্য ও সেনাপতি উৎকোচের বশ হইয়া বিপক্ষের সহ ষড়যন্ত্র করিতেছে। তাহারা আমাকে বন্দী করিয়া শত্রুহস্তে অর্পণ করিবে।" সেই অলীক ভয়ে প্রতারিত হইয়া জনার্দ্দন তিনশত মাত্র বিশ্বস্ত লোকসহ নিজ ছাউনী ত্যাগ করিয়া আরাকান যাত্রা করিলেন। অমনি মধু খাঁ বজ্রবাহুর ত্যক্ত সেনাগণকে ময়জুদ্দীনের বশীভূত করিয়া দিলেন। মধু খাঁর মিথ্যা চিঠি কাজে সত্যবৎ প্রতীয়মান হইল। ময়জুদ্দীন মধু খাঁর কৌশলে রক্ষা পাইলেন।

বজ্রবাহু আরাকানে উপস্থিত হইলে মৌসং অতি সমাদরপূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার সাহায্যার্থ উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। ত্রিপুরার রাজাও জনার্দ্দনের সাহায্য করিতে স্বীকার করিলেন। ইতিমধ্যে আরাকানের জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ মৌসংকে জানাইলেন যে "বাঙ্গালাদেশে বজ্রবাহুর ভাগ্য প্রসন্ন হইবে না। তিনি লঙ্কার অধীশ্বর হইবেন এবং তদ্বংশীয়েরা বহুকাল লঙ্কায় রাজত্ব করিবে।" জনার্দ্দন সেই ভবিষ্যৎ কথা শুনিয়া উপহাস করিলেন। এদিকে মৌসঙ্গের কন্যা তুপ্পা বজ্রবাহুর পত্নী হইতে ব্যগ্র হইল। মৌসং জনার্দ্দনকে তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। জনার্দ্দন সম্মত হইলেন না। মৌসং ক্রুদ্ধ হইয়া একদিন মধ্যে তাঁহাকে নিজরাজ্য ত্যাগ

করিতে বলিলেন। স্থলপথে তিনদিনের কমে আরাকান রাজ্য ত্যাগ করা যায় না। এজন্য মৌসং তাঁহাকে জাহাজে উঠিতে বলিলেন। জনার্দ্দন সঙ্গিগণ সহ জাহাজে উঠিয়া নাবিকদিগকে উৎকলে যাইতে বলিলেন। উৎকল তখন স্বাধীন পরাক্রান্ত হিন্দুরাজ্য ছিল। জনার্দ্দন উড়িষ্যা রাজ্যে সহায়তার আশা করিলেন। জাহাজ মধ্যসমুদ্রে পৌছিলে নাবিকেরা বজ্রবাহুকে কহিল "আপনি যদি রাজকুমারী তুপ্পাকে বিবাহ করেন, তবে আমরা আপনকার আজ্ঞাবহ হইয়া চলিব, নতুবা এইখানে জাহাজ ডুবাইয়া সহচরগণ সহ আপনাকে বধ করিব, ইহাই আমাদের প্রতি রাজাজ্ঞা।" জনার্দ্দনের আনুযাত্রিক মধ্যে সাতাইশ জন ব্রাহ্মণ ছিল। তাহারা প্রাণভয়ে জনার্দ্দনকে বিবাহে সম্মত হইতে বাধ্য করিল। রাজকুমারী তুপ্পা সেই সঙ্গেই অন্য জাহাজে গুপ্তভাবে ছিলেন। বজ্রবাহু সম্মত হইলে তুপ্পা জনার্দ্দনের নিকটে আসিয়া কহিলেন "তুমি আমাকে গ্রহণ না করিলে আমি আত্মহত্যা করিব" এই কথা আমি পিতার নিকট প্রকাশ করায় তিনি এই কৌশল করিয়াছিলেন। আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন, অশ্রদ্ধা করিবেন না।" জনার্দ্দন পূর্ব্বে তুপ্পাকে দেখেন নাই। এখন তাহার রূপ, যৌবন, দৃঢ় প্রণয় ও সরলতা দৃষ্টে মুগ্ধ হইলেন। প্রাণভয়ে বিবাহ করিলে দম্পতির মনোমিলন হয় না। কিন্তু তুপ্পার চরিত্রে ও সৌন্দর্য্যে বজ্রবাহুর অসন্তোষ তিরোহিত হইল। অমনি সেই জাহাজেই মালা বদল করিয়া বিবাহ হইল। বিবাহের পর জনার্দ্দন জানিলেন "আমরা উড়িষ্যায় যাইতেছি"। কিন্তু শেষে জানিলেন যে, তিনি লঙ্কাদ্বীপে উপস্থিত হইয়াছেন। সেইখানে মৌসঙ্গের মন্ত্রী বজ্রবাহুর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন "ঠাকুর! তুমি মগের কন্যা বিবাহ করিয়াছ, এখন উৎকলের হিন্দুসমাজে গেলে তোমার সম্মান থাকিবে না। আর আমাদের রাজকুমারীর তদধিক লাঞ্ছনা হইবে। উৎকলরাজ তোমার কোন সাহায্য করিবে না। বাঙ্গালাদেশে তোমার জ্ঞাতি কুটুম্বেরাও তোমার সহায় হইবে না, বরং তোমাকে একঘরিয়া করিয়া আত্মীয়গণ তোমাকে ঘৃণা করিবে। বাঙ্গালাদেশে তোমার ভাগ্য প্রবল হইবে না। এই জন্য তোমাকে লঙ্কায় আনিয়াছি। এখানে চারিজন রাজপদের দাবীদার হইয়া ঘোর যুদ্ধ ও বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছে। মহারাজ মৌসং তোমার সাহায্যার্থে প্রচুর সেনা পাঠাইয়াছেন। তুমি অতি সহজে ঐ দ্বীপ অধিকার

করিতে পারিবে। এখানকার লোক আরাকাবী মগদের সমধর্ম্মী। এখানে তুমি অতি সুখে পুরুষানুক্রমে রাজত্ব করিতে পারিবে।"

মন্ত্রীর কথাই কার্য্যতঃ ঠিক হইল। বিপ্লবকারীদের মধ্যে দুর্ব্বলপক্ষ আসিয়া জনার্দ্দনের শরণাগত হইল। ক্রমে তিন পক্ষ আসিয়া বজ্রবাহুর আশ্রয় লইলে তাঁহার দলবল প্রবল হইল। তখন প্রবল পক্ষও ক্রমশঃ জনার্দ্দনের অধীনতা স্বীকার করিল। বজ্রবাহু বিনা যুদ্ধে সমগ্র লঙ্কার অধীশ্বর হইলেন। তদ্বংশীয়েরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিল এবং বহুকাল লঙ্কায় রাজত্ব করিয়াছিল।

এদিকে ময়জুদ্দীন নিরাপদ্ হইয়া সাঁতোড় রাজ্য ধ্বংস করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু ফুলমতী ও মধুখাঁর উপদেশে ক্ষান্ত হইলেন। তথাপি তিনি জাগীর সাম্বালচক্র জব্দ করিয়া তাহার উপর বার্ষিক চৌদ্দ হাজার টাকা মালগুজারী ধার্য্য করিলেন এবং সাঁতোড়রাজের "খাঁ সাহেব" উপাধি রহিত করিলেন, তদবধি সাঁতোড়ের রাজারা "ভূঁইয়া" শ্রেণীতে অবনীত হইলেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, ঔরংজীব বাদশাহের সময় হইতে ভূম্যধিকারীদের "জমীদার" উপাধি হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে জমীদারদিগের "ভূঁইয়া বা ভূমিয়া" উপাধি ছিল। আর "পরগণা" শব্দের পরিবর্ত্তে "চাকলা" শব্দ প্রচলিত ছিল। "পরগণা" ও "জমিনদার" শব্দ আরবী ভাষামূলক। আর "ভূমিয়া, ভূঁইয়া ও চাকলা" শব্দ সংস্কৃতমূলক—ভূমি এবং চক্র শব্দ হইতে উৎপন্ন। ভূঁইয়া বা জমীদারগণের অধিকার বৃহৎ হইলে যথাক্রমে চৌধারী, রায়, রায়চৌধারী এবং রাজা উপাধি হইত *। সাঁতোড়ের রাজার "রাজা" উপাধি পূর্ব্ববৎ থাকিল; "খাঁ সাহেব" উপাধি তাঁহারা ধারণ করিতেন না। সুতরাং সেই উপাধি রহিত হওয়ায়, সাঁতোড়-রাজ ক্ষতি বোধ করেন নাই। কেবল চৌদ্দ হাজার টাকা মালগুজারী ধার্য্য হওয়াই তাঁহাদের নোকসান হইল।

আইন আকবরীতে রাজা কংসের যে বৃত্তান্ত আছে, তাহা ভ্রমপূর্ণ। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে যে, "রাজা কংস সমসুদ্দীনের অব্যবহিত পরে গৌড়ে স্বাধীন সম্রাট্ হইয়াছিলেন। তিনি মুসলমানদিগের প্রতি ঘোর অত্যাচার করিতেন।

---

* চৌধারী শব্দের অর্থ চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ভূমির অধিপতি। এখন চৌধারী শব্দের স্থানে চৌধুরী লেখা হয়, তাহা ভুল। চৌধুরী শব্দে চারি ভার বিশিষ্ট; কিন্তু সেই চারি ভার কি, তাহা কেহই জানে না।

তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল।" রাজা কংসরামকে লোকে কংসরাম বাদশাঃ বলিত বটে, কিন্তু তিনি প্রকাশ্যরূপে সম্রাট্ বা বাদশাঃ উপাধি গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার পুত্র সম্রাট্ হয় নাই এবং মুসলমানও হয় নাই। উপরি উক্ত বৃত্তান্ত গণেশনারায়ণ খাঁর সহ কতক ঐক্য হয়। গণেশ স্বাধীন সম্রাট্ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্র মুসলমান হইয়াছিল বটে, কিন্তু গণেশ ১৫০ বর্ষ পরবর্ত্তী কালের লোক। তিনি মুসলমানদের প্রতি কখন কোন অত্যাচার করেন নাই বরং তিনি তাহাদের পরম বন্ধু ছিলেন। আর একজন রাজা কংসনারায়ণ রায় আরো পরবর্ত্তী কালের লোক। তিনি তাহিরপুরের রাজা ছিলেন। তিনি আকবর বাদশাহের সময়ে শুবে বাঙ্গালার নবাব-দেওয়ান ছিলেন এবং কিছুদিন নবাব-নাজিমের কাজও করিয়াছিলেন। তিনি সম্রাট্ আকবরের সমকালীন লোক। অতএব আইন আকবরীতে যে রাজা কংসের বৃত্তান্ত আছে, তাহা অশুদ্ধ। সময়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে বোধ হয় যে, আইন আকবরীতে রাজা কংসরাম সান্যালের কথাই ভ্রমবশতঃ অশুদ্ধরূপে লেখা হইয়াছে। তাহাতে কতক কংসরামের বৃত্তান্ত এবং কতক গণেশের বৃত্তান্ত মিশ্রিত করা হইয়াছে।

মুসলমানেরা অধিকাংশ গয়সুদ্দীনের পক্ষ হইয়া ময়জুদ্দীনের বিপক্ষ হইয়াছিল, এই জন্য ময়জুদ্দীন মুসলমান কর্ম্মচারীদিগকে দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন না। সাঁতোড়ের রাজবংশের প্রতিও তাঁহার বিদ্বেষ ছিল। একজন্য মধুখাঁ তাঁহার একমাত্র প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসী হইয়াছিলেন। ময়জুদ্দীন নিতান্ত অলস, বিলাসী এবং অকর্ম্মণ্য লোক ছিলেন। তিনি নানাজাতীয় বহুসংখ্যক উপপত্নী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহাদিগকে লইয়া নৃত্য, গীত, বাদ্য, উত্তম আহার, বস্ত্র, গন্ধ, শয্যা ইত্যাদি বিলাসিজনপ্রিয় বস্তু লইয়া দিবারাত্রি সময়ক্ষেপণ করিতেন। তিনি রাজকার্য্য কিছুই করিতেন না। মধুখাঁ তাঁহার নিকট যে সকল কাগজ পাঠাইতেন, তিনি সেই বিলাস-মন্দিরে বসিয়াই তাহা দস্তখত মোহর করিয়া দিতেন। মধুখাঁ বাদশাহের উজির এবং কুলমতীর উপপতি হইয়া সমস্ত রাজকার্য্য চালাইতেন। মধুখাঁর কর্ত্তৃত্বসময়ে ভাদুড়িয়ার রাজা তাঁহার জাগীর ভাদুড়িয়ার চতুষ্পার্শ্বে রামবাজু, প্রতাপবাজু, সোনাবাজু ও বড়বাজু নামে চারিটি পরগণা অতি অল্প মালগুজারীতে জমীদারীরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আর

একটাকিয়া ভাদুড়ীদের এবং তাহাদের আত্মীয় কুটুম্বদের মধ্যে অনেকেই প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। লোকের মনোরঞ্জন করিবার জন্ত একটাকিয়াদিগের বিশেষ ক্ষমতা ছিল। তাহারা যে কেহ যে কোন কার্য্যে নিযুক্ত হউক, তাহাতেই সকলের নিকট প্রশংসিত হইত। ইহাতে একটাকিয়া বংশের মান, পদবী, ঐশ্বর্য্য এবং ক্ষমতা অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল।

ময়জুদ্দীনের একান্ত অকর্ম্মণ্যতা বাঙ্গালাদেশের পক্ষে অত্যন্ত কল্যাণকর হইয়াছিল। কারণ মধুখাঁ ও ফুলমতী এরূপ সুচারুরূপে রাজকার্য্য চালাইতেন যে, ময়জুদ্দীনের রাজত্ব রামরাজ্যের ন্যায় প্রজাগণের সুখকর হইয়াছিল। ফুলমতী দয়া এবং দানশীলতার জন্য প্রসিদ্ধা এবং মধুখাঁ সুবিচার ও কার্য্যদক্ষতা জন্য সর্ব্বত্র প্রশংসিত হইয়াছিলেন। ফুলমতীর অন্যান্য সদ্‌গুণ এত অধিক ছিল যে, তাহার অসতীত্ব সত্বেও লোকে তাহাকে ভক্তি করিত। গৌড় বাদশাহের ঘরে একটাকিয়া ভাদুড়ীদের সম্মান ও কর্ত্তৃত্ব যথেষ্ট ছিল। তাহাদের কেহ উজির, কেহ নাজির, কেহ মন্ত্রী, কেহ সেনাপতি, কেহ বা প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তা ছিল। পরবর্ত্তী কালে মোগল সম্রাট্‌দের ঘরে রাজপুত রাজাদের যাদৃশ সম্ভ্রম ও ক্ষমতা হইয়াছিল. গৌড়বাদশাহের ঘরে একটাকিয়াদের তদপেক্ষা বেশী বই কম ছিল না। রাজপুত রাজারা দিল্লীশ্বরকে কন্যা দিতেন, একটাকিয়ারা গৌড়েশ্বরকে কখন কন্যা দিতেন না। কিন্তু মধ্যে মধ্যে পাত্র দিতে বাধ্য হইতেন। সৈয়দ হোসেন শাঃ এই প্রথার প্রথম প্রবর্ত্তক।

ময়জুদ্দীনের বংশধরেরা সকলেই অলস, বিলাসী এবং অকর্ম্মণ্য ছিল। একটাকিয়া ভাদুড়ীরাই তাহাদের রাজত্ব চালাইত। সেই অকর্ম্মণ্য গৌড়-বাদশাগণ আপনাদের শরীর এবং উপপত্নী-প্রকোষ্ঠ (রঙ্গমহল) রক্ষার্থ কতকগুলি খোজা (ক্লীব) এবং হাব্‌সী (কাফ্রি) নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শেষে সেই হাব্‌সীগণ সমসুদ্দীনের বংশ ধ্বংস করিয়া নিজেরাই বাদশাঃ হইয়াছিল। হিন্দু মুসলমান সকলেই তাহাদিগকে ঘৃণা করিত। দূরবর্ত্তী প্রদেশের জমীদার ও শাসকগণ তাহাদিগকে রাজস্ব দিত না। এই অরাজক অবস্থা চারি বৎসর ছিল। তাহার পর সৈয়দ হোসেন শাঃ বহুসংখ্যক হিন্দু মুসলমান প্রবল লোকদিগকে হস্তগত করিয়া গৌড়ের সম্রাট্ হইলেন এবং হাব্‌সীদিগের অধিকাংশ হত্যা করিলেন। অবশিষ্ট লোকদিগকে দাক্ষিণাত্যে তাড়াইয়া দিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

মুসলমানধর্ম্মের উৎপত্তিস্থান আরবদেশ অতি দরিদ্র মরুভূমি। ঐ ধর্ম্মের উৎপত্তিসময়ে আরবদেশে ধনবান্ বা বিদ্বান্ লোক কেহ ছিল না। মহম্মদ নিজেও নিরক্ষর মূর্খ ছিলেন। আবার মুসলমান দায়ভাগ অনুসারে মৃত ধনীর বহু উত্তরাধিকারী হয়। সুতরাং কোন ব্যক্তির কিঞ্চিৎ সম্পত্তি হইলে, তাহার মৃত্যুর পর অমনি তাহা শত খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যায়। সেই জন্য আরবে পুরুষানুক্রমিক বড় লোক কেহ না থাকায়, কুলমর্য্যাদা কাহাকে বলে, আরব দেশে কেহ তাহা জানিত না। মুসলমানধর্ম্মপুস্তকে কুত্রাপি কুল-মানের কোন উল্লেখ নাই বরং মহম্মদের স্পষ্ট মত এই যে, "প্রত্যেক ব্যক্তি কেবল নিজের গুণ ও কর্ম্ম দ্বারা যে কিছু ছোট বড় হউক, তদ্ভিন্ন আর কোন ইতর বিশেষ নাই, সকল মনুষ্যই সমান"। মুসলমানেরা প্রথম প্রথম সেই মত অনুসারেই চলিত। দশ দিরম্ অর্থাৎ ৩।/০ তিন টাকা পাঁচ আনা মূল্যেই একটি আরবী লোককে দাসদাসীরূপে ক্রয় করা যাইত। আবার সেই দাস দাসী অল্পকাল মধ্যেই ক্রেতার পতি, পত্নী, জামাতা বা পুত্রবধূ হইতে পারিত। মহম্মদ নিজেও খাদিজা বিবির রাখালী চাকরীতে নিযুক্ত হইয়া, তিন বৎসর মধ্যে তাহার স্বামী হইয়াছিলেন। যখন মুসলমানেরা নানা দেশ জয় করিয়া ধনবান্ হইল, নানা দেশের বিদ্যা শিক্ষা করিয়া অনেক লোক বিদ্বান্ হইল, তখন তাহাদের মধ্যে অনেকে বংশানুক্রমে বড়লোক হইল। অমনি তাহাদের কুলাভিমান উৎপন্ন হইল। কন্যার যাবজ্জীবন বিবাহ না হইলেও আমীর ও সৈয়দগণ নীচ কুলে তাহাদের বিবাহ দিত না। কিন্তু পুরুষের বিবাহে তদ্রূপ বিচার ছিল না। বেশ্যা কিংবা মেথরাণীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে তাহারা কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিত না।

সৈয়দ হোসেন শাহের পূর্ব্বপুরুষ, সুবুদ্ধিখাঁর চাকর ছিলেন। মধুখাঁর কর্ত্তৃত্বসময়ে সৈয়দ আলি গৌড়বাদশাহের ফৌজদারী কর্ম্ম পাইয়াছিলেন। তৎপুত্র সৈয়দ হোসেন হাব্শী বাদশাহের সেনাপতি হইয়াছিলেন। তিনি বিদ্রোহদমনের ব্যপদেশে সৈন্য লইয়া গিয়া বিদ্রোহীদের সহ মিলিত হইয়াছিলেন। সাঁতোড় ও ভাদুড়িয়ার রাজারাও সৈয়দ হোসেনের সাহায্য করিতে লাগিলেন।

এইরূপে প্রবল হইয়া সৈয়দ হোসেন হাব্‌শীদিগকে পরাজয় করিয়া গৌড়ে বাদশাঃ হইলেন। তিনি বহুসংখ্যক হাব্‌শীর প্রাণবধ করিলেন। অবশিষ্টেরা দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করিল। হাব্‌শী রাজত্বে যে সমস্ত হিন্দু ও মুসলমান জমিদার বিদ্রোহী হইয়াছিল, তাহারা সহজেই সৈয়দের বশ্যতা স্বীকার করিল।

সৈয়দ হোসেন অতি উগ্রস্বভাব এবং স্বেচ্ছাচরী ছিলেন। কিন্তু বুদ্ধিমান্, সদাশয় ও কার্য্যদক্ষ লোক ছিলেন। পাঠান-রাজত্বে কোন শৃঙ্খলা ছিল না। রাজধানী হইতে দূরবর্ত্তী স্থানে যে যাহা করুক, নবাব ও গৌড়বাদশাঃগণ তদ্বিষয়ে কোনই তদন্ত করিতেন না। দূরবর্ত্তী জমিদারেরা রাজস্ব দিলেই নবাব ও গৌড়বাদশাঃগণ তৃপ্ত থাকিতেন। তাঁহাদের দোষ গুণের ফলাফল কেবল নিকটবর্ত্তী স্থানেই অনুভূত হইত। মধুখাঁর শাসনসময়ে তিনি সমস্ত সাম্রাজ্য সুশাসনের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। সেই সকল নিয়মাবলী সৈয়দ হোসেন কার্য্যে পরিণত করিলেন। তিনি সমস্ত জমিদারগণের নিকট কবুলীয়ত লইয়া তাহাদিগকে পাট্টা দিয়াছিলেন। সেই সকল পাট্টায় তাহাদের কি কি কর্ত্তব্য তাহা লেখা থাকিত। অধিকন্তু তিনি সর্ব্বদা অনুসন্ধান রাখিতেন এবং জমিদারগণকে নিজ হুকুম মত কার্য্য করিতে বাধ্য করিতেন। মদ খাওয়া এবং জুয়া খেলা তাঁহার রাজত্বে সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছিল। চোর ডাকাইত এবং ঠগগণ তাঁহার ভয়ে সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিত। লোকে বলে, তাঁহার ভয়ে বাঘে ছাগে একঘাটে জল খাইত অথচ কেহ কাহারও মুখের প্রতি দৃষ্টি করিতে সাহস পাইত না। তিনি আপনাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া জ্ঞান করিতেন। তিনি প্রজা ও ভৃত্যদিগকে বাধ্য করিয়া প্রণাম গ্রহণ করিতেন। তিনি কাহারও কথার বাধ্য ছিলেন না। তজ্জন্য তাঁহার কর্ম্মচারীদের কোন প্রাধান্য ছিল না; কাজেই তাহাদিগকে কেহ প্রচুর উৎকোচ দিত না। তাঁহার আহার ও পরিচ্ছদ অতি সামান্য ছিল। তিনি নৃত্য, গীত, বাদ্য, চাটুকারি, তামাসা ভালবাসিতেন না। তিনি গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। তিনি হিন্দুদের প্রতি বিশেষ কোন অত্যাচার করেন নাই। তিনি বহুসংখ্যক মস্‌জীদ, পান্থনিবাস (সরাই) ও শড়ক প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তিনি পারসী ও আরবী ভাষা শিক্ষার জন্য বহু বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অতি সহজেই ক্রুদ্ধ হইতেন এবং ক্ষুদ্র অপরাধে কঠিন দণ্ড করিতেন। তাঁহার

স্ত্রীপুত্রও তাঁহার নিকট কথা বলিতে ভয় পাইত। ফলতঃ যে সকল লোক তাঁহার নিকটস্থ ছিল তাহারা তাঁহাকে ভালবাসিত না। অথচ দূরস্থ প্রজা ও ভৃত্যগণ তাঁহার গুণ গান করিত। তাঁহার সময়ে ১২ জনঃ প্রধান জমিদার বাঙ্গালা দেশে ছিল। তাহাদিগকে বারভূঁইয়া বলিত। সেই বারভূঁইয়ারা পূর্ব্বে প্রায় স্বাধীন ছিল। সৈয়দ হোসেন তাহাদের ক্ষমতা সঙ্কুচিত করিয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণ আজ্ঞাকারী করিয়াছিলেন। কিন্তু বোধ হয় চন্দ্রদ্বীপের রাজাকে ততদূর আয়ত্ত করিতে পারেন নাই।

সৈয়দ হোসেন শাহের চারি পত্নীর গর্ভজাত বহু কন্যা হইয়াছিল। তন্মধ্যে দুইটি কন্যার বয়স বিংশতি বৎসরের অধিক হইয়াছিল, অথচ সমকক্ষ পাত্র না পাওয়ায় তাহাদের বিবাহ দিতে না পারিয়া তিনি চিন্তিত ছিলেন। জাগীরদারেরা প্রতিবৎসর নিতান্ত পক্ষে একবার বাদশাহের নিকট গিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিতে বাধ্য ছিলেন। সেই নিয়মানুসারে একটাকিয়ার রাজা মদন খাঁ নিজের দুই পুত্র কন্দর্প ও কামদেব খাঁকে সঙ্গে লইয়া বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। সম্রাট্ দেখিলেন, মদনের পুত্রদ্বয় অতি সুন্দর, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ এবং যুবা পুরুষ। তাহারা কুলীন ব্রাহ্মণ এবং রাজপুত্র সুতরাং সর্ব্বাংশেই তাঁহার কন্যার যোগ্যপাত্র। তিনি অমনি মদনকে সপুত্রক আটক করিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। মদন অতি বিনীতভাবে কহিলেন "ধর্ম্মাবতার! আপনি আমাদের রাজা এবং রক্ষক, আমি আপনকার একান্ত অনুগত এবং হিতার্থী ভৃত্য। আমার প্রতি অত্যাচার করা হুজুরের পদবীর অযোগ্য।" বাদশাঃ চতুরতা পূর্ব্বক কহিলেন "খাঁ সাহেব! আমি এটাকিয়ার রাজবংশীয়দিগকে অতিশয় ভালবাসি এবং মান্য করি। তোমরা যেমন হিন্দুর গুরু ব্রাহ্মণ, আমরা তেমনি মুসলমানগণের গুরু সৈয়দ। তোমাদের কন্যা যেমন অপর হিন্দু বিবাহ করিতে পারে না, তেমনি আমাদের কন্যা কোন অপর মুসলমানে বিবাহ করিতে পারে না। তোমাকে অতীব সম্ভ্রান্ত জানিয়াই তোমার পুত্রসহ আমি কন্যার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করি। কোনরূপ অত্যাচার করা অভিপ্রায় নহে। আমি তোমার পুত্রগণকে মুসলমান হইতে বলি না। বরং পত্নীই পতীর ধর্ম্ম অনুসরণ করে, ইহাই জগতের সাধারণ রীতি। তুমি যদি আমার কন্যাদিগকে স্বজাতিতে মিলাইয়া লইতে চাও, তাহাতেও আমি সম্মত আছি। নতুবা তোমার পুত্রেরা আমার

ধর্ম্ম গ্রহণ করুক, আমি তাহাদিগকে স্বজাতিতে মিলইয়া লইব। এই উভয় প্রস্তাব মধ্যে যেটি তোমার বাঞ্ছিত হয়, আমি তাহাই স্বীকার করিব। কিন্তু যদি তুমি উভয়ই অস্বীকার কর, তবে আমি বলপূর্ব্বক তোমাকে বাধ্য করিব।" মদন বাদশাহের উগ্র স্বভাব জানিতেন। তিনি দেখিলেন বাদশাহের উভয় প্রস্তাব অস্বীকার করিলে বহুলোকের প্রাণনাশ ও জাতিনাশ হইবে। আর মুসলমানকে নিজ জাতিতে মিলাইবার কোন উপায়ও নাই। অগত্যা তিনি দুই পুত্রের মায়া ত্যাগ করিলেন। তাহারা মুসলমান হইয়া শাঃজাদীদ্বয়কে বিবাহ করিল।

এইরূপে বলপূর্ব্বক ধৃত জামাতারা কন্যার প্রতি অনুরক্ত হইবে কি না তদ্বিষয়ে বাদশার অতিশয় সন্দেহ ছিল। তিনি তাহাদিগকে বশীভূত করার জন্য প্রচুর সম্পত্তি এবং রাজকীয় উচ্চ পদ দিয়াছিলেন। বাদশাহের কন্যারা অতি সুন্দরী ছিল। সম্রাট্ দেখিলেন, কন্যা ও জামাতার বেশ প্রণয় হইয়াছে এবং তাহারা সুখী হইয়াছে। সেই জামাতারা বিদ্বান্ ও কার্য্যদক্ষ লোক। বাদশাঃ তাহাদিগকে যখন যে কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন, তাহারা সেই কার্যাই সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়া প্রশংসিত হইত। ইহাতে বাদশাহের উৎসাহ বৃদ্ধি হইল। তিনি পরিভ্রমণচ্ছলে সাতগড়ায় উপস্থিত হইয়া মদনের পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র আরও এগার জনকে ধরিয়া আনিয়া মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। এবং তাহাদের সহ নিজের অবশিষ্ট সমস্ত কন্যার বিবাহ দিলেন। মদনের চতুর্থ পুত্র রতিকান্তের দৃষ্টিশক্তি কম ছিল। সে রাত্রিতে একবারেই দেখিতে পাইত না। বাদশাঃ কেবল তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাহারই দ্বারা মদনের বংশরক্ষা হইয়াছিল। সম্রাট্ রহস্য করিয়া মদনকে বলিতেন "বুঝেছ বিহাই! যে অন্ধ, সেই হিন্দু থাকুক ; যাহার চক্ষু আছে, তাহার মুসলমান হওয়াই উচিত।"

এই অবধি পথ পড়িল। ইহার পর অনেক নবাব ও বাদশাঃ এটাকিয়ার যুবক ধরিয়া তৎসহ কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। ঘটকদের পুস্তকে ২৯ জন এটাকিয়ার, মুসলমান রাজকুমারী বিবাহ করিয়া জাতিভ্রষ্ট হওয়া জানা যায়। তজ্জন্য এটকিয়ারা হিন্দু মুসলমানের কুলীন বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। প্রথম যখন কন্দর্প ও কামদেব মুসলমান হইয়া শাঃজাদীদ্বয়কে বিবাহ করিয়াছিল, তখন দেশব্যাপী অখ্যাতি এবং আন্দোলন হইয়াছিল। তাহার পর পুনঃ পুনঃ ঐরূপ ঘটনা হওয়ায় তাহা অভ্যস্ত হইল। তখন আর বেশী কিছু আন্দোলন বা

আক্ষেপের কারণ হইত না। মুসলমান রাজকুমারীরা প্রায়শঃ অতি সুন্দরী হইত। যে সকল একটাকিয়ার রাজকুমার তাহাদিগকে বিবাহ করিত, তাহারা মুসলমান সমাজে বিলক্ষণ সম্ভ্রম পাইত, প্রচুর সম্পত্তি এবং রাজকীয় উচ্চপদ পাইত। সুতরাং জাতিপাত জন্য বিশেষ দুঃখিত হইত না। বরং অনেকে তাহা সুখকর জ্ঞান করিত। তাহাদের হিন্দু জ্ঞাতি কুটুম্বেরা প্রথম প্রথম তাহাদের সহ কোনরূপ আত্মীয়তা করিত না; কিন্তু অভ্যস্ত হওয়ার পর পরস্পর আত্মীয়তা থাকিয়া যাইত এবং পরস্পর সাহায্যও করিত। জাতিভ্রষ্ট একটাকিয়ারা হিন্দুর উত্তরাধিকারী হইত না এবং তজ্জন্য চেষ্টাও করিত না।

সর্ব্বত্রই মুসলমানেরা কোন বিধর্ম্মীকে স্বধর্ম্মে আনিতে পারিলে মহাপুণ্য জ্ঞান করে। ভারতবর্ষীয় মুসলমানেরা কোন ব্রাহ্মণকে মুসলমান করিতে পারিলে, সমধিক পুণ্য জ্ঞান করিত। একটাকিয়াদের ন্যায় সঙ্গতিপন্ন সম্ভ্রান্ত কুলীন ব্রাহ্মণকে মুসলমান করা বাঙ্গালার নবাব ও বাদশাঃগণ অতীব গৌরবের বিষয় বোধ করিতেন। মুসলমান আমীরেরা সচরাচর নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনেয় সহ কন্যার বিবাহ দিত। তাহা না যুটিলেই একটাকিয়ার যুবক ধরিয়া তাহাকে মুসলমান করিত এবং তৎসহ কন্যার বিবাহ দিত। মুসলমানেরা অনেক হিন্দুর কন্যা হরণ করিত; একটাকিয়াদের মুসলমান শাখা হইতে অনেক কন্যা নবাব ও বাদশাঃগণ বিবাহ করিয়াছেন। কিন্তু একটাকিয়াদের হিন্দুশাখা হইতে কখন কোন কন্যা মুসলমান কর্ত্তৃক হৃত হয় নাই। একটাকিয়ারা ধনী ছিল, তাহাদের অঙ্গনাগণ অন্তঃপুরে গুপ্ত থাকিত। মুসলমানেরা তাহাদের বিষয় কিছুই জানিতে পারিত না। ইহাই তাহাদের ধর্ম্মরক্ষার কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। পরন্তু একটাকিয়ারা অতিশয় প্রবল লোক ছিল, তাহাদের ঘর হইতে রমণী হরণ করা সহজ ছিল না, ইহাই দ্বিতীয় কারণ বোধ হয়।

শাঃ সমসুদ্দীন চলনবিলের দক্ষিণে শিথাই সান্যালকে এবং উত্তরে সুবুদ্ধি খাঁকে জাগীর দিয়াছিলেন। কিন্তু চলনবিল কাহাকেও দেন নাই। অথচ বিলটি উভয়েই দখল করিয়া লইয়াছিলেন। বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের মধ্যে সীমানা লইয়া কোন গোলযোগ হয় নাই। ক্রমে বিলের কয়েকটি দ্বীপ পয়স্তি হইল এবং তাহারই অধিকার লইয়া উভয় রাজ্যে বিবাদের সূচনা হইল। সান্যাল রাজ্যের অধীন টেরীগ্রাম-নিবাসী শ্যামচাঁদ ও রামচাঁদ নামে দুইজন বারেন্দ্র কায়স্থ

চলনবিলের মধ্যে দুইটি দ্বীপে বাস করিয়া জলপথে দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করিল *। ক্রমে তাহাদের দলবল বৃদ্ধি হইল। তাহারা বিলের মধ্যে নৌকা লুঠ করিত এবং বিলের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে পড়িয়া লুঠ করিয়া আনিত। ক্রমেই তাহাদের সাহস ও পরাক্রম বর্দ্ধিত হইল। তাহারা নদী দিয়া দূরবর্ত্তী স্থানে গিয়া দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল। তাহাদের বাসস্থান অদ্যাপি "শামা রামার ভিটা" নামে প্রসিদ্ধ। সেই দস্যুদিগকে দমন করিতে সাঁতোড়ের রাজা এবং ভাতুড়িয়ার রাজা বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হন নাই। পরে গৌড়ের সম্রাট্ও তাহাদের বিনাশের জন্য চেষ্টা করিলেন, তাহাদের নিবাসদ্বীপ অধিকার করিলেন; কিন্তু তাহাদিগকে বশীভূত করিতে পারিলেন না। তাহারা নৌকায় থাকিয়া যমুনা, পদ্মা এবং মেঘনা নদীর তীরবর্ত্তী স্থান সমস্ত উৎসন্ন করিতে লাগিল। বাদসাহী সেনা ফিরিয়া গেলে অমনি আসিয়া নিজ নিজ বাসদ্বীপ পুনরধিকার করিল। তাহারা ব্রাহ্মণ-হত্যা করিত না, কিন্তু সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া তিন কাহন কড়ী এবং এক ধুতী চাদর দিয়া ছাড়িয়া দিত। অন্য লোকের ঘর বাড়ী দাহ করিত, সুন্দরী রমণী হরণ করিয়া নিজ দলস্থ লোকের মধ্যে বিতরণ করিত অথবা স্থানান্তরে বিক্রয় করিত এবং বহু লোকের ধন প্রাণ হরণ করিত। তাহাদের দৌরাত্ম্যে বাঙ্গালা দেশের অর্দ্ধভাগ প্রকম্পিত হইত। অথচ তাহাদিগকে দমনের কেহ কোন সদুপায় করিতে পারিলেন না।

অবশেষে সাঁতোড়ের রাজা অবনীনাথ সেই দস্যুদ্বয়কে সদ্ভাবে শান্ত করিতে মনস্থ করিলেন। কোলা গ্রামের কালীকিশোর আচার্য্য, শ্যামা রামার গুরুঠাকুর ছিলেন। রাজা তাঁহাকে আনিয়া এই নিয়মে সন্ধি করাইয়া দিতে অনুরোধ করিলেন যে, শ্যামচাঁদ ও রামচাঁদ প্রত্যেকে পঁচিশ খাদা অর্থাৎ ৪০০/ বিঘা ভূমি বার্ষিক তিন টাকা দুই আনা জমায় আয়মা পাইবে। কালীকিশোর নিজে দুই খাদা জমি ব্রহ্মত্র পাইবেন। শামা রামার অনুচরগণ সাঁতোড়ের সৈন্যদলে চাকরী করিবে। আর তাহারা দুই ভ্রাতা প্রত্যেকে একশত এক টাকা বেতনে রাজার সৈন্যগণের সেনানী হইবে †। তাহাদের গত কালের কুকার্য্য জন্য কোন দণ্ড হইবে না।

---

* তৎকালে ডাকাতী করা বীর পুরুষের কার্য্য বলিয়া গণ্য ছিল। তাহাতে বিশেষ নিন্দা হইত না।

† হিন্দুরা অঙ্কের শেষে শূন্য থাকা অশুভ জ্ঞান করিত। এজন্য বিবাহের পণ, বেতন ও ঋণ গ্রহণে অঙ্কের শেষে শূন্য রাখিত না।

তাহারা ভবিষ্যতে কোনরূপ দৌরাত্ম্য করিবে না। কালীকিশোর অনেক ইতস্ততঃ করিয়া সন্ধি করাইতে সম্মত হইলেন। শামা রামা গুরুর উপদেশ লঙ্ঘন করিল না। কেবল আয়মা ৮০০/ বিঘা স্থলে ১০০৮/ বিঘা লইয়া অন্যান্য সমস্ত প্রস্তাব স্বীকার করিল। তদবধি সাঁতোড়রাজ্য-ধ্বংস পর্য্যন্ত শামা রামার বংশ সান্যাল-রাজ্যের সেনাপতি ছিল। তাহাদের বংশীয়েরা এখনও অষ্টমিন্‌স্ গ্রামে বাস করিতেছে। গৌড় বাদশাঃ শামা রামাকে ধরিয়া দিতে রাজা অবনীনাথকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি নিজ প্রতিজ্ঞা হেতু সম্মত হন নাই। অধিকন্তু তিনি ইহাও বাদশাহকে জানাইলেন যে, শামা রামাকে দণ্ড করিলে পুনরায় ডাকাতী ও নানারূপ অশান্তি আরম্ভ হইবে।

জাগীর লাভের পর রাজা কংসরামের আধিপত্যসময়ে সাঁতোড়ের রাজারা আরও পাঁচ পরগণা জমিদারী পাইয়াছিলেন। একটাকিয়ারাও মধুখাঁর আধিপত্য-কালে রামবাজু, প্রতাপবাজু, সোণাবাজু এবং বড়বাজু নামে চারি পরগণা জমিদারী পাইয়াছিলেন। ইহাতে উভয় রাজ্যেরই পরাক্রম বৃদ্ধি হইয়াছিল। সাঁতোড় চলনবিল হইতে দূরে ছিল, কিন্তু সাতগড়া চলনবিলের মধ্যে ছিল। শামা রামা রাজা অবনীনাথের চাকরী স্বীকার করায় সমস্ত চলনবিল সাঁতোড় রাজ্যের অধীন হইল। তাহাতে অপমান এবং অসুবিধা দেখিয়া ভাতুড়িয়ার রাজা গণেশনারায়ণ খাঁ চলনবিলের অর্দ্ধার্দ্ধি করিয়া সীমা নির্দ্দিষ্ট করিতে রাজা অবনীনাথের নিকট প্রস্তাব করিলেন। অবনীনাথ তাহাতে সম্মত না হওয়ায় বিবাদ এবং যুদ্ধোদ্‌যোগ হইল। অবনীনাথের সেনার প্রায় সমস্তই হিন্দু এবং সেনাপতিগণ ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ। একটাকিয়াদের হিন্দু সমাজ অপেক্ষাও মুসলমান সমাজে মান্য বেশী ছিল এবং মুসলমানেরাই তাঁহাদের প্রধান সহায় ছিল। গণেশের সৈন্যের অধিকাংশ মুসলমান এবং সেনাপতিগণ পাঠান ছিল। শামা রামা জলপথে ভাতুড়িয়ার উপর পড়িয়া লুঠ পাট আরম্ভ করিল। গণেশ চলনবিল ঘুরিয়া সাঁতোড় রাজ্য আক্রমণ করিলেন। রাজা অবনীনাথও তাঁহার প্রতিকার জন্য সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন। এমন সময়ে কালীকিশোর মধ্যবর্ত্তী হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন।

কালীকিশোর আচার্য্য প্রথমে গণেশের নিকট গিয়া কহিলেন "যাহাতে আপনাদের উভয় রাজার জয়লাভ হয়, উভয়ের সুখ ও সম্মান বৃদ্ধি হয়, আমি

এমন সদুপায় করিতে পারি। আপনি সেই নিয়মে সন্ধি করুন। গণেশ কহিলেন "উভয় পক্ষের জয় কিরূপ।" কালীকিশোর কহিলেন "তাহা পরে বলিব। যদি আপনি চলনবিলের উত্তরার্দ্ধ পান এবং আপনার সম্মান বৃদ্ধি হয়, তবে আপনি সম্মত হন কি না?" গণেশ সম্মতি দিলেন। পরে কালীকিশোর অবনীনাথের নিকট ঐরূপ সন্ধিতে তাঁহার সম্মতি লইলেন। তাহার পর কালীকিশোর গণেশের পুত্র যদুনারায়ণের সহ অবনীনাথের কন্যা নবকিশোরীর বিবাহ দিয়া চলনবিলের উত্তরার্দ্ধ কন্যাকে যৌতুক দিতে বলিলেন। উভয়েই কুলীনব্রাহ্মণ এবং রাজা। অবনীনাথ বাৎস্যগোত্র এবং গণেশ কাশ্যপগোত্র। উভয়েরই পুত্র কন্যা সুন্দর। সুতরাং সেই প্রস্তাব উভয়েই সাগ্রহে স্বীকার করিলেন। কাটাকাটি, লুঠপাট, প্রজাপীড়নের পরিবর্ত্তে আমোদ প্রমোদ ও পুণ্য প্রতিষ্ঠায় যদুর সহ নবকিশোরীর বিবাহ হইল। রাজা অবনীনাথ চলনবিলের উত্তরার্দ্ধসহ বহুলক্ষ টাকার দ্রব্যজাত যৌতুক দিলেন। গণেশ কহিলেন "যদু আমার এ পর্য্যন্ত একমাত্র পুত্র। যদি ভবিষ্যতে অন্য পুত্র হয়, তথাপি জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজ্য পাইবে। সুতরাং আমি সর্ব্বস্বই এই পুত্র ও বধূকে দিতে পারি।" যাহা হউক, তিনি নিজের অর্দ্ধরাজ্য তৎক্ষণাৎ পুত্রবধূকে দান করিলেন! উভয়পক্ষ হইতে জয়ধ্বনি হইল। যুদ্ধের পরিবর্ত্তে নৃত্য, গীত, বাদ্য এবং মহোৎসব হইল। উভয়পক্ষ বহুতর দান বিতরণ করিলেন। কালীকিশোর উভয় রাজার নিকট নানারূপ পুরস্কার এবং ব্রহ্মত্র পাইলেন। উভয় রাজারই সম্মান ও পরাক্রম বৃদ্ধি হইল। গণেশ মহানন্দে সাতগড়ায় প্রত্যাগমন করিলেন।

অল্পদিন মধ্যে গৌড়বাদশাহের মৃত্যু হইল। তাঁহার বড় বেগমের পুত্র আজিম শাঃ বয়সে ছোট ছিলেন এবং ছোট বেগমের পুত্র নসেরিৎ শাঃ বয়সে বড় ছিলেন। উভয়েই সম্রাট্ উপাধি ধারণ করিলেন। আজিম শাঃ গণেশের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। গণেশ তাঁহার সহায়তা করিতে স্বীকার করিয়া নিজ দলবল ও রসদ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, তাঁহার নূতন বৈবাহিকের নিকটও সাহায্য চাহিলেন। রাজা অবনীনাথ শামা রামার অধীনে দ্বাদশ সহস্র সৈন্য পাঠাইলেন। গণেশ নিজের বিশ হাজার সিপাহী এবং বৈবাহিকের বার হাজার, মোট বত্রিশ হাজার সৈন্য লইয়া আজিমের সাহায্যার্থ চলিলেন।

তখন সাতগড়া হইতে গৌড়ে যাইবার দুইটি পথ ছিল। একটি চলনবিলের

উত্তরবর্ত্তী, অপরটি দক্ষিণবর্ত্তী। গণেশ উত্তরবর্ত্তী পথে আজীম শাহের সহ যোগ দিতে গৌড়াভিমুখে চলিলেন। কিন্তু আজীম শাঃ শক্রতাড়িত হইয়া সে দিকে যাইতে পারিলেন না। তিনি দক্ষিণবর্ত্তী পথে সাতগড়া চলিলেন। নসেরিৎ শাঃ আজিমের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন।

তালোরের নিকট উভয় ভ্রাতার যে যুদ্ধ হইল, আজিম তাহাতে হত হইলেন। এ দিকে গণেশ আসিয়া গৌড়নগর অধিকার করিলেন। নসেরিৎ সংবাদ পাইয়া ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু গণেশের সহ যুদ্ধে তিনিও হত হইলেন। নসেরিতের কোন সন্তান ছিল না। আশ্‌মানতারা নামে আজিম শাহের একটি নাবালিকা কন্যা মাত্র ছিল। মুসলমান-রীতি অনুসারে স্ত্রীলোকে রাজত্ব পাইতে পারে না, সুতরাং গণেশ নিজেই সম্রাট্ হইলেন। একটাকিয়ার রাজারা হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিরই সমান ভক্তিপাত্র ছিলেন, সুতরাং কেহই তাঁহাকে কোন বাধা দিল না। তিনি রাজা অবনীনাথকে সহায়তার পুরস্কারস্বরূপ চারি পরগণা জমিদারী দিয়াছিলেন। নসেরিতের ও আজিমের বেগমেরা গণেশের উপপত্নী-রূপে গৌড়ের রাজপ্রাসাদেই থাকিলেন। গণেশের নিজ পরিবার পাণ্ডুয়াতে থাকিত। মীর ফর্জন্দ হোসেন লিখিয়াছেন যে "রাজা গণেশ বেগমদিগকে গোপনে নিকা করিয়াছিলেন। তিনি যখন গৌড়ে থাকিতেন, তখন প্রায় মুসলমানের ন্যায় চলিতেন। আবার যখন তিনি পাণ্ডুয়াতে থাকিতেন অতি নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণের ন্যায় সদাচারে থাকিতেন। হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিই তাঁহাকে স্বজাতি জ্ঞান করিত। তিনি বেগমদের নামে গৌড়নগরে অনেক দর্গাঃ ও মসজীদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। আবার পাণ্ডুয়া, টণ্ডা এবং বাঁট্‌রাতে নিজনামে বহুতর দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি অতি মিষ্টভাষী ও শিষ্টাচারী ছিলেন। তিনি উভয় ধর্ম্মেরই উৎসাহ দিতেন। কিন্তু কাহাকেও ভিন্ন ধর্ম্মের নিন্দা করিতে দিতেন না। তিনি পরমসুখে বিশ বৎসর সাম্রাজ্য ভোগ করিয়া উপরত হইলে তৎপুত্র যদুনারায়ণ খাঁ সম্রাট্ হইয়াছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

গণেশ সম্মুখ যুদ্ধে মুসলমান সম্রাট্‌কে নষ্ট করিয়া প্রকাশ্যরূপে সম্রাট্‌ হইয়াছিলেন এবং তিন পুরুষ বরাবর রাজত্ব করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রে শিবজী এবং পঞ্জাবে রণজিৎ সিংহ ভিন্ন আর কোন হিন্দু রাজা এরূপ করিতে পারেন নাই। যদি গণেশের সন্তানেরা বরাবর স্বধর্ম্মে থাকিতেন, তবে এই ঘটনা ভাদুড়ী-বংশের এবং সমস্ত বাঙ্গালীর বড়ই গৌরবের বিষয় হইত। কিন্তু যদুনারায়ণ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করায়, বাঙ্গালী হিন্দুরা ভাদুড়ীবংশের বৈষয়িক উন্নতি স্বজাতির গৌরব জ্ঞান না করিয়া বরং কলঙ্ক জ্ঞান করিতেন। যদু মল্লযুদ্ধে পটুতা জন্য যদুমল্ল নামে খ্যাত ছিলেন। সেই যদুমল্ল (যদ্‌মাল) শব্দের অপভ্রংশে ফেরেস্তা তাঁহার নাম চেৎমল লিখিয়াছিলেন। গণেশের জীবদ্দশাতেই যদু আজিম শাহের কন্যা আশ্‌মানতারার প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে ধনবান্‌ লোকের পক্ষে উপপত্নী রাখা এবং যবনী গমন দূষ্য ছিল না। আশ্‌মানতারার মাতা গণেশের উপপত্নী ছিলেন। সুতরাং গণেশ যদুকে নিবারণের কোন চেষ্টা করেন নাই। যদু সম্রাট্‌ হওয়ার তিন বৎসর পর আশ্‌মানতারার গর্ভ হইল। তিনি যদুকে কহিলেন "আমি বাদশাহের কন্যা ; আমার সন্তান ঘৃণিত জারজ হইবে, ইহা আমি সহ্য করিতে পারিব না। তুমি যদি আমাকে বিবাহ না কর, তবে আমি আত্মহত্যা করিব।" যদু নানাস্থান হইতে পণ্ডিত আনাইয়া কৌশলে তাঁহা-দিগকে প্রশ্ন করিলেন যে, "যবনীকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া ব্রাহ্মণে তাহাকে বিবাহ করিতে পারে কি না?" পণ্ডিতেরা কহিলেন "যবনীকে হিন্দুয়ানী করা যায়, কিন্তু তাহারা শূদ্রাণী হয়। ব্রাহ্মণের সহ তাহার বিবাহ লোকতঃ ধর্ম্মতঃ অসিদ্ধ। দ্বাপর যুগে গর্গমুনি যবনীগর্ভে কালযবনকে উৎপাদন করিয়া-ছিলেন বটে, কিন্তু বৈধবিবাহ হয় নাই। ক্ষত্রিয় রাজারা ম্লেচ্ছযবনাদি-রাজকন্যা সময়ে সময়ে বিবাহ করিয়াছেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের তাদৃশ বিবাহ কোন শাস্ত্রে বা ব্যবহারে নাই।" যদু সনাতন ধর্ম্মে থাকিয়া আশ্‌মানতারাকে বিবাহ করিবার কোন পন্থা না পাইয়া নিজেই মুসলমান হইলেন এবং জেলালুদ্দীন নাম ধারণ-পূর্ব্বক আশ্‌মানতারাকে বিবাহ করিলেন।

যত্নর মাতা বৃদ্ধা রাণী ত্রিপুরা, যত্নর পত্নী রাণী নবকিশোরী এবং যত্নর শিশুপুত্র অনুপনারায়ণ পাণ্ডুয়াতে ছিলেন। রাণীরা এই দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া দলবল সহ গৌড়ে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের আগমনে যত্ন আশ্‌মানতারা সহ গৌড়ের দুর্গে প্রচ্ছন্ন থাকিলেন। রাণী কিশোরী দুঃখে ও ক্রোধে লজ্জা ত্যাগ করিয়া খড়্গহস্তে উগ্রচণ্ডার ন্যায় আশ্‌মানতারাকে কাটিতে বাহির হইলেন, কিন্তু দুর্গে প্রবেশ করিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিলেন। তখন রাণী ত্রিপুরা সমস্ত সৈন্য, সামন্ত, অমাত্য, ভৃত্য এবং প্রজাগণকে সমবেত করিয়া কহিলেন "শাস্ত্রমতে জাতিপাত অপমৃত্যুর তুল্য। যত্নর জাতিনাশ হওয়াতে সমস্ত স্বত্ব নাশ হইয়াছে। এখন তৎপুত্র এই শিশু অনুপনারায়ণ সাম্রাজের প্রকৃত অধিকারী। আমি তাহাকে বাদশাহী দিব। তোমরা আমার সাহায্য করিতে প্রতিজ্ঞা কর। তোমরা পুরুষানুক্রমে একটাকিয়ার আশ্রিত ও প্রতিপালিত। তোমাদের রক্তমাংস একটাকিয়ার অন্নে গঠিত। তোমরা ভয় এবং লোভ ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি কর। এই শিশুকে উপেক্ষা করিলে তোমাদের ইহকাল পরকাল উভয়ই নষ্ট হইবে।" রাণী কিশোরী এবং অন্যান্য রাজমহিলাগণ অমনি তীব্র করুণ স্বরে রোদন আরম্ভ করিল। এই রোদনধ্বনিতে গৌড়ের রাজভবন প্রতিধ্বনিত হইল।

সভাস্থ সকলেই দুঃখিত হইল, কেহ কেহ অশ্রুমোচন করিল; কিন্তু কেহই সাহস করিয়া তাঁহার সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইতে পারিল না। তাহিরপুরের রাজা জীবনরায় যত্নারারণের মাসতো ভাই এবং দেওয়ান ছিলেন। তিনি কিছু দূরবর্ত্তী সম্পর্কে রাণী কিশোরীরও মামাতো ভাই। তিনি অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বিনীতভাবে কহিলেন "মহারাণী যাহা বলিলেন, তাহাই শাস্ত্রসঙ্গত বটে। কিন্তু দেশ কাল ও পাত্র ভেদে সকল ব্যবস্থাই পরিবর্ত্তিত হয়। বর্ত্তমান অবস্থায় ধর্ম্মভ্রষ্ট রাজাকে বিচ্যুত করিতে গেলে প্রচুর অনিষ্ট হইবে। দেশ মধ্যে মুসলমানেরা অতি প্রবল। আপনকার সৈন্য ও সেনাপতির সারাংশ মুসলমান। মহারাজ মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করায় তাহারা অতিশয় তুষ্ট হইয়াছে। তাহারা অবশ্যই তাঁহার পক্ষ হইবে। মহারাজ নিজে অতি বুদ্ধিমান্ বীরপুরুষ। তাঁহাকে রাজ্যভ্রষ্ট করা আমাদের অসাধ্য। তিনি কেবল লজ্জা প্রযুক্ত পলাইয়া আছেন, তিনি ভীত হন নাই। আপনারা তাঁহার বিরোধী হইলে অনেকের প্রাণ নাশ

অবশিষ্টের ধর্ম্মনাশ হইবে। একটাকিয়ায় জলপিণ্ড লোপ পাইবে। আপনারা এই সংকল্প ত্যাগ করুন। ভাদুড়ীচক্রই একটাকিয়ার প্রকৃত রাজ্য। আপনারা তাহাতে অনুপকে রাজা করুন। তাহাতে বোধ হয় বাদশাঃ কোন আপত্তি করিবেন না। যদি করেন, তবে আমরা তাঁহাকে নিবারণ করিব। আশ্‌মানতারা গৌড়বাদশাহের কন্যা। তাহার সন্তানকে গৌড়ে বাদশাহী করিতে দিন। ইহাতে দশদিক্‌ রক্ষা হইবে এবং সর্ব্বত্র মঙ্গল হইবে।” সভাস্থ সকলে অমনি সাধু সাধু! বলিয়া তাঁহার মতের পোষকতা করিল। রাণীরাও অবশেষে দেওয়ানজীর উপদেশই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য স্থির করিলেন।

রাণীদের সাতগড়া গমন জন্য নৌকা সংগৃহীত হইল। গৌড়ের ছত্র দণ্ড সিংহাসন এবং গৌড় ও পাণ্ডুয়ার রাজপ্রাসাদ হইতে যাবতীয় উৎকৃষ্ট মূল্যবান্‌ দ্রব্য সেই সকল নৌকায় বোঝাই করা হইল। তাহার পর বৃদ্ধা রাণী জীবন রায়কে তোষাখানা খুলিয়া দিতে হুকুম দিলেন। দেওয়ানজী নিজ দায়িত্ব বুঝিয়া যদুর নিকট এত্তেলা দিলেন। যদু কহিলেন “তোষাখানা খুলিয়া দাও, মাতৃদেবীর যাহা ইচ্ছা তাহাই লইয়া যাইতে দাও, তাঁহারা যাহাতে শীঘ্র চলিয়া যান তাহারই চেষ্টা কর।” অনুমতি পাইয়া জীবন রায় সমস্ত ধনাগার খুলিয়া দিলেন। রাণীরা সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি লইয়া সাতগড়া চলিলেন। যদু দূত দ্বারা জননীকে প্রণাম পাঠাইলেন। বৃদ্ধা রাণী সক্রোধে কহিলেন “আমার যদু এখন নাই, সে মরিয়াছে।” তাঁহার ক্রোধ দেখিয়া দূত ভয়ে পলায়ন করিল।

রাণীদের প্রস্থানের পর যদু দুর্গ হইতে বাহির হইয়া রাজকার্য্য আরম্ভ করিলেন। তিনি নামের মোহর পরিবর্ত্তন করিয়া জেলালুদ্দীন শাঃ নামে মোহর করিলেন। তিনি ধর্ম্মোপাসনা বিষয়ে গোঁড়া মুসলমান হইয়াছিলেন। তিনি প্রত্যহ পাঁচ সন্ধ্যা নমাজ পড়িতেন; প্রাতে এবং সন্ধ্যার পর কোরাণ পাঠ করিতেন; রমজান ও মহরমের রোজা অর্থাৎ উপবাস করিতেন এবং যাবতীয় মুসলমান পর্ব্ব যথারীতি নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু আহার ব্যবহারে পূর্ব্ববৎ হিন্দু-পদ্ধতি স্থির রাখিয়াছিলেন। তিনি কখন বিছানায় বসিয়া আহার করিতেন না; ব্রাহ্মণের অখাদ্য কোন দ্রব্য খাইতেন না এবং স্নান না করিয়া ভোজন করিতেন না। তিনি পাণ্ডুয়ায় দেবসেবার ব্যয় পূর্ব্ববৎ রাজকোষ হইতে দিতেন। তিনি গোহত্যা এবং পিতৃকুলে বিবাহ পূর্ব্ববৎ নিষিদ্ধ রাখিয়াছিলেন। প্রকাশ্য

স্থানে কেহ কোন ধর্ম্মের নিন্দা করিলে কঠিন দণ্ড হইত। তাঁহার হিন্দু মুসলমান কর্ম্মচারিগণ সকলেই পূর্ব্ববৎ থাকিল। তাঁহার হিন্দু উপপত্নীগণ বিদায় প্রার্থনা করায় তাহাদিগকে কিছু কিছু অর্থ দিয়া বিদায় করিলেন। সংক্ষেপতঃ একটাকিয়ার রাজারা যেমন সমদর্শী এবং সমতাপ্রিয় ছিলেন, যদু মুসলমান হইয়াও তদ্রূপই থাকিলেন। দিনরাজ ঘোষ নামক একজন উত্তররাঢ়ী কুলীন কায়স্থকে তিনি উত্তর বাঙ্গালার নবাব নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারই সন্তান দিনাজপুরের রাজা।

রাণীরা সাতগড়ায় আসিয়া ভাদুড়িয়া এবং বাজুচতুষ্টয় অধিকার করিলেন। তাহার পর ছিন্দাবাজু প্রভৃতি আর তিনটি পরগণা অতিরিক্ত দখল করিলেন। একটাকিয়ার রাজারা গৌড়বাদশাকে যেরূপ নর্ম্মা (নজরানা) ও রাজস্ব দিতেন, রাণী ত্রিপুরা তাহা বন্ধ করিয়া অনুপের অভিভাবিকারূপে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। অনুপ যদুর কুশনির্ম্মিত মূর্ত্তি দাহ করিলেন। জাতিভ্রষ্টের শ্রাদ্ধ হয় না, এ জন্য তিনি মস্তক মুণ্ডন ও স্বর্ণ উৎসর্গ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। এই অবধি রাণী নবকিশোরী বৈধব্য আচরণ করিতেন। জেলালুদ্দীন সমস্ত সংবাদ পাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কোন আপত্তি করিলেন না।

ইহার পর পঞ্চম বৎসরে অনুপের ষোল বৎসর বয়স পূর্ণ হইল। রাণী ত্রিপুরা গৌড় হইতে প্রচুর ধনরাশি আনিয়াছিলেন, তিনি সেই অর্থবলে মহাধূমধামে অনুপের বিবাহের এবং রাজ্যাভিষেকের আয়োজন করিলেন। তিনি যদুকে কোন কথা কিছুই জানান নাই। কেবল রাণী কিশোরী, বাদশাকে এইরূপ ব্যঙ্গ করিয়া নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইয়াছিলেন। যথা—

প্রবল প্রতাপান্বিত শ্রীল শ্রীযুক্ত জেলালুদ্দীন শাঃ বাহাদুর রাজোন্নতিষু— লম্বা সেলাম পূর্ব্বক নিবেদনঞ্চ বিশেষ—

মৃত মহারাজ যদুনারায়ণ শর্ম্ম খাঁ সাহেবের পুত্র শ্রীমান্ অনুপনারায়ণ শর্ম্ম খাঁ সাহেবের শুভ বিবাহ ও ভাদুড়ীরাজ্যে অভিষেক হইবে। পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম। হুজুর আলি বেগম সাহেবা সহ আগমন পূর্ব্বক শ্রীমানের কল্যাণ প্রার্থনা করিবেন এবং সময়োচিত সভাসৌষ্ঠব করিবেন। ইতি—

আজ্ঞাধীনা—
শ্রীনবকিশোরী দেব্যাঃ।

বাদশাঃ সেই পত্র পাইয়া চিন্তা করিলেন "যদুনারায়ণ প্রকৃতই এখন মৃত। যদুর মাতা, স্ত্রী, পুত্র, জ্ঞাতি, কুটুম্ব সকলই আছে। কিন্তু এখন আমার সহ তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই। যদুর মাতা সর্ব্বদা যদুর দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করিতেন, যদুর ব্যারাম হইলে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতেন এবং যদুকে দেখিলে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না। সেই মা এখন আমাকে দেখিতে চান না, আমার নাম শুনিতে পারেন না, সর্ব্বদা আমাকে শাপ দেন। যে সকল লোক যদুর পাদোদক এবং উচ্ছিষ্ট সেবন করিয়া পুণ্য জ্ঞান করিত, এখন আমি স্পর্শ করিলে তাহাদের অন্নজল অপবিত্র হয়। তবে আমি কি সেই যদুনারায়ণ দেবশর্ম্মা আছি? ভদ্রং ন কৃতং—আমি ভাল কাজ করি নাই। যে কোন ব্যক্তি যখন ইচ্ছা তখনই মুসলমান হইতে পারে, কিন্তু নূতন কেহ সহস্র তপস্যা করিয়াও যদুর ন্যায় কুলীন ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। এখন পুনরায় ব্রাহ্মণ হইতে পারিব না। আত্মগ্লানি প্রকাশ করিলে মুসলমানেরাও তুচ্ছ জ্ঞান করিবে। অতএব মনের ভাব গোপন রাখাই উচিত। এখন রাণীর পত্রের কি উত্তর দেই?"

তিনি অনেক চিন্তা করিয়া রাণী কিশোরীকে কি পাঠ লিখিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। এজন্য নিজ পক্ষ হইতে কোন উত্তর না দিয়া বেগমের পক্ষ হইতে লিখিলেন যে—

প্রবল প্রতাপান্বিতা শ্রীল শ্রীযুক্তা মহারাণী নবকিশোরী দেবী বাহাদুরা

রাজোন্নতিষু—

প্রণামা নিবেদনঞ্চ বিশেষ—

শ্রীযুত বাদশাহের নামিক আপনকার প্রেরিত পত্রে শ্রীমান্ অনুপনারায়ণ বাবাজীর শুভ বিবাহ ও রাজ্যাভিষেক সংবাদ প্রাপ্তে শ্রীযুত বাদশাঃ নামদার এবং আমরা সকলেই পরম সন্তোষ লাভ করিলাম। স্বর্গীয় মহারাজ গণেশ-নারায়ণ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত পাণ্ডুয়ার দেবালয়ে এবং গৌড়ের মস্‌জীদে শ্রীমানের কল্যাণার্থ পূজা ও উপাসনার আদেশ করা হইল। নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ শ্রীযুত রাজা জীবন রায় দেওয়ানজীকে অভিষেকসামগ্রী সহ পাঠাইলাম। লজ্জাপ্রযুক্ত আমি ও বাদশাঃ নিজে যাইতে পারিলাম না। অপরাধ ক্ষমা করিবেন ইতি—

আজ্ঞাধীনা শ্রীআশমানতারা বেগম।

রাণী কিশোরী লেখা পড়া জানিতেন। তিনি যত্নর হস্তাক্ষর দেখিয়া চিনিতে পারিলেন। যত্নর প্রেরিত ঠাণ্ডা চিঠি এবং অভিষেকসামগ্রী পাইয়া স্বামীর পূর্ব্বপ্রেম রাণীর মনে নবভাবে উদ্দীপিত হইল। পুরাতন শোক আবার নূতন হইল। তিনি কান্দিতে কান্দিতে কহিলেন "আমি রাজার কন্যা, মহারাজার রাণী। পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কখন কোন রকম দুঃখ কষ্ট পাই নাই। চব্বিশ বৎসর স্বামীর কাছে ছিলাম, সে কখন কোন অপ্রিয় কার্য্য করে নাই কিংবা কখন একটি কটু কথাও বলে নাই—

আহা! প্রেমতরুরূপে ছিল কেন বা নিদয় হলো

এই বলিয়া তিনি মস্তকে করাঘাত করিলেন এবং মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িলেন। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া সমস্ত লোক ব্যস্ত হইল।

পুরন্ধ্রীগণ এবং দাসীরা নানাপ্রকার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। কেহ বাতাস দিল, কেহ মাথায় গোলাপজল দিল, কেহ বুকে পিঠে শতধৌত ঘৃত মালিশ করিল। তাঁহার মূর্চ্ছার সংবাদ মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত রাজবাটীতে ও সমস্ত সহরে প্রচারিত হইল। চারিদিক্ হইতে লোক দৌড়িয়া আসিল। রাণী কিশোরীর সংজ্ঞা হইল, কিন্তু শোক দুঃখের ন্যূনতা হইল না।

হিন্দু রমণীরা প্রথম বয়সে কোন কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিত না, কিন্তু বেশী বয়সে সংসারের সমস্ত কর্ত্তৃত্বই তাহাদের হাতে পড়িত। বিশেষতঃ পুত্রবধূর উপর শ্বশুড়ীর প্রভুত্বের সীমা ছিল না। রাণী ত্রিপুরা বধূর মূর্চ্ছার কারণ শুনিয়া ক্রুদ্ধ হই'লন। আজ অনুপের অভিষেক—শুভদিন জন্য বেশী গালাগালি দিলেন না; কেবল উগ্রভাবে কহিলেন "কি লো বৌ! এত বেলা হলো তুই মঙ্গলচণ্ডীর পূজায় বসিস্ নাই, পুরণো কান্দা কান্দ্‌ছিস। যা গিয়েছে তা হাতের বালাই পায়ের বালাই গিয়েছে, যা আছে তারই মঙ্গল দেখ্। তুই কি এই শুভদিনে সেই অপিণ্ডিয়ার জন্য কেঁদে আমার অনুপের অমঙ্গল ক'র্‌বি?" শাশুড়ীর তর্জ্জনে রাণী কিশোরী ভয়ে ব্যস্ত হইলেন। তাঁহার শোকাবেগ অজ্ঞাতসারে অন্তর্হিত হইল। তিনি উঠিয়া শাশুড়ীকে প্রণাম করিলেন এবং অগোণে গরদের ধুতী ও নামাবলী পরিয়া পূজার জন্য চণ্ডীমণ্ডপে গেলেন।

যত্ন, রাণী ত্রিপুরার একমাত্র সন্তান এবং সমগ্র স্নেহের পাত্র ছিলেন। জাতি-পাত অবধি সমস্ত মাতৃস্নেহ তাঁহার ভাগ্য হইতে বিশ্বলিত হইয়া অনুপের উপর

পড়িয়াছিল। রাণী জানিতেন, শাস্ত্রমতে পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র তিনই সমান। সুতরাং তিনি অনুপকেই একমাত্র সন্তান জ্ঞান করিতেন। গৌড়ের সমস্ত রাজ বৈভব তিনি সাতগড়ায় লইয়া আসিয়াছিলেন এবং যত্নপূর্ব্বক অনুপের জন্য রাখিয়াছিলেন। এখন তাহা দ্বারা তিনি মহানন্দে সাতগড়া সুশোভিত করিলেন। হিন্দু রমণীরা মুসলমানীদের ন্যায় তত বেশী পরদানসিন ছিলেন না। রাণী ত্রিপুরা বৃদ্ধকালে বাহির বাড়ীতে যাইতেন। তিনি রাজগদীতে বসিতেন না বটে, কিন্তু বাহির দর্বারে পৃথক্ আসনে বসিয়া নিজে রাজকার্য্য করিতেন। অদ্য তিনি অনুপ ও তাঁহার পত্নীকে কোলে করিয়া প্রকাশ্য দর্বারে সিংহাসনে বসিলেন। তাহার পর একত্র দুই হাতী বাঁধিয়া তাহার উপর হাওদায় চড়িয়া নব দম্পতি সহ সমস্ত নগরে গস্ত ফিরিলেন। তাঁহার ধনের অভাব ছিল না। সপ্তাহ পর্য্যন্ত অজস্র দান বিতরণ করিলেন। সাতগড়া দ্বীপে যে কেহ আসিল, তাহাকেই অন্ন বস্ত্র দিলেন। পণ্ডিত ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর ধন দান করিলেন। অন্য ব্রাহ্মণদিগকেও যথেষ্ট পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলেন। সমস্ত কয়েদীদিগকে মুক্ত করিয়া পথখরচা দিলেন। কুটুম্বদিগকে মহার্ঘ বস্ত্র অলঙ্কার দিয়া লৌকিকতা করিলেন। ভৃত্যদিগকে প্রচুর ইনাম দিলেন। সমস্ত প্রজার এক বৎসরের খাজনা মাফ দিলেন। জেলালুদ্দীনের প্রেরিত লোকদিগকেও প্রচুর পুরস্কার দিলেন। তন্মধ্যে একজন মুসলমান কর্ম্মচারী রাণীর মন বুঝিবার জন্য কহিল "রাণী মা! আপনার পুত্রের—"। বৃদ্ধা রাণী অমনি কহিলেন "আমার পুত্র, পৌত্র, সর্ব্বস্ব এই অনুপ; পৃথিবীতে আমার আর কেহ নাই।" বলিতে বলিতে চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া গেল। রাজা জীবন রায় সক্রোধে ভ্রূভঙ্গি করিবামাত্র অমনি সেই মুসলমানটি দূরে সরিয়া গেল।

রাণী কিশোরী নিজের শাড়ী এবং অলঙ্কারগুলি একটি ঝালি (পেটরা) ভরিয়া জীবন রায়ের সহ আশ্‌মানতারাকে উপঢৌকন পাঠাইলেন। তিনি বৈধব্য বেশ ধারণকালে ভগ্ন শাঁখা খাড়ুর টুকরাগুলি একটি কৌটায় রাখিয়াছিলেন, এখন সেই কোটাটি বাদশাকে উপহার পাঠাইলেন।

বেগমকে রাণী কিশোরী এইরূপ চিঠি লিখিলেন যে—

সকল-মঙ্গলালয়া শ্রীশ্রীমতী আশমানতারা বেগম বাহাদুরা

রাজোন্নতিষু—

আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক নিবেদনঞ্চ বিশেষ—

দেওয়ানজী সাহেব সহ তোমার প্রেরিত দ্রব্যজাত যথাসময়ে পাইয়া সন্তোষ লাভ করিলাম। তোমাদের আশীর্ব্বাদে শ্রীমানের অভিষেক নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। আমি বিধবা, আমার শাড়ী ও অলঙ্কার অব্যবহার্য্য। অনুপের বধূকে রাণী-মা সমস্তই নূতন তৈয়ারী করিয়া দিয়াছেন। এজন্য আমার বসন ভূষণ তোমাকে পাঠাইয়া দিলাম। তুমি ভাগ্যবতী তাহা ব্যবহার করিয়া সার্থক করিবা। আমি পাগল হইয়াছি জানিয়া সকল দোষ ক্ষমা করিবা ইতি।

আশীর্ব্বাদিকা

শ্রীনবকিশোরী দেব্যাঃ।

তিনি বাদশাকে যে কৌটা পাঠাইলেন, তন্মধ্যে একটু ভূর্জ্জপত্রে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্লোক লিখিয়া পাঠাইলেন, যথা—

যবনীর তরে যদি স্বামী দেয় জাতি।
কি পাঠ লিখিবে তারে কহ গৌড়পতি॥
মিলন সম্ভব নহে যে পতির সনে।
তার বাড়া শত্রু আর নাহি ত্রিভুবনে॥
সূর্য্যপ্রিয়া সরোজিনী সর্ব্বলোকে কয়।
মিলন সম্ভব নাই অতি দূরে রয়॥
প্রখর তপন তাপে শোষে সরোজল।
জল বিনে দিনে দিনে শুখায় কমল॥
তেমনি বিরহ-তাপে শোষে প্রেমনীর।
দেহ মন শুষ্ক, প্রাণ যায় রমণীর॥
ধর্ম্মার্থে রমণীগণ পতিব্রতা হয়।
ধর্ম্মার্থে কিশোরী পতি ছেড়ে দূরে রয়॥
জীবিত থাকিতে পতি, বিধবা কিশোরী।
হেন অভাগিনী কেবা আছে মরি মরি॥

জেলালুদ্দীন দেওয়ানজীর নিকট অনুপের ধূমধামে অভিষেক এবং তাহাতে বৃদ্ধা রাণীর উৎসাহ শুনিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "রাণী-মা গৌড়ের

সিংহাসন অনুপকে দিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহা দিয়াছেন। আমি সাহায্য ভিন্ন তাঁর কোন কার্য্যেই বাধা দেই নাই। তবে তাঁর আক্ষেপ কি?" তাহার পর তিনি রাণী কিশোরীর প্রেরিত উপহার পাইয়া নীরবে আত্মগ্লানি ভোগ করিতে লাগিলেন।

অতঃপর রাণী কিশোরী ক্রমেই কঠোরতর ব্রত আরম্ভ করিলেন। তিনি মাসে মাসে প্রায় আঠার দিন উপবাস করিতেন। তাঁহার শরীর ক্রমশঃ শুষ্ক ও দুর্ব্বল হইল। চতুর্থ বৎসরে তাঁহার গঙ্গা-প্রাপ্তি হইল। জেলালুদ্দীন সমস্ত অবস্থার তদন্ত রাখিতেন। সাধ্বী সুশীলা কিশোরীর অকালমৃত্যুর তিনি নিজেই একমাত্র কারণ ইহা জানিয়া বাদশাঃ একান্তে বসিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতে-ছিলেন, এমন সময়ে আশমানতারা উপস্থিত হইয়া তাঁহার রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বাদশাঃ দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, "সুশীলা রাণী কিশোরী কঠোর ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিয়া অকালে ইহলোক ত্যাগ করিলেন। আমি তোমার খাতিরে তাঁহার সহ সদ্ব্যবহার করিতে পারি নাই। ইহাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ।" বেগম কহিলেন, "আমি কখন তোমার কাছে রাণী কিশোরীর কোন নিন্দা করি নাই কিংবা তৎপ্রতি কোন বিদ্বেষ প্রকাশ করি নাই। তুমি তদ্রূপ সুন্দরী সুশীলা পত্নী অকারণে ত্যাগ করিয়া অন্যায় করিয়াছ। আমার সন্দেহ হয় পাছে অন্যের খাতিরে আমার প্রতিও এইরূপ নিষ্ঠুর হইতে পার।" বাদশাঃ কহিলেন—"যার জন্য করি চুরি সেই বলে চোর—তোমারই অনুরোধে মুসলমান হইলাম, তজ্জন্য অন্য স্ত্রী, পুত্র, মাতা, জ্ঞাতি, কুটুম্ব সহ বিচ্ছেদ হইল। তুমি তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিতে বল নাই, আমিও ত্যাগ করি নাই। বিধর্ম্মাশ্রিত দেখিয়া আমাকে তাঁহারাই ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।" বেগম কহিলেন, "তবে আমার দোষ কি?" বাদশাঃ কহিলেন, "আমি তোমার দোষ দিই না কিংবা অন্য কাহারও দোষ দিই না, সকলই আমার নিজের দোষ। তুমি যে রাণী কিশোরীর গুণরাশি স্বীকার করিলে, আমি তজ্জন্য প্রশংসা করি; কেননা তোমার নিজের গুণ না থাকিলে কদাচ সপত্নীর গুণ স্বীকার করিতে পারিতে না। তিনি এখন স্বর্গে গিয়াছেন, তাঁহার কোন উপকার বা অপকার করা আমাদের সাধ্য নাই। তাঁহার পুত্র অনুপকে তুমি কদাচ হিংসা করিও না।" বেগম কহিলেন, "আমি অনুপকে জ্যেষ্ঠপুত্র জ্ঞান করি এবং চিরজীবন তাহাই জ্ঞান করিব।"

জেলালুদ্দীন দেখিলেন যে, অনুপ সাম্রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী, কিন্তু সে নির্ব্বিবাদে দখল পাইবে না. এবং বিবাদ করিলেও কৃতকার্য্য হইবে না। ভাবী গোলযোগ নিবারণ জন্য তিনি আশমানতারার জ্যেষ্ঠ পুত্র আঃমেদশাকে নিজ জীবমানে সাম্রাজ্য দিলেন। কিন্তু তাঁহাকে এবং যাবতীয় প্রধান সেনাপতি ও কর্ম্মচারীদিগকে প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে, তাহারা অনুপকে তাহার দখলী আট পরগণা হইতে বঞ্চিত না করে। আঃমেদ দুই বৎসর রাজ্য করার পর জেলালুদ্দীনের মৃত্যু হইল।

পঞ্চম অধ্যায়।

জেলালুদ্দীনের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া অনুপ নিজ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পণ্ডিতগণকে প্রশ্ন করিলেন। কোন পণ্ডিতই কোন সদুত্তর দিতে পারিলেন না। সেই সময়ে বিদ্যাভূষণ উপাধিধারী বিক্রমপুরনিবাসী একটি পণ্ডিত তাঁহাকে গয়াতে পিণ্ডদান করিতে পাতি দিলেন *। সেই ব্যবস্থাই অনুপের মনোমত হইল। তদবধি অনুপ বিদ্যাভূষণের একান্ত অনুগত হইলেন। বিদ্যাভূষণ যাহা বলিতেন, অনুপ তাহাই করিতেন। তিনি অগোণে বিদ্যাভূষণকে লইয়া গয়াযাত্রা করিলেন। গয়ালীরা আপত্তি উত্থাপন করিল। গয়ালীরা কেবল তীর্থগুরু ব্রাহ্মণ বলিয়া মান্য। তাহাদের বিদ্যাসাধ্য বিশেষ কিছু ছিল না। তাহারা বিদ্যাভূষণের সম্মুখে তর্ক করিতে অপারগ হইয়া "মুসলমানের পিণ্ড দিব না" বলিয়া জিদ করিল। বিদ্যাভূষণ কহিলেন, মুসলমানের শ্রাদ্ধ রাজা করিবেন না এবং আপনারাও করাইবেন না। যে দিন তাঁহার জাতি গিয়াছে, সেই দিন হইতে আমরা তাঁহাকে মৃত জ্ঞান করি; কিন্তু তৎপূর্ব্ববর্ত্তী যদুনারায়ণ শর্ম্মার শ্রাদ্ধ অবশ্য করাইবেন। গয়ালীরা তাহাতে সম্মত হইলে, অনুপ বহুব্যয়ে যদুনারায়ণের পিণ্ডদান করিলেন। এদিকে পাটনার অপর পারে হাজীপুরে আঃমেদ শাঃ এক মসজিদ, অতিথিশালা ও পুষ্করিণী জেলালুদ্দীনের নামে উৎসর্গ করিলেন। এইরূপে যদুর দুই পুত্র দুই ধর্ম্মানুসারে তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া করিয়াছিলেন।

অনুপ গয়া হইতে ফিরিয়া পাটনাতে নৌকায় উঠিলেন। ঠিক সেই সময়ে আঃমেদ শাঃ হাজীপুর হইতে আসিয়া তাঁহার সহ সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি যাবনিক রীতি অনুসারে সেলাম না করিয়া হিন্দুর ন্যায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রণাম করিলেন এবং সাম্রাজ্য গ্রহণ জন্য অনুরোধ করিলেন। অনুপ কহিলেন, "গরুর জন্য রাখাল, রাখালের জন্য গরু নহে। রাজ্য নিজ সুখের জন্য নহে, বরং প্রজার

---

* এই পণ্ডিতের নাম আমি জানিতে পারি নাই, তিনি বিদ্যাভূষণ উপাধি দ্বারাই প্রসিদ্ধ।

সুখের জন্য রাজপদ সৃষ্ট হইয়াছে। পিতা তোমাকে সাম্রাজ্য দিয়াছেন, তুমি তাহা ভোগ করিয়া পিত্রাজ্ঞা পালন কর, প্রজার হিত সাধন করিয়া যশস্বী হও, আমি তাহাতে তুষ্ট আছি। আমি এই গঙ্গার মধ্যে বসিয়া, সাম্রাজ্যে আমার যে কিছু দাবী আছে, তাহা তোমাকে দান করিলাম। তুমি নিঃসন্দেহ হইয়া রাজত্ব ভোগ কর।”

অনুপের বার্ষিক মুনাফা প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা ছিল। আঃমেদ আর কিছু ভূমি তাঁহাকে দিয়া মুনাফা ছয় লক্ষ টাকা সম্পূর্ণ করিয়া দিলেন এবং তাঁহার স্বাধীনতা স্বীকার করিলেন। তাঁহাদের সদ্ভাব দেখিয়া মুসলমানেরা চমৎকৃত হইল।

আঃমেদ শাঃ সাত বৎসর রাজত্ব ভোগ করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে সাসারামের জাগীরদার শের শাঃ প্রবল হইয়া গৌড় আক্রমণ করিল। আঃমেদ যুদ্ধে হত হইলেন। ভাদুড়ীবংশের বাদশাহী বায়ান্ন বৎসরে শেষ হইল। তাহার পর শের শাঃ ভাতুড়িয়া আক্রমণ করিলেন। অনুপ যুদ্ধ না করিয়া তাঁহার শরণাগত হইলেন। শের শাঃ তাঁহাকে ভাতুড়িয়া এবং সাবেক বাজুচতুষ্টয়ের জন্য পূর্ব্ব নিয়মে নর্মা এবং মালগুজারী দিতে এবং সমস্ত অতিরিক্ত পরগণা ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। অনুপ তাহাতে সম্মত হইলেন। শের মোগল সম্রাট্ হুমায়নের সহ যুদ্ধে অনুপের সাহায্য চাহিলেন। অনুপ নিজ জ্যেষ্ঠপুত্র মুকুন্দনারায়ণের অধীনে পাঁচ হাজার সৈন্য এবং নগদ পাঁচ লক্ষ টাকা দিলেন। ইহাতে শের শাঃ সন্তুষ্ট হইয়া অনুপকে একটাকিয়া রাজা স্বীকার করিয়া সনন্দ দিলেন। এই সনন্দ এখনও বিদ্যমান আছে।

আঃমেদের পতনের পর আশমানতারা অগত্যা অনুপের আশ্রয় লইলেন। বৃদ্ধা রাণী ত্রিপুরা তখনও জীবিতা ছিলেন। বেগম তাঁহাকে অত্যন্ত ভয় করিলেন, অনুপ বেগমকে অতি সম্মান পূর্ব্বক নিজ বাড়ীতে উঠাইলেন। রাজবাড়ীর এক সম্পূর্ণ প্রকোষ্ঠ তাঁহার বাসের জন্য ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার নিজ ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য মাসিক ৩০০৲ টাকা বৃত্তি দিলেন। তাঁহার আনুযাত্রিক লোকগণকে নিজ চাকরীতে বহাল করিলেন। অনুপ তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিতেন এবং প্রত্যহ তাঁহার সহ সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত কর্ত্তব্য কার্য্যে পরামর্শ করিতেন।

বেগম অপমানভয়ে রাণী ত্রিপুরার সহ সাক্ষাৎ করেন নাই। বৃদ্ধা রাণী তাহা জানিতে পারিয়া নিজেই আসিয়া বেগমের প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন। বেগম কাঁপিতে কাঁপিতে গিয়া তাঁহার পদানত হইলেন। বৃদ্ধা রাণী তাঁহার প্রতি কোন কটু ব্যবহার করিলেন না; বরং তাঁহার বংশলোপে ভাতুড়ী বংশের বাদশাহী লোপ হইল বলিয়া শোকপ্রকাশ করিলেন। বেগমকে নানারূপ প্রবোধ দিলেন। তিনি বেগমকে কহিলেন, "যাহা গিয়াছে, তাহার চিন্তায় কোন ফল নাই। এখন অনুপকেই পুত্র জ্ঞান কর এবং তাহার সন্তানদিগকে পৌত্র জ্ঞান কর। সকলের সহ দেখাসাক্ষাৎ আলাপ আপ্যায়ন কর। তাহাতেই মনের শান্তি হইবে। যতই নির্জ্জনে থাকিবে, ততই শোক ও দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হইবে। আমার সহ মধ্যে মধ্যে দেখা করিস্ এবং যে কোন দ্রব্য প্রয়োজন হয় আমাকে বলিস্। মেয়েলোকের পক্ষে শ্বশুরী মায়ের উপরে। মায়ের কাছে থাকা দশ বৎসর, শাশুড়ীর কাছে চল্লিশ বৎসর। আমার কাছে চাহিতে লজ্জা নাই। তোর যখন যা লাগে আমি দিব।" শাশুড়ীর দয়া দেখিয়া বেগমের ভয় ভাঙ্গিল। বেগম নানারূপ স্তুতি মিনতি করিলেন। ইহার পর বৃদ্ধা রাণী এক বৎসর জীবিতা ছিলেন। বেগম প্রত্যহ তাঁহার সহ সাক্ষাৎ করিতেন। হিন্দুর মধ্যে থাকিয়া বেগম ক্রমে হরিভক্ত হইয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণী বিধবার ন্যায় নিরামিষ একাহার করিতেন, একবস্ত্রে থাকিতেন এবং তুলসীতলায় বসিয়া হরিনাম জপ করিতেন। তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যার পর ঠাকুরবাড়ীতে আরতি দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতেন। তিনি অনেক দিন জীবিতা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে গঙ্গার কাঁচি চড়ামধ্যে তাঁহার গোর দেওয়া হইয়াছিল।

এদিকে কুমার মুকুন্দনারায়ণ খাঁ শেরশাহের আদিষ্ট কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। শেরশাঃ দিল্লীর সম্রাট্ হইলে, মুকুন্দ বিদায় প্রার্থনা করিলেন। শের দেখিলেন বাহুবল ভিন্ন দিল্লী সাম্রাজ্যে তাঁহার অন্য কোন দাবী নাই; হুমায়ুন তখনও ভারতবর্ষেই আছেন; সহজেই আবার প্রবল হইয়া উঠিতে পারেন। মুকুন্দ বুদ্ধিমান্ বীরপুরুষ এবং গৌড়বাদশাহের বংশজাত। এ সময় তাহাকে ছাড়িয়া দিলে সে দেশে গিয়া বাঙ্গালাদেশ পুনরায় দখল করিতে চেষ্টা করিতে পারে। এজন্য তিনি মুকুন্দকে বিদায় দিলেন না। কিন্তু প্রকৃত অভিপ্রায় গোপন

করিয়া কহিলেন, "খাঁ সাহেব! আমি তোমাকে যতদূর বিশ্বাস করি, অন্য কাহাকেও ততদূর বিশ্বাস করিতে পারি না। তুমি আমার দক্ষিণ হস্ত। আমার সাম্রাজ্য এখনও নির্ব্বিঘ্ন হয় নাই। হুমায়ুন এখনও ভারতবর্ষেই ঘুরিতেছে। এ সময় তোমার মত সহায় আমার নিতান্তই আবশ্যক। তোমার বাড়ী অতি দূরবর্ত্তী। তুমি একবার বাড়ী গেলে পুনরায় আমার সাহায্য জন্য আসা সহজ ব্যাপার নহে। এজন্য আমার অনুরোধ যে, তুমি আর কিছুদিন থাকিয়া আমার উপকার কর। তাহার পর ধনে মানে সম্পন্ন হইয়া দেশে যাইও।" শের এইরূপ কপট স্নেহ প্রকাশ করিয়া মুকুন্দকে আরও পাঁচ বৎসর আটক রাখিয়াছিলেন।

শের শাঃ যোধপুরের রাজার সহ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহাতে মুকুন্দ ক্ষতবিক্ষত হইয়া বহুকষ্টে শের শাহের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। শের অতি যত্নপূর্ব্বক মুকুন্দের সুচিকিৎসা করাইলেন। মুকুন্দ আরাম হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার দক্ষিণ পদখানি প্রায় অবশ হইয়া গেল। তখন শের শাঃ বিবেচনা করিলেন "এখন হুমায়ুন দেশত্যাগী হইয়াছে। আমার রাজ্য নিরুপদ্রব হইয়াছে এবং মুকুন্দ অকর্ম্মণ্য হইয়াছে। সুতরাং এখন মুকুন্দকে ছাড়িয়া দিতে কোন ভয় নাই।" তিনি মুকুন্দকে প্রচুর ধন ও সম্ভ্রান্ত খেলাত দিলেন। তিনি অনুপের নিকট হইতে যে সকল পরগণা খাস করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা পুনরায় মুকুন্দকে জমিদারী স্বত্বে বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া নৌকাপথে মুকুন্দকে দেশে পাঠাইয়া দিলেন। মুকুন্দ দেশে আসিয়া কেবল চারি বৎসর জীবিত ছিলেন। তিনি একটি শিশুপুত্র রাখিয়া পিতৃবর্ত্তমানেই গতাসু হইলেন।

অনুপ বিদ্যাভূষণের একান্ত বাধ্য ছিলেন, এবং তাঁহার পরামর্শে ব্রহ্মচারীর মত চলিতেন। বিদ্যাভূষণ অতি সুপণ্ডিত ও পরিনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন বটে, কিন্তু অতিশয় কটুভাষী এবং মুসলমান-বিদ্বেষী ছিলেন। অনুপ তাঁহাকে ঠাকুর-বাড়ীতে বাসা দিয়াছিলেন। সেখানে মুষলমানের গতিবিধি ছিল না, সুতরাং সেখানে তাঁহার যবনবিদ্বেষ তত প্রকাশ পাইত না। পাঠানেরা একটাকিয়া-দিগের বরাবর প্রধান সহায় ছিল। ভাদুড়ীরাজ্যে তাহাদের কর্ত্তৃত্ব প্রচুর ছিল। রাজারা পাঠান সর্দ্দারদিগকে নাম ধরিয়া ডাকিতেন না কিংবা চাকর বলিয়া জ্ঞান করিতেন না। একটাকিয়ারা পাঠানদিগকে নিজ জাতি কুটুম্বসদৃশ

ব্যবহার করিতেন এবং কাহাকে দাদা, কাহাকে খুড়া, কাহাকে মামা বলিয়া ডাকিতেন এবং অতি সদ্ভাবে বশীভূত রাখিতেন। বিদ্যাভূষণ পল্লীগ্রামবাসী ব্রাহ্মণ। তিনি পাঠানদের দুর্দ্দান্ত স্বভাব অবগত ছিলেন না। তিনি একদিন প্রকাশ্য সভায় বলিয়া উঠিলেন "নাধমো যবনাৎ পরঃ" (যবন জাতি হইতে অধম কেহই নাই)। সেই কথা শুনিয়া উপস্থিত পাঠানেরা অমনি তরবারি খুলিয়া বসিল। অনুপ বহুকষ্টে বিদ্যাভূষণকে ঠাকুরবাড়ী পৌছাইলেন এবং বাহির হইতে নিষেধ করিলেন। ব্রাহ্মণের ক্রোধ অস্থায়ী, কিন্তু পাঠানের ক্রোধ চিরস্থায়ী। এই ঘটনার সাত মাস পর বিদ্যাভূষণ বিলে স্নান করিতে আরম্ভ করিলেন। পাঠানেরা সুযোগ পাইয়া একদিন তাঁহাকে হত্যা করিল। অনুপ সংবাদ পাইয়া মনস্তাপে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলেন। হত্যাকারীর সন্ধান পাওয়া গেল না। হিন্দুরাজ্যে ব্রহ্মহত্যা হইল বলিয়া অনুপ প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। কিন্তু তাঁহার মনোমালিন্য গেল না। সেই মনস্তাপেই তৃতীয় দিবসে তাঁহার মৃত্যু হইল।

অনুপ একান্ত সোহাগের ছেলে ছিলেন। বাল্যকালে পিতামহীর আদরে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তাহার পর বিদ্যাভূষণের পরামর্শে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিতেন। তাঁহার শরীর অতি সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ ছিল। কিন্তু তাঁহার সাহস বা তেজস্বিতা ছিল না। অনুপ মেধাবী ছিলেন, কিন্তু কষ্টস্বীকার না করায় অধিক বিদ্যা হয় নাই। বাঙ্গালা ও পারসীতে তিনি সাধারণ লেখাপড়া ও কথাবার্ত্তা চালাইতে পারিতেন। পরে বিদ্যাভূষণের কাছে অসংখ্য সংস্কৃত শ্লোক শুনিয়া মুখস্থ করিয়াছিলেন। অস্ত্রশস্ত্র চালনা কিছু কিছু শিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার পটুতা জন্মে নাই। ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার দৃঢ় ভক্তি ছিল। তিনি সুদীর্ঘ জীবনে কদাচ একটি মিথ্যা কথা বলেন নাই কিংবা কাহারও কোন অনিষ্ট করেন নাই। তিনি দীর্ঘসূত্রী ছিলেন, কোন কাজ শীঘ্র করিতে পারিতেন না। অথচ আলস্যমাত্র তাঁহার ছিল না। তিনি অতি অল্পকাল নিদ্রা যাইতেন এবং এক মুহূর্ত্তও নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকিতেন না; এজন্য তাঁহার ধীরতা হেতু কোন কর্ত্তব্য কার্য্য অকৃত থাকিত না। তিনি বাল্যকালে বিলাসী ছিলেন, যৌবনে বিদ্যাভূষণের পরামর্শে তাহা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার কখন কোন ব্যারাম হয় নাই। তিনি কখন কোন কষ্টে বা বিপদে

পড়েন নাই। তিনি অতি শান্ত ও দয়ালু ছিলেন। কাহারও কোন দুঃখের সংবাদ পাইলেই তিনি তাহা মোচন জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। তিনি জিতেন্দ্রিয় ছিলেন এবং একমাত্র বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন উপপত্নী ছিল না। তিনি কাহাকেও নিন্দা করিতেন না কিংবা কটুবাক্য বলিতেন না। তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লইয়া শাস্ত্রালোচনা করিতে ভাল বাসিতেন এবং পণ্ডিতদিগকে প্রচুর দান করিতেন। কৃষকদের প্রতি তাঁহার প্রচুর অনুগ্রহ ছিল। সেই সময়ে যুদ্ধবীরদিগের সর্ব্বত্র সম্মান ও সমাদর ছিল। কিন্তু অনুপ তাহাদিগকে কিছুমাত্র আদর করিতেন না। শিল্পী ও বণিক্‌দের প্রতিও অনুপের আদর ছিল না। তিনি নর্ত্তক, গায়ক, ভাঁড়, বাজীকরদিগকেও ঘৃণা করিতেন। পণ্ডিতেরা তাঁহাকে "অনুপম নারায়ণ" বলিয়া প্রশংসা করিতেন। সিপাহীরা তাঁহাকে "না-মরদ" অর্থাৎ কাপুরুষ বলিত।

রাজা অনুপনারায়ণের সমকালে বাঙ্গালা দেশে কতকগুলি প্রসিদ্ধ ঘটনা হইয়াছিল, যাহার ফলাফল অদ্যাপি কিয়ৎপরিমাণে বাঙ্গালা দেশে দেখা যায়। হিন্দুসমাজে শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, সৌর ও গাণপত্য এই পাঁচ প্রকার উপাসনা প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে শৈব, সৌর এবং গাণপত্য মতের উপাসক বাঙ্গালা দেশে ছিল না। বৈষ্ণবদিগের সংখ্যাও অতি কম ছিল। প্রায় সমস্ত বাঙ্গালীই শাক্ত মতের উপাসক ছিল। কিন্তু সাময়িক প্রয়োজনানুসারে অনুপের সমকালে নবদ্বীপে বৈষ্ণব মত প্রবল হইয়া উঠিল।

হিন্দুসমাজ অতি বিশৃঙ্খল ও আত্মঘাতী হইয়া উঠিয়াছিল। কথায় কথায় হিন্দুর জাতিপাত হইত এবং সহস্র প্রায়শ্চিত্ত করিলেও আর সেই পতিত ব্যক্তি সমাজে গৃহীত হইত না। মনুষ্য সামাজিক জীব, সমাজ হইতে পৃথক্ হইয়া একাকী থাকিতে পারে না। সুতরাং হিন্দুসমাজ হইতে পরিত্যক্ত লোকেরা মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সেই সমাজে মিলিত হইতে বাধ্য হইত। কর্ম্ম দ্বারা লোকের পাপপুণ্য, এবং অবস্থার উন্নতি বা অবনতি হইতে পারে বটে, কিন্তু জাতি পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। কেননা জন্ম দ্বারাই জাতিত্ব হয়, কর্ম্ম দ্বারা জাতি হয় না। কর্ম্মজ পাপ সমস্তই প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা খণ্ডন হইতে পারে এবং শাস্ত্রে তাহার যথোচিত বিধানও আছে; কিন্তু সেই শাস্ত্রীয় বিধান তৎকালীয়

হিন্দুসমাজে মান্য হইত না। তজ্জন্য বহুলোক মুসলমান হইতে বা দেশান্তরী হইতে বাধ্য হইত। সম্রাট্‌ যদুনারায়ণ নিজেও সেই জন্যই মুসলমান হইয়াছিলেন। হিন্দু সমাজের সেই কষ্ট নিবারণ জন্যই শ্রীচৈতন্য প্রভুর বৈষ্ণব-মত সহজে প্রবল হইয়া উঠিল। বৈষ্ণবমতে তিনবার হরিবোল বলিলেই অতি সহজে সর্ব্বপাপ খণ্ডন হইত, এমন কি যবনাদি বিধর্ম্মীও কয়েকবার হরিবোল বলিয়া পরম সাধু বৈষ্ণব হইতে পারিত এবং অনেক মুসলমান সেই উপায়ে হিন্দু বৈষ্ণব হইয়াছিল, কেহ কেহ বা গোস্বামী গুরু পর্য্যন্তও হইয়াছিল। তন্মধ্যে ব্রহ্ম-হরিদাসই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

নিমাই পণ্ডিত তাৎকালিক বৈষ্ণবদিগের প্রধান গুরু এবং মূর্খদিগের নিকট নারায়ণের অবতার বলিয়া পূজিত। তাঁহার কোন সন্তান হইবার পূর্ব্বেই তিনি অল্পবয়সে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার কোন বংশধর নাই। তিনি সন্ন্যাসী হইলে তাঁহার নাম কৃষ্ণচৈতন্য বা চৈতন্য প্রভু হইয়াছিল। জগাই ও মাধাই তাঁহার প্রিয় শিষ্য ছিল। তাহারাও সন্ন্যাসী হইয়াছিল। তাহাদের বংশ নাই।

নিত্যানন্দ বা নিতাই প্রভু রাঢ়ী ব্রাহ্মণের সন্তান। তিনি বাল্যকালেই সন্ন্যাস-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া পরে সংসারী হইয়াছিলেন। খড়দহের গোস্বামীরাই তাঁহার বংশধর। সন্ন্যাসী হইয়া পরে সংসারী হওয়ায় ইঁহাদের বীরভদ্রী দোষ আছে।

শান্তিপুরের অদ্বৈত গোস্বামী বা অদ্বৈত প্রভু কখন সন্ন্যাসী হন নাই। তিনি সংসারে থাকিয়াই পরম বৈষ্ণব ছিলেন। শান্তিপুর ও উথুলীর গোস্বামীরা সেই অদ্বৈত প্রভুর সন্তান এবং বৈষ্ণবদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরু। ইঁহারা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ।

ঘনশ্যাম আচার্য্য, মাধব আচার্য্যের পুত্র। তিনি অদ্বৈত প্রভুর ভাগিনেয় এবং প্রিয় শিষ্য ছিলেন। অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ একমতাবলম্বী বলিয়া পরস্পরের পরম বন্ধু ছিলেন। অদ্বৈত ঘনশ্যামকে সঙ্গে লইয়া নিত্যানন্দের বাড়ীতে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। নিত্যানন্দের গঙ্গা নাম্নী এক কন্যা ছিল। নিতাই সেই কন্যা ঘনশ্যামের সহ বিবাহ দিতে অদ্বৈতের সম্মতি চাহিলেন। অদ্বৈত কহিলেন, "মাধবাচার্য্যের সম্মতি ব্যতীত এরূপ সম্বন্ধ হইতে পারে না।" তখন নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত উভয়ে গিয়া মাধবাচার্য্যের সম্মতি চাহিলেন। মাধব নিজে বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি প্রভুদ্বয়ের নিকট প্রণত হইয়া কহিলেন, "যদি সামাজিক বাধা

না হয়, তবে আপনাদের আদেশ আমার শিরোধার্য্য।" তখন অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ বহুসংখ্যক রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ও কুলীন কুলজ্ঞদের পাতি ও লিখিত সম্মতি লইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই মত দিয়াছিলেন যে, "রাঢ়ী বারেন্দ্রে বিবাহ হইলে, কোন দোষ হয় না।" তদনুসারে ঘনশ্যামের সহ গঙ্গার প্রকাশ্যরূপে বিবাহ হইয়াছিল। শ্রেণীবিভাগের পর ইহাই বিভিন্নশ্রেণীর শ্রোত্রিয় মধ্যে একমাত্র প্রকাশ্য বিবাহ। প্রয়োজন বশে কোন কোন রাঢ়ী ব্রাহ্মণ আপনাকে বারেন্দ্র বলিয়া পরিচয় দিয়া প্রকৃত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সহ বিবাহে আদান প্রদান করিয়াছে, কোথাও বা কোন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ আপনাকে রাঢ়ী পরিচয় দিয়া রাঢ়ী ব্রাহ্মণ সহ ঐরূপ আদান প্রদান করিয়াছে। তাহার পর প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পাইলে কিছুদিন দলাদলি চলিত; শেষে ক্রমশঃ দলাদলি মিটিয়া যাইত। এইরূপ দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু একপক্ষ রাঢ়ী, অন্যপক্ষ বারেন্দ্র, ইহা স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া গঙ্গার সহ ঘনশ্যামের যেরূপ বিবাহ হইয়াছিল, তাদৃশ বিবাহ আর পূর্ব্বে বা পরে হয় নাই।

অনুপনারায়ণের সমকালে সম্রাট্ শের শাঃ সর্ব্বপ্রথমে চিঠি চলাচল জন্য ভারতবর্ষে ডাকঘর স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই সকল ডাকঘর কেবল সহরে এবং থানায় থানায় ছিল। অশ্বারোহী বাহকগণ এক থানা হইতে চিঠির পুলিন্দা অন্য থানায় পৌছাইত। টিকিট ছিল না, সমস্ত চিঠি ব্যারিং যাইত। চিঠির ওজন অনুসারে মাশুল কম বেশী হইত না। স্থানের দূরত্ব অনুসারে যত থানা দিয়া বাহিত হইত (থানা প্রতি আধআনা) তত আধআনা মাশুল লাগিত। প্রত্যেক থানায় একজন করিয়া ডাক মুনসী এবং একজন বরকন্দাজ থাকিত। বাদশাহী চিঠি, সরকারী কর্ম্মচারীদিগের চিঠি এবং জমিদারদের চিঠিমাত্র বিলি হইত। তাহার মাশুল লাগিত না। জমিদারেরা ডাক খরচা বলিয়া একটি টেক্স দিত। তাহা দ্বারা ডাকঘরের খরচা, মুনসী ও বরকন্দাজের বেতন ও রাস্তা ঘাটের মেরামতী খরচ চলিত। অপর লোকের চিঠি বিলি হইত না। তাহা এক বৎসর পর্য্যন্ত ডাকঘরে থাকিত। লোকে ডাকঘরে তদন্ত করিয়া মাশুল দিয়া চিঠি লইয়া যাইত। এক বৎসর পর্য্যন্ত কেহ চিঠি না লইলে তাহা দগ্ধ করা হইত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

রাজা জগৎনারায়ণ খাঁ। *

মুকুন্দনারায়ণের নাবালক পুত্র জগৎনারায়ণ খাঁ পিতামহের উত্তরাধিকারী হইলেন। তাঁহার জননী সুধামণি তাঁহার শরীররক্ষিকা অভিভাবিকা হইলেন; কিন্তু রাজ্যশাসন বিষয়ে রাণী সুধামণির কোন কর্ত্তৃত্ব ছিল না। অনুপের পাঁচ পুত্র তখন জীবিত ছিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য যথাযোগ্য আয়সা পাইয়াছিলেন। তাঁহারাই রাজ্য শাসন ও সংরক্ষণ করিতেন। নাবালক রাজার মৃত্যুতে তাঁহাদের লাভ ছিল, এই জন্য তাঁহারা নাবালকের শরীররক্ষক হইতে পারেন নাই। এই হেতু সেই ভার রাজার মাতার উপর ছিল। অধিকন্তু দেবর ও ভৃত্যগণের উপরেও রাণী সুধামণির কতক কর্ত্তৃত্ব ছিল। অল্পকাল মধ্যেই রাণী সুধামণি রাজপুরোহিত গুরুদাস চক্রবর্ত্তীর সহ গুপ্তপ্রেমে লিপ্তা হইলেন। তাহাতেই তাঁহার গর্ভসঞ্চার হইল। রাণী সেই ঘটনা গোপন রাখিবার উদ্দেশ্যে বৈরাগ্যের ভাণ করিয়া কাশীবাস করিতে গেলেন। তিনি নাবালক পুত্রের শরীররক্ষার ভার ভাণ্ডারনবিস স্বরূপ-চন্দ্র সরকারের হাতে দিয়া গিয়াছিলেন। তখন রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ ছিল না এবং চিঠি চলাচলের রীতিমত সুবিধা ছিল না। যাতায়াতের পথে দস্যুভয় খুব ছিল। কাশীধামে কে কি করিত, তাহা বাঙ্গালাদেশে কেহ সহজে জানিতে পারিত না। রাণী সুধামণির পরবর্ত্তী বিবরণ সুপরিজ্ঞাত নহে। তিনি কাশীতে

---

* শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র খাঁ বলেন যে, অনুপের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম মুকুন্দনারায়ণ নহে এবং তৎপুত্রের নামও জগৎনারায়ণ খাঁ নহে। তাঁহাদের প্রকৃত নাম মুকুন্দচন্দ্র এবং জগচ্চন্দ্র। কিন্তু মৌলবী ইউসুফ আলি বলেন যে, তাঁহাদের নাম প্রকৃতই মুকুন্দনারায়ণ ও জগৎনারায়ণ। তাঁহার নিকট কয়েকখানা পারসী দলিল আছে, তাহাতে মুকুন্দনারায়ণ ও জগৎনারায়ণ বলিয়া দস্তখত আছে। এই ক্ষুদ্র পার্থক্যে ইতিহাসের কোন দোষ হইবে না, এই বিবেচনায় আমি তদ্বিষয়ে কোন সূক্ষ্ম তদন্ত করা আবশ্যক বোধ করিলাম না।

বহুদিন জীবিতা ছিলেন এবং জগৎনারায়ণের প্রথম বিবাহ উপলক্ষে একবারমাত্র দেশে আসিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে দরিদ্র শূদ্রেরা বহুসন্তান প্রতিপালনে অক্ষম হইলে, ব্রাহ্মণের নিকট অল্পমূল্যে সন্তান বিক্রয় করিত। উপযুক্ত মূল্য লইয়া অন্যান্য লোকের নিকটও সন্তান বিক্রয় করিত। দেবসেবা, বিপ্রসেবা তুল্য গণ্য ছিল। ব্রাহ্মণের দাসত্ব করিলে কাহারও জাতিপাত বা মানহানি হইত না। আধুনিক শিক্ষিত শূদ্রেরা যেমন পিতা মাতা এবং ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা করা অপমান জ্ঞান করে, তখন কেহ তদ্রূপ জ্ঞান করিত না। এজন্য সৎ শূদ্রেরা কম মূল্যে ব্রাহ্মণের নিকট সন্তান বিক্রয় করা শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিত। কখন কখন সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে বিপ্রসেবার জন্ত তাহারা পুত্র কন্যা দিত। যদিও তৎকালীন ব্যবহারে প্রভুরা দাসদিগকে হত্যা করিলেও দণ্ডনীয় হইতেন না, তথাপি ব্রাহ্মণের ক্রীতদাসদের উপর বিশেষ কোন অত্যাচার ছিল না; বরং ধনী বা বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের দাসেরা শীঘ্রই উন্নতিলাভ করিতে পারিত। স্বরূপ সরকারের পিতা হারাণ দাস রাজা অনুপনারায়ণের ক্রীতদাস ছিল। স্বরূপের মাতাও বিনা মূল্যে গৃহীতা দাসী ছিল। তাহারা উভয়েই কায়স্থসন্তান। অনুপের রাণী তাহাদিগের বিবাহ দিয়া নিজ পরিচর্য্যায় রাখিয়াছিলেন। তাহাদের পুত্র স্বরূপ দাস বাঙ্গালা লেখাপড়া শিখিয়া সরকার উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং ভাণ্ডারনবিসী কর্ম্ম পাইয়াছিল। তাহার পর ক্রমেই তাহাদের বংশের অবস্থা উন্নত হইয়াছে।

এখানে ভাণ্ডারনবিস অর্থ ধনাগারের অধ্যক্ষ নহে। দেশের অবস্থা পরিবর্ত্তনে অনেক শব্দের অর্থও পরিবর্ত্তিত হয়। ইংরেজী জজ শব্দের অর্থ বিচারক আর আরবী মুনসেফ শব্দের অর্থ সুবিচারক। সুতরাং মূলার্থে জজ শব্দ অপেক্ষা মুনসেফ শব্দ অধিক সম্ভ্রমাত্মক। কিন্তু ইংরেজের আমলে ইংরেজী শব্দের সম্মান বেশী। সেই জন্ত উচ্চতর বিচারকের উপাধি জজ এবং নিম্নতর বিচারকের উপাধি মুনসেফ। মুসলমান রাজত্বকালে ভাণ্ডারী এবং খাজাঞ্চী শব্দেরও ঐরূপ তারতম্য হইয়াছিল। খাজাঞ্চী অপেক্ষা ভাণ্ডারী শব্দের মূলার্থ উৎকৃষ্ট। কিন্তু কার্য্যতঃ খাজাঞ্চী সমস্ত ধনের কর্ত্তা অতীব সম্ভ্রান্তপদস্থ ছিলেন। আর ভাণ্ডারী সাধারণ পরিচারক অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চপদস্থ সামান্য ভৃত্যমাত্র ছিল। চাউল ডাইল প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য, দা ও কুড়াল খন্তা প্রভৃতি গৃহ-

কর্ম্মের অস্ত্র এবং নিত্য ব্যবহার্য্য বস্ত্র প্রভৃতি অল্প মূল্যের জিনিস ভাণ্ডারীর জিম্মায় থাকিত। সোণা রূপা মণি মুক্তা, শাল বনাত প্রভৃতি বহুমূল্য দ্রব্যের সহ ভাণ্ডারীর কোন সংস্রব ছিল না। ভাণ্ডারী লেখা পড়া জানিলে পারসী ভাষার "নবিস্" শব্দ যোগে তাহার ভাণ্ডারনবিস উপাধি হইত। সেই পারসী শব্দটুক যোগ হওয়ায় সম্মান বৃদ্ধি হইত। ভাণ্ডারী শব্দ হইতে ভাণ্ডারনবিস শব্দ সমধিক সম্মানকর ছিল। রাজার খুড়া রামদেব খাঁ নিজেই খাজাঞ্চী ছিলেন।

নাবালক রাজার অভিভাবক হইবামাত্র স্বরূপের সৌভাগ্য প্রচীয়মান হইল। বহু লোক এখন তাহার অনুগ্রহের জন্য নানারূপ উপসর্পণা করিতে লাগিল। স্বরূপ সকলের সহ ভদ্রতা করিতেন, কিন্তু নিজ কর্ত্তব্য সাধন ভুলিতেন না। কোন ষড়যন্ত্র সহজে না হয় এই অভিপ্রায়ে স্বরূপ নানাদেশীয় নানাজাতীয় মোট আট জন লোক রাজার শরীররক্ষকরূপে নিযুক্ত করিয়া নিজ পুত্র লালা রামচন্দ্র সরকারকে তাহাদের পরিচালক করিলেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে সঙ্গতিপন্ন শূদ্র ও বৈশ্যদিগকে "লালা" বলে। বেহার প্রদেশে কেবল কায়স্থদিগকে "লালা" বলে। যেমন কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ লেখা পড়া জানুক বা না জানুক সকলেরই উপাধি পণ্ডিত এবং বাঙ্গালা দেশের অম্বিষ্ঠ চিকিৎসা-শাস্ত্র কিছুমাত্র না জানিলেও তাহার বৈদ্য উপাধি হয়, সেইরূপ বেহারে লালা শব্দ কায়স্থের জাতিবাচক হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা দেশে কায়স্থের মধ্যে যাহারা পারসী-শিক্ষিত, তাহাদেরই লালা উপাধি হইত। কায়স্থ ভিন্ন অন্য জাতীয় লোক পারসী পড়িলে লালা উপাধি হইত না। এখন বাঙ্গালা দেশে পারসীর চর্চ্চা না থাকায় লালা উপাধি অপ্রচলিত হইয়াছে। লালা উপাধি পূর্ব্বে অতি সম্ভ্রান্ত উপাধি ছিল। তখন বাবু উপাধি ছিল না। লালা রামচন্দ্র সরকার পরীক্ষা না করিয়া কোন বস্তু রাজাকে খাইতে দিতেন না। রাজার জন্য খাদ্য প্রস্তুত হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহার কিয়দংশ পাচককে কিংবা তাহার পুত্রকে খাইতে দিতেন। রাজার জন্য পাণ, রাম লালা নিজ ঘর হইতে তৈয়ার করিয়া আনিতেন। রাজার শয়নঘরে স্বরূপ নিজে কিংবা রাম লালা শয়ন করিতেন। অন্য কাহাকেও থাকিতে দিতেন না। রাম লালা নিজেই রাজাকে বাঙ্গালা ও পারসী শিক্ষা দিতেন। তাঁহারই তত্ত্বাবধানে সিপাহীরা রাজাকে

অশ্ব চালনা এবং অস্ত্র শিক্ষা দিত। পণ্ডিতেরা তাঁহাকে ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। রাজার খুল্লতাতগণ, গুরু, পুরোহিত এবং রাম লালা পরামর্শ করিয়া প্রথমে এক কুলীনকন্যা সহ, পরে দুইটি সিদ্ধ শ্রোত্রিয়ের কন্যা সহ রাজার বিবাহ দিলেন। ষোল বৎসর উত্তীর্ণ হইলে রাজা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তখন যাগ যজ্ঞ করিয়া রাজার অভিষেক-ক্রিয়া সম্পাদিত হইল। রাণী সুধামণি এই সময়ে তপস্বিনী বেশে দেশে আসিয়াছিলেন, পুত্রের বিবাহ ও অভিষেক সমাপ্ত হইলে পুনরায় কাশীবাসে গেলেন। বড় ঘরের কথা কেহ মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না, অথচ কাহারও অজ্ঞাত থাকে না। রাণী সুধামণির কাশীবাসের প্রকৃত কারণ অনেকেই অবগত হইয়াছিল।

রাজা জগৎনারায়ণ সর্ব্বাগ্রে স্বরূপ সরকারের বিশ্বস্ততার পুরস্কার করিলেন। সাতগড়ার দক্ষিণ পাড়ায় দালান, পুষ্করিণী এবং বাগানযুক্ত এক বাড়ী তৈয়ারী করিয়া স্বরূপের বাসের জন্য দিলেন। আর তারাস নামক একখানি গ্রাম কম জমায় মকররী মৌরসী তালুক করিয়া স্বরূপ সরকারকে দিলেন। বৃদ্ধ স্বরূপ কর্ম্ম করিতে অক্ষম, তাহার পুত্র রাম লালাকে জমানবিস কর্ম্ম দিয়া স্বরূপকে অবসর দিলেন। পূর্ব্বে কেবল ব্রাহ্মণেরাই নিষ্কর ভূমি ভোগ করিতে পারিত। তাহার পর মুসলমান পীর মোল্লা প্রভৃতিও নিষ্কর জমি পাইতেছিল। ধর্ম্মব্যবসায়ী লোক ভিন্ন অন্যে নিষ্কর ভূমি ভোগ করিলে নির্ব্বংশ হয় বলিয়া সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাস ছিল। অন্য লোকের উপর রাজার অনুগ্রহ হইলে কম জমায় জমি মকররী করিয়া দেওয়া হইত। সেই জন্য স্বরূপকে তাহাই দেওয়া হইল। এই অবধি বাস্তবিক স্বরূপের দাসত্বমুক্তি হইল। কিন্তু স্বরূপ কিংবা তদ্বংশীয়দিগকে রাজারা কখন স্পষ্টরূপে দাসত্বমুক্ত করেন নাই। আর তাহা-রাও কখন দাসত্ব হইতে অব্যাহতি পাইতে প্রার্থনা করে নাই অথবা তাদৃশ প্রার্থনা প্রয়োজনীয় বোধ করে নাই।

রাজা জগৎনারায়ণের সময়েই প্রসিদ্ধ কালাপাহাড়ের দৌরাত্ম্য হইয়াছিল। আধুনিক কতিপয় নব্য বাঙ্গালী লেখক কালাপাহাড়ের সম্বন্ধে কতকগুলি কাল্পনিক বৃত্তান্ত লিখিয়া পুস্তক রচনা করায় তাঁহার প্রকৃত জীবনচরিত্র অন্ধকারাবৃত হইয়াছে। তজ্জন্য আমি বিস্তারিতরূপে তাঁহার বৃত্তান্ত লিখিলাম।

কালাপাহাড়ের প্রকৃত নাম কালাচাঁদ রায়। বাল্যকালে তাঁহার মাতা

তাঁহাকে "রাজু" বলিয়া ডাকিতেন। তিনি জগদানন্দ রায়ের বংশজাত এক-টাকিয়া ভাদুড়ী। বর্ত্তমান জেলা রাজশাহী, থানা মান্দা,* বীরজাওন গ্রামে তাঁহার বাড়ী ছিল। তাঁহার পিতা নঞানচাঁদ রায় ঐ গ্রাম ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানের ভূঁইয়া ছিলেন এবং গৌড় বাদশাহের অধীনে ফৌজদারী কর্ম্ম করিতেন। তাঁহার রাজা উপাধি না থাকিলেও তিনি বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন। নঞানচাঁদের অল্প বয়সেই মৃত্যু হয়। কালাচাঁদ তখন নিতান্ত শিশু ছিলেন। তিনিই পিতা মাতার একমাত্র সন্তান। তাঁহার মাতামহ তাঁহার অভিভাবক ছিলেন। কালাচাঁদের পিতৃকুল শাক্ত এবং মাতামহ পরম বৈষ্ণব ছিলেন। মাতামহের শিক্ষাগুণে কালাচাঁদ হরিভক্ত হইয়াছিলেন। কালাচাঁদ অতিশয় বুদ্ধিমান্ মেধাবী বলবান্ দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ অতীব সুন্দর পুরুষ ছিলেন। তৎকালীয় একটাকিয়ারা যেরূপ শিক্ষা পাইতেন, কালাচাঁদ তাহা সমস্তই পাইয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালা ও পারসী ভাষায় সুবিজ্ঞ ছিলেন। তিনি সংস্কৃত জানিতেন না বটে, কিন্তু বহুসংখ্যক সংস্কৃত শ্লোক মুখস্থ করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপূজা এবং সাধারণ প্রয়োজনীয় মন্ত্রাদিও তিনি জানিতেন এবং পঞ্জিকা দেখিয়া শুভাশুভ দিন ঠিক করিতে পারিতেন। তিনি শস্ত্রচালনায় এবং অশ্বারোহণেও পটু ছিলেন। তিনি শ্রীপুর গ্রামনিবাসী রাধামোহন লাহিড়ীর দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

বিবাহের দুই বৎসর পর তিনি গৌড় বাদশাঃ সলিমান কেরাণীর নিকট চাকরী প্রার্থনা করিলেন। সম্রাট্ তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, সৌন্দর্য্য এবং আভিজাত্য দেখিয়া তাঁহাকে গৌড় নগরের ফৌজদার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কালাচাঁদ গৌড় নগরে সম্রাটের বাড়ীর নিকটেই বাসা করিলেন। সুন্দরী রমণী হরণ করা মুসলমান বড়মানুষের প্রধান কলঙ্ক ছিল। এজন্য যে গ্রামে বা নগরে মুসলমান রাজপুরুষ বা জমিদার বাস করিত, তথায় কোন হিন্দু ভদ্রলোক পরিবার লইয়া বাস করিত না। যাহারা ব্যবসায় উপলক্ষে উক্ত স্থানে থাকিত, তাহাদের পরিবার দূরে পল্লীগ্রামে থাকিত। চাকরিয়ারা কর্ম্মস্থানে প্রায় সকলেই উপপত্নী রাখিতেন। তখন বেলা চারি দণ্ডের সময় কাচারীতে

---

* থানা মান্দা পূর্ব্বে দিনাজপুর জেলায় সামিল ছিল।

যাইতে হইত এবং ঠিক মধ্যাহ্ন সময়ে কাচারী ভঙ্গ হইত। আমলারা মধ্যাহ্নে বাসায় আসিয়া স্নানাহার করিয়া বিশ্রাম করিত। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আহারান্তে পরিশ্রম করিলে অম্লপিত্ত ব্যারাম হয়। অধুনা ইংরাজ রাজ্যে দেশীয় কর্ম্মচারীদের এই ব্যারাম প্রচুর হইতেছে। পূর্ব্বে ঈদৃশ ব্যাধি কদাচিৎ হইত। কালাচাঁদ প্রত্যহ প্রত্যূষে মহানন্দায় স্নান করিয়া স্তব পাঠ করিতে করিতে বাসায় যাইতেন। তথায় আহ্নিক পূজা ও জলযোগ করিয়া দরবারী পোষাক পরিয়া কাচারী যাইতেন। কাচারী হইতে আসিয়া পুনরায় স্নান করিয়া আহার করিতেন। ধুতীর উপর চাপকান চোগা এবং মাথায় পাগড়ী লাগাইয়া হিন্দুরা কাচারীতে যাইত। মুসলমানেরা ধুতীর স্থলে ইজার পরিত। কালাচাঁদ যে পথে মহানন্দায় যাইতেন, তাহা সম্রাটের বাড়ীর পশ্চাদ্‌ভাগের অতি নিকট-বর্ত্তী ছিল।

বাদশাহের কন্যা দুলারী বিবি অতীব সুন্দরী ছিলেন। তাঁহার বয়স সতর বৎসর হইয়াছিল, কিন্তু সুপাত্র অভাবে তখনও বিবাহ হয় নাই। তিনি একদিন অট্টালিকার ছাদে দাসীগণ সহ বিচরণ করিতেছিলেন, এমন সময় কালাচাঁদ মহানন্দায় স্নান ও তর্পণ করিয়া স্তব পাঠ করিতে করিতে বাসায় যাইতেছিলেন। ছত্রধর তাঁহার মাথায় ছত্র ধরিয়া যাইতেছিল। দুলারী তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। তাদৃশ সুন্দর পুরুষ তিনি আর কখন দেখেন নাই। কুমারী অমনি বিমোহিত চিত্তে সেই সুন্দর যুবককে আত্মসমর্পণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। দাসীগণ কহিল "এই ব্যক্তির কোন পরিচয় না জানিয়া ঈদৃশ প্রতিজ্ঞা করা অনুচিত।" দুলারী কহিলেন "পরিচয় আমি যাহা পাইলাম তাহাই যথেষ্ট, উহার গলায় পৈতা দেখিয়া জানিলাম যে, নীচজাতীয় নহে। উহার ছাতা বরদার এবং হাতে সোনার কোষা দেখিয়া বুঝিলাম যে, সে ধনী লোক। তাহার মন্ত্র পাঠ শুনিয়া আমি বুঝিলাম যে, সে মুর্খলোক নহে। তাহার শরীর দেখিয়াই জানিলাম যে, সে পরম সুন্দর বলবান্ নবযুবক। আর বেশী পরিচয় নিষ্প্রয়োজন।

দাসীগণ সেই বৃত্তান্ত বেগমের নিকট বলিল। বেগম পর দিন প্রত্যূষে ছাদ হইতে কালাচাঁদকে দেখিলেন এবং দাসী পাঠাইয়া কালাচাঁদের জাতি কুল ব্যবসায়াদি সমস্ত পরিচয় লইলেন। তাঁহাকে নিজ কন্যার উপযুক্ত পাত্র বুঝিয়া কন্যার অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য সম্রাট্‌কে অনুরোধ করিলেন। সলিমান

দেখিলেন কালাচাঁদ গৌড় বাদশাঃদিগের মেলবন্ধ কুলীন এবং সর্ব্বাংশেই উপযুক্ত পাত্র ; সুতরাং বেগমের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

পরদিন কালাচাঁদকে আটক করিয়া বাদশাঃ বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। কালাচাঁদ তাহা স্বীকার করিলেন না। সম্রাট্ নানা প্রকার লোভ ও ভয় প্রদর্শন করিয়াও কালাচাঁদকে সম্মত করিতে না পারিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ শূলে দিতে আদেশ দিলেন। জল্লাদেরা কালাচাঁদকে বন্দী করিয়া বধ্যভূমিতে লইয়া চলিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই সংবাদ সমস্ত নগরে প্রচার হইল। দুলারী সেই সংবাদে উন্মত্তার ন্যায় হইয়া খিড়্‌কী দ্বার দিয়া রাজবাড়ী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া কালাচাঁদকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং ঘাতুকদিগকে বলিলেন "আমাকে হত্যা না করিয়া কেহ ইহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।" জল্লাদেরা হতবুদ্ধি হইয়া বাদশাহের নিকট সংবাদ দিল। সলিমান কিংকর্ত্তব্য চিন্তা করিতে করিতে দুলারীর নিকট চলিলেন। এদিকে কালাচাঁদ সেই সম্রাট্‌কুমারীর অদ্ভুত প্রেম, তাঁহার সৌন্দর্য্য ও নবযৌবন দৃষ্টে বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। সম্রাট্ কালাচাঁদকে সম্মত দেখিয়া হৃষ্ট হইলেন এবং সেই দিনই বিবাহ দিলেন। সেই বিবাহ কি প্রণালীতে হইয়াছিল, তাহা জানা যায় না ; কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, কালাচাঁদ তখনও মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই।

এই বিবাহ হেতু কালাচাঁদ সমাজচ্যুত হইলেন। তাঁহার মাতা তাঁহাকে নানারূপ তিরস্কার করিলেন এবং তাঁহার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা লইলেন। তৎকালীন হিন্দু সমাজ যেন আত্মবিনাশের জন্য ব্যাকুল ছিল। তখন অতি সামান্য কার্য্যে বা কথাতেই হিন্দুদের জাতিপাত হইত এবং সহস্র প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও পতিত ব্যক্তি সমাজে উঠিতে পারিত না। তখন সেই ব্যক্তি অগত্যা মুসলমান হইত এবং যথাসাধ্য হিন্দুদের অনিষ্ট করিত। কালাচাঁদের জীবন-বৃত্তান্ত তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। কালাচাঁদ যে অবস্থায় দুলারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাদৃশ অবস্থায় ঐ কার্য্য কোন মতেই দূষ্য নহে। অতি সামান্য প্রায়শ্চিত্ত করিলেই তাঁহাকে সমাজে গ্রহণ করা উচিত ছিল। কিন্তু হিন্দু সমাজ অতি অন্যায়রূপে ধর্ম্মনিষ্ঠ কালাচাঁদকে হিন্দু সমাজ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। কালাচাঁদও তাহার জন্য চূড়ান্ত প্রতিফল দিয়াছিলেন। মাতার উপদেশ

মত কালাচাঁদ প্রায়শ্চিত্ত করিলেন, তথাপি সমাজে একঘরিয়া হইয়া থাকিলেন। অবশেষে তিনি জগন্নাথক্ষেত্রে গিয়া ধন্না দিলেন। সপ্তাহ কাল অনাহারে ধন্না দিয়া থাকিলেন, অথাপি তাঁহার প্রতি ভগবানের কোন প্রত্যাদেশ হইল না, অধিকন্তু পাণ্ডারা তাঁহার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে অপমান করিয়া শ্রীমন্দির হইতে বাহির করিয়া দিল। তখন কালাচাঁদ ক্রোধে অধীর হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন এবং হিন্দু ধর্ম্ম একবারে বিলোপ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। তিনি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাঁহার নাম মহম্মদ ফর্ম্মুলি হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার অত্যাচার হেতু হিন্দুরা তাঁহাকে "কালা পাহাড়" বলিত। সেই নামই সর্ব্বত্র বিখ্যাত; তাঁহার অন্য কোন নামই বিখ্যাত নহে।

কালা পাহাড় উড়িষ্যা হইতে ফিরিয়া আসিয়াই শ্বশুরকে উৎকল বিজয়ের জন্য অনুরোধ করিলেন। সলিমান সাগ্রহে সম্মত হইয়া নিজের সমস্ত সেনা জামাতার অধীনে উড়িষ্যায় পাঠাইলেন। উড়িষ্যা তখন একটি পরাক্রান্ত হিন্দুরাজ্য ছিল। ভাগীরথীতীর হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত এই রাজ্য বিস্তৃত ছিল। গজপতি গঙ্গাবংশীয় মুকুন্দদেব উড়িষ্যার রাজা ছিলেন। মুসলমানেরা বারংবার উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইয়াছিল। কিন্তু কালাপাহাড়ের বিক্রমে মুকুন্দদেব পরাজিত ও নিহত হইলেন। উড়িষ্যা মুসলমানদিগের অধীন এবং বাঙ্গালাদেশের অংশ হইল। কালাপাহাড় জগন্নাথ-বিগ্রহ দগ্ধ করিলেন, বহুসংখ্যক পাণ্ডা ও অপর লোককে ধরিয়া মুসলমান করিলেন। তিনি উড়িষ্যায়, বিশেষতঃ শ্রীক্ষেত্রে যেরূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য।

তিনি উড়িষ্যা হইতে গৌড়ে প্রত্যাগমনকালে রাঢ় দেশেও ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছিলেন। তিনি যাবতীয় দেবমূর্ত্তি চূর্ণ করিয়া বিষ্ঠায় ফেলিতেন। তিনি কতকগুলি শালগ্রাম শিলা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, প্রত্যহ তাহাদের উপর প্রস্রাব করিতেন। গৌড়ের নিকটবর্ত্তী বরেন্দ্রভূমিতে ও মিথিলাতেও তাঁহার ঐরূপ অত্যাচার হইয়াছিল। তিনি লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি যতক্ষণ মুসলমান না হইত, ততক্ষণ তিনি তাহার উপর অকথ্য নিষ্ঠুর ভাবে উৎপীড়ন করিতেন। সেই উৎপীড়নে বহু লোকের জীবন শেষ হইত। এক কালাপাহাড় কর্ত্তৃক হিন্দুদের যত অনিষ্ট হইয়াছে, অন্য সমস্ত মুসলমানের অত্যাচার একত্র করিলেও তত হইবে না।

ইহার পর কালাপাহাড় ভাতুড়িয়া ও সাঁতোড়ে হিন্দু ধর্ম্ম বিনাশার্থ চলিলেন। রাজা জগৎনারায়ণ কালাচাঁদের জননী ও পত্নীদ্বয়কে নিজ বাড়ীতে আনাইয়া রাখিলেন। কালাপাহাড় সেই সংবাদ জানিতে পারিয়া আর পূর্ব্বদিকে গেলেন না। তদ্দ্বারা ভাতুড়িয়া, সাঁতোড়, পূর্ব্ববঙ্গ এবং বকদ্বীপের পূর্ব্বাংশ কালাপাহাড়ের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইল।

তৃতীয় উদ্যমে কালাপাহাড় কামরূপ ও আসাম দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে তিনি দিনাজপুর (দিনরাজপুর), রঙ্গপুর ও কোচবেহারের কতক অংশে ঘোর অত্যাচার করিয়া বহুলোককে মুসলমান করিয়াছিলেন। হিন্দুদের প্রতি তাঁহার অসহনীয় উৎপীড়ন দর্শনে মুসলমানদের মনেও দয়া হইত। অনেক হিন্দুকে মুসলমানেরা গোপন করিয়া কালাপাহাড়ের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছিল।

আসাম দেশ উড়িষ্যার ন্যায় একটি স্বাধীন পরাক্রান্ত হিন্দুরাজ্য ছিল। মুসলমানেরা বারংবার চেষ্টা করিয়াও এই দেশ জয় করিতে পারে নাই। কিন্তু কালাপাহাড় কামরূপ ও আসামের পশ্চিমভাগ অধিকার করিয়া অত্যাচারের একশেষ করিয়াছিলেন। আসাম দেশ জঙ্গলময় এবং অতীব দুর্গম ছিল। কালাপাহাড় আসামের পূর্ব্বভাগে যান নাই। আসামরাজ সেই দিকে প্রচ্ছন্ন ছিলেন। কালাপাহাড় বাঙ্গলায় প্রত্যাগমন করিলেই আসামীরা মুসলমানদিগকে সমস্ত আসাম হইতে তাড়াইয়া স্বদেশ উদ্ধার করিল। কিন্তু কামরূপে কালাপাহাড় যেরূপ নিষ্ঠুর অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা তথাকার লোকে এখনও ভুলিতে পারে নাই।

এই সময়ে বেলোল লোদী দিল্লীর সম্রাট্ ছিলেন এবং বার্বাক শাঃ জৌনপুরের-সম্রাট্ ছিলেন। সমস্ত অযোধ্যা, প্রয়াগ ও কাশী জৌনপুরের অধীন ছিল। জৌনপুরের সম্রাট্ দিল্লীপতির প্রায় তুল্যকক্ষ ছিলেন। উভয় সম্রাটের মধ্যে সাতাইশ বৎসর যাবৎ ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছিল। কেহই অপরকে নিরস্ত করিতে পারিতেছিলেন না। বার্বাক শাঃ কালাপাহাড়ের অতুল বিক্রম শুনিয়া তাঁহাকে নিজ সেনাপতি হইতে নিমন্ত্রণ করিলেন। কালাপাহাড়কে মাতৃভক্ত জানিয়া তিনি তাঁহাকে ভাগিনেয় বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। আর কালাপাহাড়কে পাঠাইবার জন্য তিনি সলিমান বাদশাহকেও অনুরোধপত্র পাঠাইয়াছিলেন।

সেই নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া কালাপাহাড় অল্প মাত্র যোদ্ধা সহ নৌকাপথে জৌনপুর চলিলেন। কাশী, গয়া, অযোধ্যা, প্রয়াগ ও বৃন্দাবনে হিন্দুধর্ম্ম লোপ করা তাঁহার এই নিমন্ত্রণ স্বীকারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

এ দিকে বেলোল লোদী সেই সংবাদ পাইয়া অতিশয় ব্যস্ত হইলেন এবং কালাপাহাড় যাহাতে জৌনপুরে না যাইতে পারে, তাহার উপায় করিতে চেষ্টা করিলেন। মীর আবুল হোসেন নামক একজন অতি চতুর সৈয়দ বেলোলের মন্ত্রী ছিলেন। দিল্লীপতি তাঁহাকে এক সহস্র অশ্বারোহী সহ কালাপাহাড়কে বাধা দিতে পাঠাইলেন এবং আদেশ দিলেন যে, "কালাপাহাড়কে ধৃত করিয়া আনিতে হইবে, নতুবা বিনাশ করিতে হইবে; যেন সে কোন মতে জৌনপুরে না যাইতে পারে, তাহাই করিতে হইবে।" মন্ত্রিবর সসৈন্যে গিয়া বক্সারের নিকট কালাপাহাড়ের নৌকা দেখিতে পাইলেন। চতুর সৈয়দ কালাপাহাড়কে নৌকায় গিয়া আপনাকে বার্ব্বাক শাহের অনুচর প্রকাশে বিনীত ভাবে কহিলেন যে "হুজুরের জলপথে যাইতে দীর্ঘকাল লাগিবে। ও দিকে বার্ব্বাক শাঃ নিতান্ত বিপদে পড়িয়াছেন। আমাদের অনুরোধ যে, আপনি অশ্বারোহণে শীঘ্র চলুন। আপনার অনুচরগণ ধীরে ধীরে নৌকাপথে যাউক। আপনার সেবার জন্য এক সহস্র লোক আসিয়াছে। পথিমধ্যে আপনার কোন বিষয়ে কোন কষ্ট হইবে না। আপনি যখন যাহা চাহিবেন, আমরা তখনই তাহা যোটাইয়া দিব।" বার্ব্বাক শাহের কয়েকজন লোকও কালাপাহাড়ের নৌকায় ছিল। তাহারা কিংবা কালাপাহাড় নিজে সৈয়দের চাতুরী বুঝিতে পারিলেন না। কালাপাহাড় আটজন লোক মাত্র লইয়া অশ্বারোহণ করিলেন। রাত্রিকালে অশ্বারোহিগণ সরাই মধ্যে কালাপাহাড়কে আক্রমণ করিয়া বন্দী করিল এবং তাঁহার সঙ্গী আটজনকে হত্যা করিল।

কালাপাহাড় বন্দীভাবে দিল্লীতে আনীত হইলে, দিল্লীশ্বর তাঁহাকে অতি সম্মান পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। তিনি তাঁহার বন্ধন মুক্ত করিয়া নিজ সিংহাসনের পার্শ্বে বসাইলেন এবং তাঁহাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিলেন। কিছুদিন পরে নিজ কন্যার সহ কালাপাহাড়ের বিবাহ দিলেন। এইরূপে দুই বৎসরে কালাপাহাড়কে সম্পূর্ণ বশীভূত করিলেন। তাহার পর কালাপাহাড়কে সেনাপতি করিয়া বেলোল জৌনপুর আক্রমণে চলিলেন। কালাপাহাড় বিপক্ষে আসিয়াছেন

শুনিয়াই জৌনপুরী সেনার সাহস ভঙ্গ হইল। এবারে বার্বাক খাঃ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও নিহত হইলেন। সমস্ত জৌনপুর সাম্রাজ্য দিল্লীর সম্রাটের অধীন হইল। কালাপাহাড়ের বীরত্ব সমস্ত ভারতবর্ষে বিঘোষিত হইল এবং সর্ব্বত্র হিন্দুদিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল।

জৌনপুর রাজ্য মধ্যে বহুসংখ্যক তীর্থস্থান ছিল, তন্মধ্যে কাশীধাম সর্ব্বপ্রধান। এজন্য কালাপাহাড় সর্ব্বাগ্রে কাশীধামে হিন্দুধর্ম্ম লোপের প্রয়াসী হইলেন। বলা বাহুল্য যে, তিনি শ্রীক্ষেত্রে ও কামরূপে যেরূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন, কাশীতেও তাহাই করিতে লাগিলেন॥

কালাপাহাড়ের এক মাতুলানী কাশীধামে ছিলেন। কালাপাহাড় তাহা জানিতেন না। অত্যাচার উপলক্ষে একজন যবন তাঁহাকে বলাৎকার করিল। তিনি রোদন করিতে করিতে কালাপাহাড়ের নিকট গিয়া আত্মপরিচয় দিয়া বহু তিরস্কার করিলেন এবং সেই খানেই আত্মহত্যা করিলেন। কালাপাহাড় তদ্দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া অমনি অত্যাচার ক্ষান্তি জন্য আদেশ দিলেন। কালাপাহাড়ের অসাধারণ তেজস্বিতা ছিল। তাঁহার আদেশ মাত্র অত্যাচার শান্তি হইল। তাহাতেই কেদারেশ্বর শিবলিঙ্গ রক্ষা পাইল। কাশীধামে কেবল কেদারেশ্বরই একমাত্র অনাদিলিঙ্গ এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। আর সমস্ত লিঙ্গ ও বিগ্রহই কালাপাহাড়ের পরে স্থাপিত।

সেই দিবস রাত্রিতে কালাপাহাড় সুরক্ষিত গৃহে শয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু পরদিন আর তাঁহাকে দেখা গেল না। তদবধি আর তাঁহার কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই। তাঁহার অনুদ্দেশ হইবার কারণ কি, তৎসম্বন্ধে নানাপ্রকার বিভিন্ন প্রবাদ জনসমাজে প্রচলিত আছে। কেহ বলে, তিনি মনের অনুতাপে সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। কেহ বলে, তিনি গোপনে গঙ্গায় ডুবিয়া মরিয়াছিলেন। মতান্তরে কেহ বলে, কাশীর পাণ্ডারা তাঁহাকে অচেতন অবস্থায় হরণ করিয়া গোপনে হত্যা করিয়া মাটিতে শব পুতিয়া ফেলিয়াছিল। অন্যে বলে, বেলোল লোদী তাঁহার বিক্রম দর্শনে ভীত হইয়া গুপ্তভাবে তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিলেন। আবার কেহ বলে যে, তিনি মহাদেবের অংশ ছিলেন এবং বিশ্বেশ্বরে লীন হইয়াছিলেন। এই সকল প্রবাদের মীমাংসা করা আমার অভিপ্রেত নহে। সার কথা যে, কাশীতে অত্যাচারের তৃতীয় দিবস রাত্রিতে তিনি অনুদ্দেশ

হইয়াছিলেন। তিনি একাদশ বৎসর হিন্দুধর্ম্মনাশে ব্রতী ছিলেন। বেলোল লোদীর কন্যার গর্ভে ফতেমা নামে তাঁহার এক কন্যা হইয়াছিল। সেই কন্যাই তাঁহার একমাত্র সন্তান।

কালাপাহাড় নিজ সমকালে অদ্বিতীয় বীর ছিলেন, ইহা হিন্দু মুসলমান সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। অথচ তিনি অমিশ্রিত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের সন্তান এবং বাঙ্গালা দেশেই শিক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। বীরত্ব জাতিবিশেষের বা দেশবিশেষের জন্য নির্দ্দিষ্ট শক্তি নহে। সর্ব্বপ্রকার শক্তিই কেবল শিক্ষা ও অভ্যাস হইতে উৎপন্ন হয় এবং সুযোগ দ্বারা পরিস্ফুট হয়। জুলিয়স সিজর, তৈমুরলঙ্গ এবং হজরৎ মহম্মদের বাল্যকালে বীরত্বের কিছু মাত্র আভাস ছিল না। কিন্তু তাঁহারা শেষে বিবিধ ঘটনার সুযোগে মহাবীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। কালাপাহাড়, নাদির শাঃ এবং নেপোলিয়ন বোনাপার্টির বাল্যাবধি কিছুকিছু বীরত্বের লক্ষণ ছিল বটে, কিন্তু ঘটনাস্রোতেই সেই শক্তি পরিস্ফুট হইয়াছিল। পৃথিবীতে বহুসহস্র লোক ইহাঁদের অপেক্ষাও সমধিক ক্ষমতাশালী ছিল; কিন্তু সুযোগ অভাবে তাহাদের সেই ক্ষমতা প্রকাশিত হয় নাই। যদি দুলারী বিবি কালাচাঁদের রূপে বিমুগ্ধ না হইতেন, তবে কালাচাঁদ অপ্রসিদ্ধ ভাবেই বোধ হয় ইহলোক পরিত্যাগ করিতেন। পৃথিবীতে যিনি যখন মান্য গণ্য বড় লোক হইয়াছেন, তখনই দেখা যায় যে, তাঁহার ভাগ্যক্রমে এমন সমস্ত ঘটনাবলী উপস্থিত হইয়াছিল, যাহার সঙ্কর্ষণে তিনি উচ্চ পদে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তদ্দ্বারাই তাঁহার সুখ্যাতি বা কুখ্যাতি চিরপ্রসিদ্ধ হইয়াছিল। একটাকিয়া ভাদুড়ী বংশের প্রধান খ্যাতি এই যে, উদয়নাচার্য্যের তুল্য পণ্ডিত, গণেশের তুল্য রাজা, কালাপাহাড়ের তুল্য বীর এবং মধুখাঁর তুল্য বিষয়বোদ্ধা লোক বাঙ্গলা দেশে আর কোন বংশে কেহ হয় নাই। আমি বিবেচনা করি যে, তাঁহারা যেরূপ সুযোগ পাইয়াছিলেন, সেইরূপ সুযোগ পাইলে আরও অনেক লোক তদ্রূপ বা তদধিক বিখ্যাত বড় লোক হইতে পারিত। খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিতে নিজের ক্ষমতা আবশ্যক বটে, কিন্তু সেই ক্ষমতা সুযোগ ব্যতীত প্রকাশ হয় না। অতএব সুযোগই প্রসিদ্ধির প্রধান কারণ, সন্দেহ নাই।

সলিমান কেরাণী সুদীর্ঘকাল বাঙ্গলা, বেহার ও উড়িষ্যার সম্রাট্ ছিলেন।

তাঁহার রাজত্ব সময়ে দিল্লীতে পুনঃ পুনঃ রাজবিপ্লব হইয়া অবশেষে পাঠান সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইল। মোগল জাতীয় আকবর শাঃ দিল্লীর সম্রাট্ হইলেন। মোগলেরা সংখ্যায় অতি অল্প ছিল। ভারতবর্ষীয় অন্যান্য মুসলমানদিগের সহ তাহাদের সদ্ভাব ছিল না, এজন্য তাহারা হিন্দুদিগকে স্বপক্ষ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। পাঠান কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হিন্দুরা অধিকাংশই মোগলদের সহায় হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ আম্বের ও যোধপুরের রাজপুত রাজগণ মোগল সম্রাট্দিগের সহ কুটুম্বিতা করিয়া প্রাণপণে তাঁহাদের হিত চেষ্টা করিতেন। তাহাতেই মোগল সম্রাটেরা পাঠান ও উজ্‌বকদিগকে পরাজয় করিয়া "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কালাপাহাড়ের উপদ্রবে বহুসংখ্যক বাঙ্গালী হিন্দু জমিদার ধর্ম্মরক্ষার্থ ধনসম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া গুপ্তভাবে স্থানে স্থানে ছিলেন। হিন্দুর প্রতি মোগল সম্রাট্ আকবরের অনুগ্রহ শুনিয়া অনেকে দিল্লী গিয়া আকবরের চাকরীতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা সর্ব্বদা আকবরকে বাঙ্গলা দেশ জয়ের জন্য উত্তেজিত করিতেন। এই সকল লোকের মধ্যে তাহিরপুরের জমিদার কংসনারায়ণ রায়, সিন্দুরীর জমিদার ঠাকুর কালিদাস রায়, সাঁতোড়ের রাজকুমার গদাধর সান্যাল এবং দিনাজপুরের রাজভ্রাতা গোপীকান্ত রায় বিশেষ সম্ভ্রান্ত ছিলেন। বাঙ্গলাদেশ অধিকার করিতে আকবরের নিজেরও ইচ্ছা ছিল। তাহার উপর ঐ সকল ব্যক্তির উত্তেজনায় সেই ইচ্ছা সমধিক বলবতী হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী পাঠান ও উজ্‌বকদের বিদ্রোহ এবং চিতোরের মহারাণার সহ বিবাদ হেতু আকবর বহুদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গলাদেশ আক্রমণে অবসর পান নাই। এদিকে গৌড় বাদশাঃ সলিমান নিজের প্রচুর ধনবল ও সৈন্যবল সত্বেও সর্ব্বদা আকবর শাহের আনুগত্য করিতেন এবং উপঢৌকন পাঠাইতেন। তজ্জন্য তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আকবরের চক্ষুলজ্জা হইত। খৃঃ ১৫৮০ সালে সলিমান বাদশাহের মৃত্যু হইল। তৎপুত্র দাউদ খাঁ গৌড় বাদশাঃ হইলেন। তিনি নিজ-বিভূতিগর্ব্বিত হইয়া নিজ পাঠান অমাত্যগণের পরামর্শে মোগল সম্রাটের বিপক্ষ হইলেন। আকবর স্বয়ং সসৈন্যে দাউদের সহ যুদ্ধে চলিলেন। উপরি উক্ত চারিজন বাঙ্গালী সম্ভ্রান্ত লোক মোগলদিগের অপরিচিত পথের পথপ্রদর্শক হইলেন। দাউদ নিজে অত্যাচারী ছিলেন না; কিন্তু তাঁহার পিতার

আমলে যে সকল অত্যাচার হইয়াছিল, তজ্জন্য সমস্ত হিন্দুই পাঠানদিগের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। তাহারা কেবল ভয় প্রযুক্তই বিদ্রোহী হয় নাই। পাঠান সৈন্য হাজিপুরের নিকট একটি যুদ্ধে পরাজিত হইবামাত্র সমস্ত বাঙ্গালী হিন্দুরা পাঠানদিগের বিপক্ষ হইয়া উঠিল। ভাতুড়িয়ার রাজা এবং চন্দনার বঙ্গজ কায়স্থ রাজবংশীয় বিক্রমাদিত্য (ইনি রাজা প্রতাপাদিত্যের পিতা) ভিন্ন কোন হিন্দু বড় মানুষ পাঠানদের পক্ষে থাকিলেন না। দাউদ তদ্দর্শনে ভীত হইয়া একবারে উড়িষ্যা পলায়ন করিলেন। বাঙ্গলা ও বেহার দিল্লীসাম্রাজ্যভুক্ত হইল। এই অবধি বাঙ্গলাদেশে পাঠান রাজত্ব শেষ হইল।

পাঠান রাজত্বে রীতিমত শাসনপ্রণালী ছিল না। মধুসূদন খাঁ, সৈয়দ হোসেন শাঃ এবং শের শাঃ দেশীয় জমিদারদিগকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং রীতিমত মালগুজারী দিতে বাধ্য করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু জরীপ জমাবন্দি করেন নাই। অন্যান্য সম্রাট্ বা নবাবদের সময়ে কোনই শৃঙ্খলা ছিল না। জমিদারেরা স্বেচ্ছামত আপন জমিদারী শাসন করিত, পার্শ্ববর্ত্তী জমিদার সহ সন্ধি বিগ্রহ করিত। সম্রাট্‌কে রাজস্ব দিত, এই মাত্র সম্বন্ধ ছিল। সেই রাজস্ব বাকি পড়িলে সম্রাট্ জমিদারের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইতেন। রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে হইলে ধনবান্ জমিদারদিগের উপর আন্দাজী জমা বেশী ধরা হইত।

পাঠান সর্দ্দারেরা অধিকাংশই লেখা পড়া জানিত না। তাহাদের কর্ম্মচারিগণকে সচরাচর অনেক অপমান সহ্য করিতে হইত, কিন্তু তাহাদের প্রচুর অর্থলাভ হইত। প্রায়শঃ শূদ্রেরাই পারসী পড়িয়া তাহাদের চাকরী করিত। সেই শূদ্রদের নামের শেষে "লাল" শব্দ থাকিত; যথা রামলাল, শ্যামলাল, কিষণলাল, প্যারীলাল ইত্যাদি। এইজন্য পাঠানেরা তাহাদিগকে "লালা লোক" বলিত। তাহারা আপনাদিগকে "কায়েত" বলিত এবং যাহারা জাতিতে কায়স্থ নহে, তাহারাও অর্থব্যয় করিয়া ক্রমে ক্রমে কায়স্থ জাতিতে মিলিত হইত। পাঠানেরা সুন্দরী রমণী দেখিলেই হরণ করিতে চেষ্টা করিত। তাহারা অতিব্যয়ী ছিল, তজ্জন্য ধনীর ধনও হরণ করিত। বিশেষতঃ তাহাদের শূদ্র কর্ম্মচারীরা অর্থশোষণে একান্ত ব্রতী ছিল। পাঠান সর্দ্দারগণের আবাসের নিকটে কোন ধনী বা ভদ্রলোক বাস করিত না। দূরবাসী লোকেরাও ধন এবং সুন্দরী রমণী সংগোপনে রাখিত। পাঠানদিগের শূদ্র কর্ম্মচারীরাও নিজবাড়ী ও পরিবার দূরে রাখিত। পশ্চিম

প্রদেশে পাঠানদিগকে "যম রাজা" এবং তাহাদের শূদ্র কর্ম্মচারীদিগকে "চিত্রগুপ্ত" বলিত। তাহা হইতেই পশ্চিমা কায়েতেরা আপনাদিগকে চিত্রগুপ্তের সন্তান বলে। বাঙ্গালী কায়েতদের অত্যাচার বোধ হয় কম ছিল। তাহাদের চিত্রগুপ্ত উপাধি ছিল না। বাঙ্গালী কায়েতেরা পূর্ব্বে কখনও আপনাদিগকে চিত্রগুপ্তের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিত না। প্রায় পনর বৎসর হইল বাঙ্গালী কায়স্থেরা ক্ষত্রিয়শ্রেণীভুক্ত হইবার লালসায় আপনাদিগকে চিত্রগুপ্তের সন্তান বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাস্তবিক চিত্রগুপ্ত কোন ব্যক্তি নহে। মনের গুপ্ত পাপকে রূপক অলঙ্কারে চিত্রগুপ্ত বলে।

পাঠান রাজত্বে বিদ্যার চর্চ্চা কম হইয়াছিল। উৎপীড়ন ও দস্যুভয়ে শিল্প বাণিজ্যের অপকর্ষ ঘটিয়াছিল। মূর্খতাজনিত কুসংস্কার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তখন প্রায় সকল লোকেই অস্ত্র রাখিত এবং তাহা চালাইতে জানিত। লোকেরা অপেক্ষাকৃত সাহসী. বলবান্, পরিশ্রমী ও সুঠকায় ছিল। দেব দ্বিজ গুরুজনের প্রতি ভক্তি খুব বেশী ছিল। খাদ্যদ্রব্যের কোন পারিপাট্য ছিল না, কিন্তু লোকের আহার প্রচুর বেশী ছিল। সমস্ত দ্রব্য শস্তা ছিল। যে ব্যক্তি মাসে ২৲ দুই টাকা অর্জ্জন করিত, তাহার পরিবারপ্রতিপালনে কোন কষ্ট হইত না। তখন পয়সা, আধুলি, সিকি, দুয়ানী ছিল না। টাকা ভাঙ্গাইলে এক বোঝা কড়ী পাওয়া যাইত, তাহা দ্বারাই সাধারণ সমস্ত দ্রব্যাদি ক্রয় করা চলিত। সেলাইকরা অঙ্গ-বস্ত্র এবং জুতার ব্যবহার হিন্দুদিগের মধ্যে অতি কম ছিল। তখন স্ত্রীলোকের উপর অতিশয় উৎপীড়ন ছিল। বৃদ্ধাদিগের সুখ ও সম্মান বরং এখন অপেক্ষা তখন ভাল ছিল। কিন্তু বৌদিগের কষ্ট ও অপমান অত্যধিক ছিল। বৌদের পিতা মাতা এবং ভ্রাতাদিগকেও বহু কষ্ট ও অপমান সহ্য করিতে হইত। সেই জন্যই এই সময় হইতে শ্যালক, শালী, শ্বশুর, শ্বশুরী শব্দ গালি বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। তখন রাজবিদ্রোহ এবং ডাকাতি বীরপুরুষের কার্য্য বলিয়া গণ্য ছিল। চুরি, ছুঁচামি, ঠগামি তখন অতি ঘৃণিত কার্য্য বলিয়া গণ্য হইত।

বাঙ্গলা বেহার মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইলে সেনাপতি মুনিম খাঁ সুবাদার পদে নিযুক্ত হইলেন এবং রাজা তোড়রমল্ল দেওয়ান হইলেন। তাঁহারা ভাদুড়ী-দিগকে পাঠানের পক্ষীয় জানিয়া জগৎনারায়ণের ক্ষমতা হ্রাস করিতে মনস্থ করিলেন। তাঁহারা একটাকিয়ার জমিদারী সাত পরগণা মধ্যে পাঁচ পরগণা জব্দ

করিয়া তাহা সাঁতোড়ের রাজাকে দিয়াছিলেন। বৃহৎ পরগণা রামবাজু ভাঙ্গিয়া কালীগাঁও এবং কুশুম্ভী নাম দিয়া দুই পরগণা করিলেন। তন্মধ্যে কালীগাঁও পরগণা খাস করিলেন। কেবল প্রতাপবাজু ও কুশুম্ভী এই দেড় পরগণা মাত্র জগৎনারায়ণের থাকিল। কিন্তু তাহারও মালগুজারী প্রায় দ্বিগুণ হইল। আর জাগীর ভাতুড়িয়ার নজরানা এক টাকা এখন মালগুজারী স্বরূপ হইল। কিন্তু সেই একটাকা দাখিলের পূর্ব্বে এক হাজার টাকা নর্ম্মা বা নজরানা দিবার হুকুম হইল। এইরূপে একটাকিয়ার বার্ষিক মুনাফা সাড়ে ছয় লক্ষ টাকার স্থলে কেবল দুই লক্ষ টাকা মাত্র থাকিল। তদবধি ভাতুড়ীদের ক্ষমতা ও মুনাফা সাঁতোড়ের রাজার অপেক্ষা অনেক কম হইল।

রাজা জগৎনারায়ণ মন্ত্রিগণ সহ পরামর্শ করিয়া সম্রাটের নিকট অতিবাদ * করিলেন। সেই অতিবাদে তিনি তিনটি বিষয়ে আপত্তি করিয়াছিলেন ; যথা—

১। চাকলে ভাতুড়িয়া এ অধীনের বহুকালীন পুরুষানুক্রমিক নিষ্কর জাগীর। আমরা কেবল গৌড়বাদশার অধীনতা স্বীকারে একটাকা নর্ম্মা দিতাম। দেওয়ান রাজা তোড়রমল সেই জাগীরে মালগুজারী ধার্য্য করিয়া পুনরায় যে এক হাজার টাকা নর্ম্মা ধার্য্য করিয়াছেন তাহা অন্যায়।

২। আমরা আপদ বিপদে সাহায্য করার অঙ্গীকারে গৌড়বাদশাহের অধীনে জাগীর ভোগ করিতাম। হুজুরের সহ দাউদশাহের যুদ্ধকালে আমি দাউদ-শাহের পক্ষে থাকিয়া নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছি। এখন হুজুরের কোন শত্রু উপস্থিত হইলে আমি অবশ্যই হুজুরের পক্ষেই থাকিব। দাউদের স্বপক্ষতা হেতু দেওয়ানজী যে আমার সাড়ে পাঁচ পরগণা জমিদারী জব্দ করিয়াছেন, তাহা অন্যায় হইয়াছে।

---

* উপরিতন বিচারকের নিকট নালিশের নাম অধিবাদ এবং সর্ব্বপ্রধান বিচারকের নিকট নালিশের নাম অতিবাদ। আপীল ও খাস আপীল হইতে অধিবাদ এবং অতিবাদ বিভিন্ন। নালিশ না করিয়া একবারে অধিবাদ হইতে পারিত এবং নালিশ ও অধিবাদ না করিয়া একবারে অতিবাদ করা যাইতে পারিত। উপরিস্থ হাকীম নিজ বিবেচনা মত সাক্ষ্য প্রমাণাদি লইতেন, উপযুক্ত তদন্ত করিতেন এবং তদনুসারে বিচার করিতেন। আপীলে যেমন নিম্ন আদালতের লিখিত নথী দৃষ্টে বিচার হয়, অধিবাদে তাহা হইত না। সুতরাং আপীল ও খাস আপীল শব্দের স্থলে অধিবাদ এবং অতিবাদ ব্যবহার করা যাইতে পারে না।

৩। এখন আমার যে দেড় পরগণা জমিদারী বহাল আছে, তাহার মাল-গুজারী অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। তাহা চালান অধীনের অসাধ্য।

সেই অভিবাদ সমর্থনার্থ রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার চন্দ্রনারায়ণ খাঁ বহুতর ভেট লইয়া আগরা রাজধানীতে গেলেন। তাঁহার সাহায্যার্থে লালা রামচন্দ্র সরকার এবং একজন সুযোগ্য মুসলমান মৌলবীও প্রেরিত হইল।

সম্রাট্ আক্‌বর সেই অভিবাদ শুনিয়া রাজা তোড়রমল্লের নিকট সবিস্তার কৈফিয়ত তলপ করিলেন। সেই কৈফিয়ত আসা সাপেক্ষে চন্দ্রনারায়ণ আগরাতে থাকিলেন। মধ্যে একবার মথুরা বৃন্দাবন গিয়া তীর্থ করিয়া আসিলেন। সময়ে সময়ে বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে থাকিলেন। তাঁহার আকৃতি প্রকৃতি কথাবার্ত্তায় তিনি যে সুশিক্ষিত এবং উচ্চবংশজাত, তাহা আক্‌বর বুঝিতে পারিলেন। কুমারের আনুযাত্রিক লালা ও মৌলবীর নিকট সম্রাট্ তাঁহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাইলেন।

অন্যান্য দিগ্বিজয়ী জাতি হইতে তার্ত্তার জাতির রীতি সম্পূর্ণ বিপরীত। অন্যান্য জাতীয় লোক কোন দেশ জয় করিলে তথায় স্বকীয় ধর্ম্ম, ভাষা, রীতি-নীতি প্রচলিত করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তার্ত্তার জাতি কোন দেশ জয় করিলে নিজেরাই সেই দেশের ধর্ম্ম, ভাষা এবং আচার ব্যবহার গ্রহণ করে। মোগলেরা আগে মুসলমান রাজ্য জয় করিয়া মুসলমান হইয়াছিল, তাহার পরে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। এইজন্য তাহারা সম্পূর্ণ হিন্দু ব্যবহার অনুকরণ করে নাই। তথাপি মোগল সম্রাট্‌দিগের ব্যবহার মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু রাজনীতির অধিক অনুযায়ী ছিল। আক্‌বরের অধিকাংশ বেগমগুলি ক্ষত্রিয়রাজকন্যা। তাহারা প্রায় হিন্দু ব্যবহারেই থাকিত। সম্রাট্ হিন্দুর মধ্যে হিন্দু, মুসলমানের মধ্যে মুসলমান ছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে খৃষ্টধর্ম্মের উপদেশও শুনিতেন। সকল ধর্ম্মের প্রতিই তাঁহার বাহ্য ভক্তি ছিল, কিন্তু কোন ধর্ম্মেই তাঁহার প্রকৃত আস্থা ছিল না। তিনি চন্দ্রনারায়ণের আভিজাত্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে আটক করত নিজের এক কন্যার সহ তাঁহার বিবাহ দিয়া তাঁহাকে মূলতানের শুবাদার নিযুক্ত করিলেন। জাতিপাত হওয়ায় চন্দ্রনারায়ণ আর দেশে আসেন নাই। তাঁহার পরবর্ত্তী বিবরণ জানা যায় না।

বহুদিন পর রাজা তোড়রমল্ল কৈফিয়ত পাঠাইলেন। তিনি লিখিলেন যে—

১। যে ব্যক্তি বিবাদের একপক্ষকে আশ্রয় করে, তাহার আশ্রয় জয়ী হইলে আশ্রিতের লাভ হয় এবং পরাজয় হইলেই আশ্রিতের দণ্ড হয়। জগৎনারায়ণ ঠাকুরের পিতামহ শের শাহের পক্ষে থাকিয়া স্বর্গীয় হুমায়ুন বাদশাহের সহ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। শের শাঃ জয়ী হওয়ায় ঠাকুরেরা পুরস্কারও পাইয়াছিলেন। এখন ঠাকুরদের আশ্রয় দাউদ শাঃ পরাজিত হইয়াছেন। আমরা উচিত রূপেই জগৎ ঠাকুরের কতক সম্পত্তি জব্দ করিয়াছি। সম্পত্তি নূতন উৎপন্ন হয় না। এক জনের ক্ষতি ব্যতীত অন্যের লাভ হইতে পারে না। বাঙ্গলা দেশের যে সকল লোক আমাদের সাহায্য করিয়াছে, তাহাদিগকে সমুচিত পুরস্কার দেওয়া আবশ্যক। এইজন্য বিপক্ষপক্ষীয়দের কতক সম্পত্তি জব্দ করিয়া তাহাই স্বপক্ষদিগকে দেওয়া হইয়াছে।

২। নবাব সমসুদ্দীন দিল্লীর বাদশাহের বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীন হইয়াছিলেন। জগৎ ঠাকুরের পূর্ব্বপুরুষ ঠাকুর সুবুদ্ধিরাম সেই বিদ্রোহী নবাবের সাহায্য করিয়া জাগীর পাইয়াছিলেন। এখন বাঙ্গলা মুলুক পুনরায় দিল্লী সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ায় সেই জাগীর জব্দ হওয়াই উচিত। নবাব নাজিমের ইচ্ছা ছিল যে, জাগীর জব্দ করিয়া জমিদারী রূপে বন্দোবস্ত করা হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণ ঠাকুর অতি পুরাতন আমীর এবং তাঁহার অধীনে হিন্দু মুসলমান সকলেই তুষ্ট আছে। আমি তাহা দেখিয়া ঠাকুরের জাগীর স্থিরতর রাখিয়াছি। তাঁহার যে একহাজার টাকা মাত্র নর্ম্মা ধার্য্য হইয়াছে, তজ্জন্যে অধিবাদ না করিয়া ধন্যবাদ করাই তাঁহার উচিত।

৩। হিন্দু শাস্ত্র ও ব্যবহার মতে জমিদারেরা মোট রাজস্বের ১/১০ ভাগ পাইত। আমিও প্রায় তদ্রূপই দিয়াছি অর্থাৎ হাল বন্দোবস্তে সমস্ত জমিদারের উপরই সুমার জমার (মোট সংস্থার) দুই তৃতীয়াংশ মালগুজারী ধার্য্য করিয়াছি এবং ১/৩ ভাগ তাহাদের খরচ ও মুনাফা বাবত দিয়াছি। জগৎ ঠাকুরের উপরও তাহাই ধার্য্য হইয়াছে। তাঁহার জমিদারীতে কিছুমাত্র বেশী মালগুজারী ধরা হয় নাই। ফলতঃ আমি ঠাকুর সাহেবের প্রতি অনুগ্রহ ভিন্ন কোন নিগ্রহ করি নাই। তবে কি না, আমি সরকারী চাকর; মালিকের ষোল আনা ঠিক রাখিয়া কাজ করিতে হইয়াছে। ঠাকুর জগৎনারায়ণ এখন আপনকার বৈবাহিক। তৎপ্রতি অনুগ্রহ করা হুজুরালির উচিত বটে। আমরাও তাহাতে তুষ্ট হইব।

আকবর সেই কৈফিয়ত দৃষ্টে জগৎনারায়ণের প্রথম দুই আপত্তি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিলেন। তৃতীয় আপত্তি সম্বন্ধে লিখিলেন যে, অন্যান্য জমিদারগণ অপেক্ষা একটাকিয়া ঠাকুরদের সম্মান অনেক বেশী। তাঁহাদের মালগুজারী অন্যান্য জমিদারগণ সহ তুল্য হইতে পারে না। তাঁহাদের মালগুজারী সুমার জমার নিম্পী অর্থাৎ অর্দ্ধেক হারে ধার্য্য করা যায়। এই হুকুমানুসারে জগৎ-নারায়ণের মালগুজারী বার্ষিক ছয় হাজার টাকা কমিল।

রাজা জগৎনারায়ণের তিন পত্নী এবং বহু উপপত্নী ছিল। এক স্ত্রীকে ভাল বাসিলে যে, অন্য কাহাকেও ভালবাসা যায় না, ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক বিলাতী মত মাত্র। ইউরোপীয়েরা যখন পশুর ন্যায় অসভ্য ছিল, তখনও তাহাদের বহুবিবাহের রীতি ছিল না। অথচ এশিয়া খণ্ডে চিরকালই বহু-বিবাহ প্রচলিত আছে। রাজা তাঁহার সমস্ত পত্নী ও উপপত্নী এবং তাহাদের সন্তানদিগকে ভাল বাসিতেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগিনী, জ্ঞাতি, কুটুম্ব সকলকেই আন্তরিক ভাল বাসিতেন এবং সকলকে লইয়া সাংসারিক সুখ ভোগ করিতেন। অথচ সেই বহু পরিবারের মধ্যে কোন বিবাদ ঝগড়া হইত না।

জগৎনারায়ণ বৃদ্ধকালে কানসাট গিয়া গঙ্গাবাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পাটরাণীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠপুত্র চন্দ্রনারায়ণের জাতিপাত হইয়াছিল। পাট-রাণীর উপেন্দ্রনারায়ণ নামে একটি পুত্র শেষে হইয়াছিল। রাজার গঙ্গাযাত্রা-কালে উপেন্দ্রের বয়স দেড় বৎসর মাত্র। মধ্যম রাণীর কোন পুত্রসন্তান ছিল না। কনিষ্ঠা রাণীর পুত্র মহেন্দ্রনারায়ণ খাঁ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জগৎনারায়ণ মহেন্দ্রের উপর সমস্ত ভার দিয়া তের বৎসর কাল জপ তপে গঙ্গাতীরে বাস করিয়াছিলেন। হিন্দুদের উইল করিবার রীতি ছিল না। বরং উইল বা তৎসদৃশ অন্য উপায়ে শাস্ত্রমত উত্তরাধিকারীর স্বত্বের কোনরূপ ব্যতি-ক্রম করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া গণ্য হইত। শাস্ত্রমত যাহার যাহা প্রাপ্য, মুমূর্ষু ধনীর তাহাতে কোন পরিবর্ত্তন করিতে অধিকার ছিল না। রাজ্য অবি-ভাজ্য সম্পত্তি ছিল। সুতরাং জগৎনারায়ণের গঙ্গাপ্রাপ্তি হইলে মহেন্দ্রনারায়ণ একাকী সমস্ত রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন।

দুর্গোৎসব ও বাসন্তী।

জগৎনারায়ণের রাজত্বকাল বাঙ্গলা দেশের ইতিহাসে অতীব প্রসিদ্ধ।

এই সময়ে বাঙ্গলা বেহার পুনরায় দিল্লীর সম্রাটের অধীন হইয়াছিল। এবং পাঠান রাজত্ব বিলুপ্ত হইয়া মোগল সাম্রাজ্য আরম্ভ হইয়াছিল। এই সময়ে বাঙ্গলার প্রসিদ্ধ রাজধানী গৌড়নগর মহামারীতে উৎসন্ন হইয়াছিল। এই সময়েই বাঙ্গলা দেশে জগদ্বিখ্যাত দুর্গোৎসব প্রচারিত হইয়াছিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাসন্তী পূজাও আরম্ভ হইয়াছিল। আর এই সময়ে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের কৌলীন্য প্রথার সংস্করণ হইয়াছিল। এই সময়ে তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ রায় বাঙ্গালী হিন্দুসমাজের নেতা হইয়াছিলেন। এই সময়েই রাজা তোড়রমল সমস্ত বাঙ্গলা ও বেহার জরিপ করিয়া রীতিমত জমাবন্দি করিয়াছিলেন।

রাজা কংসনারায়ণ, মনুসংহিতার টীকাকারক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কল্লূক ভট্টের সন্তান। তাঁহার পিতামহ উদয়নারায়ণ, সম্রাট্ গণেশ খাঁর শ্যালক এবং সাহায্যকারী ছিলেন; তিনিই প্রথম "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র জীবন রায়, গৌড় বাদশাঃ যদুনারায়ণ খাঁর দেওয়ান ছিলেন। জীবনের ভ্রাতুষ্পুত্র কংসনারায়ণ, গৌড় বাদশাঃ সলিমানের অধীনে ফৌজদার ছিলেন। কালাপাহাড়ের দৌরাত্ম্য-সময়ে তিনি কর্ম্মত্যাগ করিয়া ছদ্মবেশে গুপ্ত ছিলেন। যখন দাউদ খাঁ মোগল সম্রাট্ আক্‌বরের সহ বিবাদ উপস্থিত করিলেন, তখন কংসনারায়ণ, সম্রাট্ আক্‌বরের চোপদারী কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। মোগল সেনা বাঙ্গলা দেশ আক্রমণ করিতে আসিলে, তিনি সেই সেনার পথপ্রদর্শক এবং প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। দেওয়ান তোড়রমল বাঙ্গলা দেশের বন্দোবস্ত শেষ করিবার পূর্ব্বেই দিল্লীতে আহূত হইলে, কংসনারায়ণ "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হইয়া শুবে বাঙ্গলা বেহারের দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শুবাদার মুনিম খাঁ মহামারীতে গতাসু হইলে, রাজা কংসনারায়ণ প্রায় দুই বৎসর কাল দেওয়ানী ও শুবাদারী উভয় কার্য্যই নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। যখন সম্রাট্ আক্‌বর তাঁহাকে শুবাদারী পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত না করিয়া বাঙ্গলা ও বেহারের পৃথক্ পৃথক্ শুবাদার নিযুক্ত করিলেন এবং কংসনারায়ণকে কেবল শুবে বাঙ্গলার দেওয়ানী করিতে আদেশ দিলেন, তখন তিনি চাকরী ত্যাগ করিয়া নিজ জমিদারী শাসন এবং সামাজিক উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা কংসনারায়ণ একটি মহাযজ্ঞ করিতে উৎসুক হইয়া বাঙ্গলা দেশের সমস্ত প্রধান পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের

পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। বাসুদেবপুরের ভট্টাচার্য্যগণ বংশানুক্রমে তাহির-পুরের রাজাদের পুরোহিত ছিলেন। সেই পুরোহিতগোষ্ঠীর মধ্যে রমেশ শাস্ত্রী তৎকালে বাঙ্গলা বেহারের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কহিলেন "বিশ্বজিৎ, রাজসূয়, অশ্বমেধ ও গোমেধ এই চারিটি মহাযজ্ঞ নামে কথিত। বিশ্বজিৎ এবং রাজসূয় কেবল সার্ব্বভৌম সম্রাটেরা করিতে পারেন। তুমি বাদশাহের অধীন নৃপতি ; ঐ দুই যজ্ঞ তোমার সাধ্যাতীত। অশ্বমেধ, গোমেধ কলিতে নিষিদ্ধ। অপিচ এই যজ্ঞচতুষ্টয় ক্ষত্রিয়ের জন্যই প্রসিদ্ধ, উহা ব্রাহ্মণের পক্ষে শোভনীয় নহে। তোমার পক্ষে দুর্গোৎসব ভিন্ন অন্য কোন মহাযজ্ঞ উপযুক্ত নাই। সত্যযুগে সুরথ রাজা আদ্যাশক্তির অর্চ্চনা করিয়া চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ত্রেতাযুগে স্বয়ং ভগবান্ রামচন্দ্র রাবণবধের জন্য অকালে সেই পূজা করিয়াছিলেন। তাহার ফলশ্রুতি মধ্যে উক্ত আছে, যে কেহ রাম-চন্দ্রের বিধানে ভক্তিভাবে দুর্গোৎসব করিবে, সে সর্ব্বযজ্ঞের ফল লাভ করিবে। এই যজ্ঞ, সকল যুগে সকল জাতীয় লোকেই করিতে পারে এবং এই এক যজ্ঞেই সকল যজ্ঞের ফল হয়। অতএব আমার বিবেচনায় তোমার এই যজ্ঞ কর্ত্তব্য।" সমাগত সমস্ত পণ্ডিতগণ তন্মতে সম্মতি দিলেন। তদনুসারে রাজা কংস-নারায়ণ সাড়ে আট লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাজসিক বিধানে দুর্গোৎসব করিলেন।

যদিও মার্কণ্ডেয় পুরাণে দুর্গোৎসবের কতক বৃত্তান্ত আছে বটে, কিন্তু সমগ্র বিধান কোন প্রাচীন গ্রন্থে নাই। আধুনিক দুর্গোৎসবপদ্ধতি রমেশ শাস্ত্রি-প্রণীত। যৎকালে সমুদায় দ্রব্য শস্তা ছিল, সেই সময়ে সাড়ে আটলক্ষ টাকা ব্যয়ে এই মহাযজ্ঞ প্রথম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই যজ্ঞের ধূমধাম, আনন্দ ও উৎসাহ দৃষ্টে সকলেই মোহিত হইয়াছিল। রাজা কংসনারায়ণের পুণ্য ও প্রতিষ্ঠা রাঢ়ে বঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। রাজা জগৎনারায়ণ তদ্দৃষ্টে ঈর্ষাপরবশ হইয়া কংসনারায়ণকে অপাকরণ জন্য নব লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া সুরথ রাজার বিধানে বাসন্তী দুর্গোৎসব করিলেন। কিন্তু বাসন্তী পূজা শারদীয়া পূজার ন্যায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিল না। জগৎনারায়ণ নিজ পুরোহিতকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, পুরোহিত কহিলেন "রাজা কংসনারায়ণ ধর্ম্মার্থে শারদীয়া পূজা করিয়াছেন আর তুমি ঈর্ষা ও অহঙ্কার বশে বাসন্তী পূজা করিয়াছ ; এই জন্য তাঁহার প্রতিষ্ঠা বেশী এবং তোমার প্রতিষ্ঠা কম হইয়াছে।"

জগৎনারায়ণ লজ্জিত হইয়া তদবধি উত্তর পূজাই যথাকালে করিতে লাগিলেন। সাঁতোড়ের রাজা এবং অন্যান্য হিন্দু বড় লোকেরা দেখাদেখি শারদীয় দুর্গোৎসব আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ বাসন্তী পূজাও আরম্ভ করিলেন। সম্রাট্ শাঃ জেহান বাঙ্গলা দেশে শারদীয়া পূজা দৃষ্টে মোহিত হইয়াছিলেন এবং নিজব্যয়ে ব্রাহ্মণ দ্বারা মহা আড়ম্বরে দুর্গোৎসব করিতেন। তৎপুত্র ঔরংজেব অতিশয় গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। তিনি দুর্গোৎসব রহিত করিয়া সেই ব্যয়ে মুসলমানদের প্রধান পর্ব্ব মহরমে প্রচুর ধূমধাম করিতে লাগিলেন এবং নিজের যাবতীয় হিন্দু মুসলমান কর্ম্মচারিগণকে মহাসমারোহে মহরম করিতে আদেশ দিলেন। সেই আদেশ প্রতিপালিতও হইয়াছিল। কিন্তু মহরম আনন্দের ব্যাপার নহে। ইমাম হাসন ও হোসেনের অকালে বিনাশ জন্য শোক প্রকাশ করাই মহরমের উদ্দেশ্য। তাহাতে ধূমধাম সমারোহ করা প্রকৃত পক্ষে মুসলমান ধর্ম্মের বিরুদ্ধ কার্য্য। গোঁড়ামীতে অনেক সময়েই মূল উদ্দেশ্য হারাইয়া যায়। ঔরংজেবের পক্ষেও তাহাই হইয়াছিল। যাহা হউক, বাদশাঃ এবং নবাবদিগের যত্ন ও অসাধারণ ব্যয় সত্বেও মহরম পর্ব্ব কোন ক্রমে দুর্গোৎসবের তুল্য হইতে পারিল না।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের কুলমর্য্যাদা সংশোধন রাজা কংসনারায়ণের দ্বিতীয় প্রসিদ্ধ কার্য্য। উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী তাঁহার প্রথম পক্ষের পুত্র উমাপতি, শ্যামাপতি প্রভৃতি ছয় জনকে ত্যাগ করিয়া নিয়ম করিয়াছিলেন যে, সেই ছয়জন কৌলীন্যমর্য্যাদা-ভ্রষ্ট হইবে। আর যে কোন কুলীন তাহাদের সহ আদান প্রদান ও আহার ব্যবহার করিবে, তাহারাও পতিত হইবে। আবার তাদৃশ পতিত কুলীন সহ যাহারা কোনপ্রকার সংস্রব করিবে, তাহারাও ভ্রষ্ট হইবে। পরবর্ত্তী কালে মধু মৈত্রের পুত্রেরাও পিতৃদ্রোহ অপরাধে ধৈ বাগছি কর্ত্তৃক ঐরূপ কৌলীন্যভ্রষ্ট হইয়াছিল এবং তাহাদের সহ সংস্রবেও অন্য কুলীনের কুলপাত হইবার নিয়ম হইয়াছিল। সেই পতিত কুলীনেরা কপটভাবে সংস্রব করিয়া বহুসংখ্যক কুলীননকে নিজ দলভুক্ত করিয়া বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এই কপট কুলীনদিগকে কাপকুলীন কিংবা সংক্ষেপে কাপ বলিত। রাজা কংস-নারায়ণের সময়ে কাপের সংখ্যা বিশুদ্ধ কুলীন অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছিল। রাজার পুরোহিত বাসুদেবপুরের ভট্টাচার্য্যেরাও কাপ হইয়াছিলেন। কাপের প্রাবল্যে বিশুদ্ধ কুলীন নিঃশেষ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। তজ্জন্য বিশুদ্ধ

কুলীনেরা রাজা কংসনারায়ণকে ব্যবস্থা সংশোধন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। রাজা নিজে সিদ্ধ শ্রোত্রিয় মধ্যে শ্রেষ্ঠ অস্তাচল নামে খ্যাত ছিলেন।

রাজা কংসনারায়ণ সমস্ত কুলজ্ঞদিগকে, সমস্ত গাঁইকর্ত্তা কুলীনদিগকে এবং বহুসংখ্যক কুলীন, কাপ-কুলীন ও সিদ্ধ-শ্রোত্রিয়দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। পরে তাঁহাদের নিকট উদয়নাচার্য্য ও ধৈ (ধ্যানরাম) বাগছির কৃত ব্যবস্থা সংশোধনের প্রয়োজন ব্যাখ্যা করিলেন। উক্ত দুই ব্যবস্থার কঠোরতা সকলেই অনুভব করিতেছিলেন; সুতরাং সকলেই আগ্রহের সহিত রাজার পোষকতা করিলেন। তখন রাজা কংসনারায়ণ নিয়ম করিলেন যে (১) কাপ কুলীনেরা বিশুদ্ধ কুলীন ও সিদ্ধ শ্রোত্রিয়ের মধ্যবর্ত্তী হইবেন। (২) কাপ ও কুলীনের মধ্যে পুত্র কন্যার বিবাহ উপলক্ষে কুশবারি দ্বারা মর্য্যাদা পরিবর্ত্তন করিলেই কুলীন ভঙ্গ হইয়া কাপ হইবেন অথবা কুলীনের পুত্র কাপে দত্তক দিলে কুলীন ভঙ্গ হইয়া কাপ হইবেন। কাপের সহ আহার ব্যবহার বা অন্য কোন সংস্রবে কুলভঙ্গ হইবে না। (৩) সিদ্ধ শ্রোত্রিয়েরা কাপে কন্যা না দিয়া পঠী পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে না। (৪) সাধ্য ও কষ্ট শ্রোত্রিয়েরা অগ্রে কাপে বিবাহ না দিয়া কুলীনে বিবাহ দিতে পারিবেন না। (৫) কুলীন ও কাপগণ শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিবেন, কিন্তু শ্রোত্রিয়ে কন্যা দিলে অমনি কুলভঙ্গ হইয়া শ্রোত্রিয় হইবেন। (৬) কুলীন ও কাপগণ কোন কুলীন বা কাপের বন্ধুহীনা কন্যা বিবাহ করিতে পারিবেন না; তাদৃশী কন্যা কেবল শ্রোত্রিয়ের গ্রাহ্য। (৭) কুলীন ও কাপের বিবাহে যেমন মর্য্যাদা পরিবর্ত্তন করিয়া সমীকরণ বা করণ করিতে হয়, শ্রোত্রিয়ের সহ তদ্রূপ সমীকরণ করিতে হইবে না।

রাজার উক্ত ব্যবস্থা সভাস্থ সকলেই স্বীকার করিলেন। রাজা তাঁহার নিজের তিন কন্যা কাপে বিবাহ দিয়া তদুপলক্ষে কুলীন, কাপ ও শ্রোত্রিয়দিগকে একত্র ভোজন করাইলেন। তদবধি তাহিরপুরের রাজার সম্মান সাঁতোড় ও ভাতুড়িয়ার রাজাদের তুল্য হইল।

রাজা জগৎনারায়ণের শেষাবস্থায় আম্বেরের (জয়পুরের) রাজা মানসিংহ বাঙ্গলার সুবেদার হইয়া আসিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে বা পরে কখন কোন হিন্দু বাঙ্গলার সুবেদার হইতে পারেন নাই। রাজা কংসনারায়ণ কিছুদিন সুবেদারের কাজ চালাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি সুবেদাররূপে নিযুক্ত হন

নাই। উড়িষ্যায় পাঠানদিগকে দমন, যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যকে বিনাশ, বেণী রায়ের দস্যুতা নিবারণ এবং কোচবেহারের মহারাজের সহ সন্ধিস্থাপন, এই চারিটি মানসিংহের বাঙ্গলাদেশে প্রধান কার্য্য।

১। বাঙ্গলাদেশের অধিকাংশ পাঠান দাউদ খাঁর সহ উড়িষ্যায় গিয়া বাস করিয়াছিল। তাহারা সুযোগ পাইলেই পুনরায় বাঙ্গলাদেশ অধিকার করিতে চেষ্টা করিত। রাজা মানসিংহ বারংবার পাঠানদিগকে পরাস্ত করিয়া, তাহাদিগকে মোগল সম্রাটের অধীনতা স্বীকারে বাধ্য করিয়াছিলেন।

২। বর্ত্তমান জেলা ফরিদপুরের মহকুমা গোয়ালন্দ মধ্যে চন্দনা নামক একটি পদ্মার শাখানদী আছে। তাহার ধারে চন্দনা নামক একটি সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল। সেই গ্রামের নাম হইতেই চন্দনা নদীর নামকরণ হইয়াছে। এই স্থানের গুহবংশীয় বঙ্গজ কায়স্থেরা গৌড় বাদশাহের সরকারে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। রায় বিক্রমাদিত্য দাউদ খাঁর মন্ত্রী ছিলেন এবং সম্রাট্ আকবরের সহ যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। যখন সমস্ত বাঙ্গলা ও বেহার মোগলসম্রাটের হস্তগতপ্রায় হইল, তখন বিক্রমাদিত্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভীকাম রায় * ও কনিষ্ঠ বসন্ত রায় দণ্ডিত হইবার ভয়ে, স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া সুন্দরবনে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহারা যে স্থানে গিয়া বাস করিয়াছিলেন, সেই স্থানের নাম "যশোহর" হইয়াছিল। সেই যশোহরের নাম হইতেই আধুনিক জেলা যশো-রের নাম হইয়াছে। সেই পুরাতন যশোহর এখন জঙ্গলাবৃত। বর্ত্তমান যশোর নগরের পূর্ব্বনাম কশ্‌বা। ভীকাম রায়, বসন্ত রায় এবং বিক্রমাদিত্যের শিশু পুত্র প্রতাপাদিত্য কিছুদিন গুপ্তভাবে সেই জঙ্গল-বেষ্টিত যশোহরে বাস করিয়া মোগল রাজ্যের অবস্থা দেখিতে লাগিলেন। যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, মোগলেরা কোন অত্যাচার করিল না অথবা বিক্রমাদিত্যের পরিবারবর্গের কোন অনুসন্ধান করিল না, তখন তাঁহারা সাহস পাইয়া আত্ম-প্রকাশ করিলেন। গৌড় নগর যখন মহামারীতে বিধ্বস্ত প্রায় হইল এবং শুবে-দার মুনিম খাঁ বিনষ্ট হইলেন, ভীকাম রায় সেই গোলযোগের সময়ে নিজ

---

* হিন্দী ভাষায় ভীষ্ম শব্দের অপভ্রংশে ভীখম বলে। বোধ হয় ভীকাম শব্দটি ভীষ্ম শব্দেরই অপভ্রংশ।

রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। তখন অর্থ দ্বারা জমিদারী ক্রয় করিবার রীতি ছিল না। গুহবংশীয়েরা বাহুবলে তিন চারি পরগণা দখল করিলেন। ভীকাম রায় ও বসন্ত রায় উভয়েই বিদ্বান্ ও বীর পুরুষ ছিলেন। প্রতাপাদিত্য তাঁহাদের অপেক্ষাও সমধিক বীরত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রতাপাদিত্যের বিদ্যা অতি অল্প ছিল এবং তিনি নিতান্ত মাতাল ও দুর্ব্বৃত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনিই নিবিড় অরণ্য মধ্যে শিলা দেবীর বিগ্রহ আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং সেই কালীমূর্ত্তি আনিয়া যশোহরে স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি সেই শিলা দেবীর সম্মুখে নরবলি দিতেন। তিনি যুদ্ধকালে যেমন বীর ছিলেন, অন্য সময়ে তেমনি মাতাল ও লম্পট ছিলেন। কিন্তু ভীকাম রায়ের জীবমানে তাঁহার দোষ ও গুণ তত বেশী প্রকাশ হয় নাই।

প্রতাপাদিত্যের যখন সাতাইশ বৎসর বয়স, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ভীকাম রায়ের নিঃসন্তানাবস্থায় পরলোক হইল। প্রতাপাদিত্য তখন স্বয়ং রাজগদী দাবী করিলেন। বসন্ত রায় কহিলেন "ভ্রাতা বিদ্যমানে ভ্রাতৃপুত্র দায়াদ হয় না, সুতরাং প্রতাপ আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র হইলেও রাজগদী তাহার প্রাপ্য নহে, আমার প্রাপ্য"। এই উপলক্ষে উভয়ের মনান্তর হইল। কিন্তু প্রকাশ্য কোন বিবাদ হইল না। তখনও উভয়েই একান্নে এক বাড়ীতেই ছিলেন। প্রতাপ একদিবস রাত্রিতে কতিপয় দুষ্ট অনুচর সহ খুড়ার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে সবংশে নিপাত করিলেন। কেবল বসন্ত রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র কাঁচুরায়কে প্রতাপাদিত্যের পত্নী রক্ষা করিয়া তাহার মাতুলালয়ে পাঠাইয়াছিলেন।

প্রতাপাদিত্য সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র কর্ত্তা হইয়া দিগ্বিজয়ে ব্রতী হইলেন। তিনি পদ্মা, মেঘনা ও সমুদ্র পর্য্যন্ত সমস্ত জমিদারগণকে নিজের অধীন ও করপ্রদ করিয়াছিলেন। পালে পালে হিন্দু ও মুসলমানগণ তাঁহার সহ যোগ দিতে লাগিল। প্রতাপ যদি সচ্চরিত্র হইতেন, তবে বোধ হয় স্বাধীন রাজা হইয়া থাকিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্রদোষে সমস্ত সদ্বংশজাত সৎ লোকেরা তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করিতে লাগিল। সমস্ত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেরা গুপ্তভাবে তাঁহার বিপক্ষ হইল। এমন কি, তাঁহার নিজের স্ত্রীপুত্রও তাঁহার মঙ্গল কামনা করিতেন না। প্রতাপ অতিশয় দাতা ছিলেন। অর্থলোভে অতি নীচজাতীয় নীচ প্রকৃতির লোকেরা তাঁহার একান্ত অনুগত ছিল। তাহাদের সাহায্যে

তিনি ব্যাঘ্রের ন্যায় রাজত্ব করিতেন। তিনি "সুন্দর বনের বাঘ" নামেই প্রসিদ্ধ। তিনি অতীব তেজস্বী ছিলেন। তিনি যাহাকে যাহা আদেশ করিতেন, সে তৎক্ষণাৎ তাহাই করিতে বাধ্য হইত। মনে মনে তাঁহার প্রতি লোকের যত কেন অশ্রদ্ধা থাকুক না, কার্য্যতঃ কেহ তাঁহার কোন কথায় প্রতিবাদ করিতে না এবং তাঁহার কোন কার্য্যে বাধা দিত না। লোক-পরিচালকের পক্ষে এইটি সর্ব্বপ্রধান গুণ। এই গুণ-বিশিষ্ট লোকের অন্য সহস্রদোষ থাকিলেও তাহারা যুদ্ধে ও সামাজিক বিবাদে জয়ী হইয়া থাকে। প্রতাপাদিত্যেরও তাহাই হইতেছিল। প্রতাপ "সার্ব্বভৌম মহারাজ" উপাধি গ্রহণ করিয়া নিজ নামে মুদ্রা ছাপিয়াছিলেন। তিনি ক্রমে তিন দল মোগল সেনা পরাজয় করিয়া আঠার বৎসর কাল স্বাধীন ছিলেন।

কায়স্থজাতির ইতিহাস।

ভগবান্ পরশুরাম তৎকাল-জীবিত সমস্ত ক্ষত্রিয়দিগকে বিনষ্ট বা জাতিভ্রষ্ট করিয়া পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। তখন সমস্ত মহর্ষিগণ তাঁহাকে ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন। ভৃগুরাম কহিলেন "বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয়-পত্নী এখন গর্ভবতী আছে। স্ত্রীবধ-পাপাশঙ্কায় আমি তাহাদের গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট করিতে পারি নাই। তাহাদের সন্তান জন্মিলে সমস্ত পুত্রসন্তান নষ্ট করিয়া তাহার পর আমি ক্রোধ পরিত্যাগ করিব। এক্ষণে ক্রোধ ত্যাগ করিলে, নব-প্রসূত ক্ষত্রপুত্রগণ দ্বারা ক্ষত্রিয় বংশ বিদ্যমান থাকিবে, সুতরাং আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে।" ঋষিগণ কহিলেন "আপনি বহুল ক্ষত্রিয়গণকে জাতিচ্যুত করিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছেন। গর্ভস্থ ক্ষত্রিয়সন্তানদিগকে তদ্রূপ শূদ্রত্বে পাতিত করিয়া তাহাদের প্রাণ রক্ষা করুন এবং ক্রোধাগ্নি ত্যাগ করুন।" পরশুরাম সম্মত হইলেন। তখন ভৃগুরাম ঋষিগণ সহকারে, বিধান করিলেন যে "বর্ত্তমান গর্ভবতী ক্ষত্রপত্নীদের যে সন্তান হইবে, তাহারা শূদ্র হইবে। আর বিধবা ক্ষত্র-পত্নীদের গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে যে সমস্ত সন্তান হইবে, তাহারাই ক্ষত্রিয় জাতি গণ্য হইবে। তদনুসারে সেই গুর্ব্বিণী ক্ষত্রিয়াদের সন্তানেরা শূদ্র হইল। তাহারা গর্ভে ছিল, এইজন্য তাহারা কায়স্থ (কায়+স্থা+ড) জাতি নামে অভিহিত হইল।

কায়স্থেরা বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় সন্তান, আর তাহারা যে পাপে পতিত হইয়াছিল, তাহা তাহাদের স্বকৃত নহে। এইজন্য তাহারা সকল শূদ্র হইতে শ্রেষ্ঠ গণ্য হইত।

জাতিমালায় কায়স্থজাতির এই ইতিহাস পাওয়া যায়। অন্য কোন সংস্কৃত পুস্তকে এই কায়স্থ জাতির কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু "কায়স্থ" শব্দটি বহু গ্রন্থে অন্যান্য অর্থে ব্যবহৃত দেখা যায়। কায়স্থ শব্দের মূলার্থ "শরীর-স্থিত"। চিকিৎসা শাস্ত্রে এবং গীতাতে সর্ব্বত্রই এই মূলার্থে কায়স্থ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

যথা (১) কায়স্থং নিগূঢ়ব্যাধিং (শরীরস্থিত গুপ্তরোগ)।

(২) কায়স্থাঃ কৃমিনিকরাঃ—(শরীরস্থিত চর্ম্মকৃমিসমূহ)।

গীতাতে (৩) কায়স্থোঽপি ন কায়স্থঃ—(শরীরের মধ্যে থাকিয়াও শরীরের অংশ নহে)।

হিন্দু রাজাদিগের গুপ্ত মন্ত্রী বা গুপ্তচরদিগকেও কায়স্থ বলা যাইত। তাহারা যে রাজার চাকর, তাহা কেহ জানিতে পারিত না। তাহারা রাজ্য মধ্যে চোর, দস্যু এবং রাজবিপক্ষ লোকদের কার্য্য, গতিবিধি এবং গুপ্তস্থান অনুসন্ধান করিত। এই অর্থে রাজতরঙ্গিণী ও রাজনীতিতে অনেক স্থলে "কায়স্থ" শব্দ দেখা যায়। তাহা কেবল চাকরীর উপাধি মাত্র, কোন জাতিবিশেষ-বোধক নহে। কাশ্মীরে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যজাতীয় লোকের বসতি ছিল না। রাজতরঙ্গিণীর কথিত কায়স্থ পদবীর লোকেরা সকলেই জাতিতে ব্রাহ্মণ।

আধুনিক কায়স্থেরা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় প্রতিপাদন করিবার জন্য নানাবিধ কৃত্রিম শ্লোক প্রস্তুত করিয়া তাহা পুরাণাদি গ্রন্থে ভরতি করিয়া ছাপা করিয়া থাকে। অনেক স্থলে যথার্থ শ্লোকের মিথ্যা অর্থ করিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করে। তাহা ত্যাগ করিলে দেখা যায় যে, কায়স্থ জাতির কোন উল্লেখ জাতি-মালা ভিন্ন অন্য কোন পুরাতন পুস্তকে নাই। তাহা হইতে অনুমান হয় যে, হিন্দু রাজত্বকালে কায়স্থজাতি কুত্রাপি প্রতিভা পায় নাই। বরং অনেকে অনুমান করেন যে, কায়স্থ জাতি অন্যান্য শূদ্রগণ সহ মিলিত হইয়া পৃথক্ অস্তিত্বশূন্য হইয়া-ছিল। কিন্তু আমি এই মতটি যুক্তিসঙ্গত বোধ করি না। কারণ, যাহার আসল নাই, তাহার নকল হইতে পারে না। সুতরাং প্রকৃত কায়স্থজাতি না থাকিলে কদাচ কৃত্রিম কায়স্থ হইত না। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে শ্রেণী উল্লেখের রীতি ছিল না। তজ্জন্য প্রাচীন গ্রন্থে কেবল শূদ্র শব্দ দেখা যায়। তাহারা কায়স্থ, কি অন্য-

জাতীয় শূদ্র তাহা প্রকাশ নাই। পাঠান রাজত্বেই বর্ত্তমান কায়স্থজাতির উৎপত্তি বা উন্নতি হইয়াছে। মুসলমান রাজত্ব স্থাপিত হইলে পারসী আরবী, প্রভৃতি যাবনিক ভাষা রাজভাষা হইল। উচ্চজাতীয় হিন্দুরা বহুদিন পর্য্যন্ত সেই যাবনিক ভাষা পাঠ করিত না। সেই সুযোগে কতকটি শূদ্র পারসী পড়িয়া পাঠানদিগের চাকরী লইয়াছিল। তাহারা অজ্ঞ পাঠানদিগকে ঠকাইয়া এবং প্রজাপীড়ন, উৎকোচ গ্রহণাদি উপায়ে প্রচুর উপার্জ্জন করিত। তাহারা আপনাদিগকে কায়েত বলিয়া পরিচয় দিত। কায়েত শব্দ বোধ হয় কায়স্থ শব্দেরই অপভ্রংশ। কিন্তু কায়েত শব্দ কোন জাতিবিশেষে আবদ্ধ ছিল না। যে কোন জাতীয় হউক, সমস্ত শিক্ষিত শূদ্রই কায়েত উপাধিতে অধিকারী ছিল। ইহাদের নামের শেষে প্রায়ই "লাল" শব্দ যুক্ত থাকিত, এইজন্য পাঠানেরা ইহাদিগকে লালা লোক বলিত। সেই কায়েত বা লালাগণ কিছু অর্থব্যয় করিয়া কোন পুরাতন কায়স্থ-পরিবার সহ দুই একটি বিবাহ আদান প্রদান করিলেই, তাহারা কায়স্থ বলিয়া গণ্য হইত। পাঠানদিগের অত্যাচার হেতু লোকে তাহাদিগকে যম রাজা বলিত এবং তাহাদের শূদ্র কর্ম্মচারীদিগকে চিত্রগুপ্ত বলিত। তাহা হইতেই আধুনিক কায়স্থেরা আপনাদিগকে "চিত্রগুপ্তের সন্তান" বলিয়া পরিচয় দেয়। প্রকৃত পক্ষে চিত্রগুপ্ত কোন ব্যক্তি নহে। মনের গুপ্ত পাপকে রূপক করিয়া চিত্রগুপ্ত বলে। তাহার সন্তান হইতে পারে না। এখন চিত্রগুপ্ত সম্বন্ধে যে সকল শ্লোক গ্রন্থাদিতে দেখা যায়, তাহা সমস্তই কৃত্রিম এবং প্রক্ষিপ্ত মাত্র।

পশ্চিম ভারতের কায়েতদিগের দেখাদেখি বাঙ্গলা দেশের উন্নত শূদ্রেরাও কায়েত উপাধি ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা পূর্ব্বে আপনাদিগকে চিত্রগুপ্তের সন্তান বলিত না। যে সকল পশ্চিমা শূদ্র শ্রোত্রিয়দের সেবক রূপে আসিয়া বাঙ্গলাদেশে বাস করিয়াছিল, তাহাদের সন্তানেরা অধিকাংশই কায়েত উপাধি ধারণ করিল। তদ্ভিন্ন নানা শ্রেণীর শূদ্রগণ মধ্যে যাহারা বিদ্যায় বা সঙ্গতিতে উন্নতিলাভ করিয়াছে, তাহারাই কায়স্থ জাতিতে প্রবেশ করিয়াছে। এইরূপে অধিকাংশ উন্নত শূদ্র কায়স্থ হওয়ায় কাজেই অন্যান্য শূদ্রগণ অপেক্ষা কায়স্থ-জাতির বিদ্যা, বুদ্ধি এবং অবস্থা সমুন্নত হইয়াছে। এখানে ইহা প্রকাশ করা আবশ্যক যে, শ্রোত্রিয়দের সেবক ও নাবিকরূপে যে সকল শূদ্র কানোজ হইতে বাঙ্গলা দেশে আসিয়াছিল, তাহারা কায়স্থ ছিল কি না, তাহা কুত্রাপি প্রকাশ নাই

সমস্ত কুলশাস্ত্রে তাহাদিগকে কেবল শূদ্র বলিয়া উক্তি আছে। কোন্ শ্রেণীর শূদ্র, তাহা ব্যক্ত নাই। কেননা প্রাচীনকালে কোন জাতির শ্রেণীর উল্লেখ করিয়া লিখিবার রীতি ছিল না। কোন ব্রাহ্মণেরও কুত্রাপি "কোন্ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ" তাহা প্রকাশ নাই। তজ্জন্য ব্রাহ্মণদের অনুচরদিগকেও কেবল শূদ্র বলিয়া লেখা হইয়াছে। সেই উক্তি হইতে, তাহারা কায়স্থ ছিল কি না, ইহা নিরূপণ করা যায় না।

বাঙ্গালী কায়স্থদের উন্নতি।

কানোজীয় ব্রাহ্মণেরা বাঙ্গালা দেশের শূদ্রগণ অপেক্ষা আপনাদের অনুচর পশ্চিমা শূদ্রদিগকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন। তাঁহাদের অনুকরণে গৌড়ের বৈদ্য রাজারাও সেই পশ্চিমা শূদ্রদিগকে অপর শূদ্রাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদ দিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের বৌদ্ধরাজা ধর্ম্মপাল, হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শূদ্র শ্রেণীতে গণ্য হইয়াছিলেন। তৎপুত্র দেবপাল পশ্চিমা শূদ্রদিগকে সমধিক সম্ভ্রান্ত দেখিয়া তাহাদের দলে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তিনি গৌড় নগর হইতে কতকটি পশ্চিমা শূদ্র আনিয়া বঙ্গদেশে স্থাপন করিয়াছিলেন। আবার তাহাদের ঘরে নিজ পুত্র কন্যার বিবাহ দিয়া তাহাদের সমাজে মিলিত হইয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে উচ্চ রাজকীয় চাকরী এবং সম্পত্তি দিয়া তাহাদের সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। আধুনিক বঙ্গজ কায়স্থগণ তাহাদেরই সন্তান বলিয়া পরিচিত। ইহাই বাঙ্গালী কায়স্থদের প্রথম উন্নতি।

সম্রাট্ বল্লাল সেন কতিপয় পশ্চিমা শূদ্রকে রাজকীয় পদ দিয়াছিলেন। দত্ত-গোষ্ঠীর একজনকে সেনাপতি করিয়াছিলেন। পরে কুলমর্য্যাদা স্থাপন সময়ে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যের পরেই পশ্চিমা শূদ্রগণকে স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাই বাঙ্গালী কায়স্থদের উন্নতির দ্বিতীয় সিঁড়ি।

বল্লালের কায়স্থজাতীয়া এক উপপত্নী-জাত পুত্র কালুরায়কে তিনি চন্দ্রদ্বীপে করদ রাজা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পাঠান কর্ত্তৃক বৈদ্যরাজ পাটনির্ম্মূল হইলেও কালুরায়ের সন্তানেরা চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করিতেছিল। তাহারা যবন-রাজধানী গৌড় নগর হইতে বহুদূরে ছিল। এজন্য তাহারা পাঠানদিগের সম্পূর্ণ অধীন ও আয়ত্ত হয় নাই। তাহারা কখন নবাবকে কিছু কিছু কর দিত, কখন বা দিত না।

নিজ চত্বরে তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। কিন্তু কখন নিজ নামে মুদ্রা ছাপিত না। এই রাজবংশীয়েরা অতিশয় বিদ্যোৎসাহী ও দাতা ছিলেন। তাঁহারা বহুসংখ্যক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ প্রতিপালন করিতেন। বাকলা চন্দ্রদ্বীপে এখনও বহুল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেখা যায়। চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশই তাহার আদি কারণ। কালুরায় ও তদ্বংশীয়েরা বঙ্গজ কায়স্থ-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। কায়স্থ জাতির মধ্যে ইঁহারাই প্রথম রাজা এজন্য ইঁহারা কায়স্থ সমাজে বিশেষ মান্য ছিলেন। ইহাই কায়স্থদের তৃতীয়া উন্নতি।

চন্দ্রদ্বীপের রাজা দনুজ রায় নিঃসন্তান গতাসু হইলে তাঁহার ভাগিনেয় (মতান্তরে তাঁহার দৌহিত্র) পরমানন্দ বসু উত্তরাধিকারী হইয়া "রায়" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরমানন্দ মুখ্যিরাজ কুলীন কায়স্থ-সন্তান এবং তাহার মাতামহ-কুল বাঙ্গলা দেশের সম্রাট্-বংশজাত। এইজন্য পরমানন্দের বংশীয়েরা সকল কায়স্থের অগ্রগণ্য সমাজপতি ছিল। এই বংশীয় রাজা রামচন্দ্র রায়ের সহ রাজা প্রতাপাদিত্য কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। এই বংশ এখন বিলুপ্ত হইয়াছে।

এদিকে কাঁচু রায় বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সম্রাট্ জাহাঁগীরের নিকট প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে অভিবাদ করিলেন। সম্রাট্ যে চারি কার্য্য সাধন জন্য রাজা মানসিংহকে বাঙ্গলায় পাঠাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রতাপাদিত্যকে দমন করা দ্বিতীয় কার্য্য। মানসিংহ দূত দ্বারা প্রস্তাব করিলেন যে "প্রতাপ অর্দ্ধরাজত্ব কাঁচুরায়কে ছাড়িয়া দেন এবং সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়া জমিদার রূপে অর্দ্ধরাজ্য ভোগ করেন।" প্রতাপ সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করায় যুদ্ধ হইল। প্রতাপাদিত্য অসাধারণ বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াও পরাস্ত হইলেন। অমনি সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোকেরা কাঁচুরায়ের সহ যোগ দিল। অবশিষ্ট নীচ জাতীয় লোকেরা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিল। প্রতাপ স্মুন্দরবন মধ্যে পলায়ন করিলেন। উদয়পুরের রাণা প্রতাপ সিংহের ন্যায়, বঙ্গের প্রতাপও দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালাইয়া অবশেষে নিজরাজ্য উদ্ধার করিতে পারিতেন ; কিন্তু রাণাদিগের অনুচরেরা যেরূপ একান্ত রাজভক্ত ছিল, প্রতাপের দুশ্চরিত্রতা হেতু তদীয় অনুচরেরা তাঁহার তেমন ভক্ত ছিল না। বরং তাঁহার জ্ঞাতি শত্রুরা তাঁহাকে বন্দী করিয়া দিল। রাজা মানসিংহ প্রতাপকে লৌহ পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া দিল্লী লইয়া যাইতেছিলেন ; পথিমধ্যে ৪৯ বৎসর বয়সে প্রতাপাদিত্য বীরলীলা সংবরণ করিলেন।

চন্দনায় গুহগোষ্ঠী সাঁতোড়ের রাজাদের প্রজা ও কর্ম্মচারী ছিলেন। এই বংশীয় রামচন্দ্র গুহকে সাতোড়রাজ (চাঁদ গোপাল) গোপালচন্দ্র খাস বিশ্বাস বা সদর নায়েব নিযুক্ত করিয়া গৌড়ে পাঠাইয়াছিলেন। তাহাতে রামচন্দ্র গৌড় বাদশাহের নিকট পরিচিত ও প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। তৎপুত্র ভবানন্দ মজুমদার। তাঁহার পুত্র রাজা ভীকাম রায়, রায় বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় গৌড় বাদশাহের সরকারে অতি সম্ভ্রান্ত রাজকীয় মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন। ভীকাম রায় তিন পরগণার রাজা হইলেও তাঁহার বাড়ী সাঁতোড়ের জমিদারী মধ্যে চন্দনা গ্রামে ছিল। গৌড় বাদশাঃ সলিমাম চন্দনা তালুক ভীকাম রায়কে জমিদারী স্বত্বে দিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। কিন্তু ভীকাম রায় প্রতিপালক ব্রাহ্মণ সাঁতোড়ের রাজার ক্ষতি করিয়া নিজ স্বার্থ সিদ্ধি করিতে সম্মত হন নাই। প্রতাপাদিত্য সেই বংশজাত। এই গুহবংশ এবং দিনাজপুরের রাজবংশ প্রায় সমকালীন উন্নত হইয়াছিল। বাঙ্গালী কায়স্থ মধ্যে উপরি উক্ত তিন ঘরই সর্ব্বাপেক্ষা বুনিয়াদি। তন্মধ্যে প্রথম দুইটি বিলুপ্ত হইয়াছে। সেই জন্য দিনাজপুরের রাজবংশই কায়স্থ জাতি মধ্যে এক্ষণে সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত। প্রতাপাদিত্য সদভিপ্রায়ে রামচন্দ্র রায়ের সহ কন্যার বিবাহ দেন নাই। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, বিবাহের রাত্রে বাসর ঘরেই জামাতাকে হত্যা করিয়া তাহার রাজ্য আত্মসাৎ করিবেন এবং নিজেই কায়স্থ সমাজের সমাজপতি হইবেন। প্রতাপের পত্নী স্বামীর দুরভিসন্ধি জানিতে পারিয়া জামাতাকে রমণীবেশে পলায়নের সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। প্রতাপ ঘাতুকগণ সহ বাসর ঘরে গিয়া জামাতাকে না দেখিয়া, কন্যার চক্রান্তে জামাতা পলাইয়াছে মনে করিয়া, সেই কন্যাকে হত্যা করিয়াছিলেন।

প্রতাপ যখন "মহারাজ" উপাধি গ্রহণ করেন, তখন তিনি পুরোহিতকে বলিলেন "আমি দেশের রাজা, আমি কাহারও দাস নহি। আমার যজ্ঞ-সংকল্প-কালে 'প্রতাপাদিত্য দেবস্য' বলিয়া সংকল্প করাইতে হইবে।" কোন ব্রাহ্মণ তাহাতে সম্মত না হওয়ায় প্রতাপ সমস্ত সমাগত ব্রাহ্মণদিগকে স্নানাহার বর্জ্জিত করিয়া দুইদিন আটক রাখিয়াছিলেন। তাঁহার মাতা, পত্নী, জ্ঞাতি, কুটুম্বগণ প্রতিবাদ করায় তিনি তাহাদিগকে বেত্রাঘাত করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। তৃতীয় দিন একজন বৈদিক ব্রাহ্মণ, দেবস্য বা দাসস্য না বলিয়া "রায়স্য" বলিয়া প্রতাপের সংকল্প দিতে

চাহিল। প্রতাপ তাহাতেই সম্মত হইয়া রুদ্ধ বিপ্রগণকে মুক্তি দিলেন। এই অবধি তিনি বৈদিক ব্রাহ্মণের ভক্ত হইয়াছিলেন। তিনি কোন শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে কোন বৃত্তি বা ব্রহ্মত্র দিতেন না।

প্রতাপ নিজ সহোদরা ভগিনীর সপত্নী দয়াময়ী দাসীকে পরম সুন্দরী নবযুবতী বিধবা দেখিয়া তাহাকে বলাৎকার করিয়াছিলেন এবং তাহাকে নিকা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। পুরোহিত মন্ত্র পড়াইতে অস্বীকার করায়, প্রতাপ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন "তোমরা সংকল্প দিতে বল কায়স্থেরা শূদ্র, কিন্তু বিবাহ দিতে ব্রাহ্মণের ব্যবস্থা কায়স্থে খাটাইতে চাও কেন? বিধবাবিবাহ এবং [illegible]নীর সতীনকে বিবাহ করা শূদ্রের পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। এই বিবাহ তোমায় অবশ্যই দিতে হইবে। নতুবা তোমাকে কুকুরের কাণ চাটাইব।" প্রতাপ পুরোহিতকে আটক রাখিলেন। তাঁহার জ্ঞাতি কুটুম্ব সকলেই অসন্তুষ্ট হইল, কিন্তু ভয়ে কেহ প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করিতে পারিল না। এদিকে দয়াময়ী লোকগঞ্জনা সহ্য করিতে না পারিয়া আত্ম-হত্যা করিল। কাজেই পুরোহিত মুক্তি পাইলেন। কিন্তু দয়াময়ীকে যাহারা নিন্দা করিয়াছিল, প্রতাপ তাহাদিগকে কঠিন দণ্ড দিয়াছিলেন। এই সকল কার্য্য দ্বারা প্রতাপাদিত্য সমস্ত সৎ লোকের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন।

কবিবর ভারতচন্দ্র রায়—"বিদ্যাসুন্দর" কাব্যের প্রথমে লিখিয়াছেন যে—

"যশোর নগরে ধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম,
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।

* * *

বরপুত্র ভবানীর, প্রিয় পাত্র পৃথিবীর,
যুদ্ধ কালে সেনাপতি কালী।"

আবার মানসিংহের সহ প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধকালে তিনিই লিখিয়াছেন যে—

"পাত্র মিত্র সবে গিয়া বিপক্ষে মিলিল।

* * *

বিমুখী অভয়া, কেবা করে দয়া, প্রতাপ আদিত্য হারে।"

এই বিরুদ্ধ উক্তির কারণ কি, তাহা গ্রন্থে না থাকায় কাব্যে দোষ হইয়াছে। অথচ কথাটি প্রকৃত। প্রতাপ প্রথমে সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন, পরে নানারূপ অত্যাচার ও কদাচার দ্বারা সমস্ত সজ্জনের অপ্রিয়, সুতরাং দেবতারও অপ্রিয়

হইয়াছিলেন। কতকগুলি বাগ্‌দি, চণ্ডাল ও নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান তাঁহার একান্ত অনুগত ছিল। প্রতাপ তাহাদের সাহায্যে নিজ বাহুবলে সকলকে বাধ্য রাখিয়াছিলেন। মানসিংহের ন্যায় প্রবল বিপক্ষ উপস্থিত হইলে অমনি সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোক গিয়া বিপক্ষে যোগ দিয়াছিল।

মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের সমগ্র রাজত্ব কাঁচু রায়কে দেন নাই। ভীকাম রায়ের মৃত্যুকালে তাঁহাদের যে জমিদারী ও যে মালগুজারী ছিল, তাহাই কাঁচু-রায়কে দিয়াছিলেন। মানসিংহ যশোহরের শিলাদেবী ও তাঁহার পুরোহিতগণকে সপরিবারে লইয়া গিয়া নিজ রাজ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন। অদ্যাপি আম্বের নগরে সেই শিলাদেবী ও তৎপুরোহিতগণের বংশধরগণ বিদ্যমান আছে।

যশোহরের যুদ্ধ সময়ে ভবানন্দ মজুমদার নামক একজন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ রাজা মানসিংহের রসদ যোগাইয়া বাগোয়ান পরগণার জমিদারী পুরস্কার পাইয়াছিলেন। নদীয়ার রাজবংশ তাঁহারই সন্তান। বাঙ্গলাদেশে সংস্কৃত বিদ্যার উন্নতি সাধনে এই রাজবংশ অতি প্রসিদ্ধ। *

(৩) বেণীরায়ের ডাকাইতী নিবারণ মানসিংহের তৃতীয় কার্য্য। বেণী-মাধব রায় একজন কুলীন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। বোধ হয় সংস্কৃত ভাষাতেও তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল। সেই জন্যই পরে তাঁহার "পণ্ডিত ডাকাইত" নাম হইয়া-ছিল। তাঁহার এক পত্নী পরম সুন্দরী ছিল। একজন মুসলমান সর্দ্দার সেই সুন্দরী অপহরণ করায়, বেণীরায় সংসার ত্যাগ করিয়া দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া-ছিলেন। তিনি নানাজাতীয় কতকগুলি হিন্দু চেলা যোটাইয়া একদল ডাকাইত বা সৈন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি চলনবিল মধ্যে একটি দ্বীপে সেই দল লইয়া বাস করিতেন। এই স্থলে তিনি "যবনমর্দ্দিনী" নামে এক কালীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি নানা দেশ হইতে মুসলমান ধরিয়া আনিয়া সেই কালীর সম্মুখে বলিদান করতঃ, তাহাদের দেহ চলনবিলে ফেলিয়া দিতেন। কেবল নিহত যবনগণের মস্তকগুলি তিন্দি পুঞ্জ করিয়া রাখিতেন। তাঁহার বাস-দ্বীপকে অদ্যাপি "পণ্ডিত ডাকাইতের ভিটা" বলে। মুসলমানেরা ঐ স্থানকে

* প্রতাপাদিত্য নাটকে ভবানন্দ মজুমদারকে প্রতাপাদিত্যের দেওয়ান এবং বিশ্বাসঘাতক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এরূপ জঘন্য মিথ্যা বর্ণনা দ্বারা নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ রাজবংশের কলঙ্ক করা অতীব দুষ্য।

"সয়তানের ভিটা" বলিত। পূর্ব্বে শামা রামা যেরূপ দৌরাত্ম্য করিত, মুসলমান-দের উপর বেণী রায়ের দৌরাত্ম্য তদপেক্ষা বেশী ভিন্ন কম ছিল না। শামা রামা প্রকৃত ডাকাইত ছিল, বেণীরায় তদ্রূপ অর্থলিপ্সু ডাকাইত ছিলেন না। হিন্দু-দের প্রতি তাঁহার বিশেষ অত্যাচার ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কোন হিন্দু জমিদার কখন বেণীরায়কে দমনের জন্য চেষ্টা করেন নাই। দরিদ্র হিন্দুর তিনি কখন কোন অনিষ্ট করেন নাই, বরং অনেক সময়ে তাহাদের উপকার করিতেন। ধনী হিন্দুদের তিনি ধন হরণ করিতেন বটে, কিন্তু অনাবশ্যক প্রাণ হরণ করিতেন না। তিনি কখন গৃহদাহ প্রভৃতি অনর্থক অনিষ্ট করিতেন না। তিনি কোন স্ত্রীলোক বা বালক হরণ করিতেন না। এমন কি, স্ত্রীলোকের ও বালকের গায়ে মূল্যবান্ অলঙ্কার দেখিয়াও তাহা অপহরণ করিতেন না। তিনি স্পষ্ট বলিতেন যে "আমি হিন্দু ধনীদিগের নিকট সাহায্য লই মাত্র। কিন্তু সাহায্য নাম করিয়া প্রকাশ্যরূপে লইলে সাহায্যকারিগণ মুসলমান কর্তৃক দণ্ডিত হইবে, এই ভয়ে আমি লুঠ করিয়া লইয়া থাকি।" বেণীরায়ের আবির্ভাব দেখিয়া, বাড়ীর সম্মুখে কিছু অর্থ, খাদ্য ও বস্ত্র রাখিয়া দিলে বেণীরায়ের দল আর সেই গৃহস্থের বাড়ীতে প্রবেশ করিত না। তজ্জন্য হিন্দুরা বেণীরায়ের আগমনে বিশেষ ভীত হইত না। কথিত আছে যে, রাজীব শাহার বাড়ী বিবাহ হইতেছিল, এমন সময় বেণীরায় সদলে উপস্থিত হইলেন। রাজীব সকলকে অভয় দিয়া একাকী বেণীরায়ের নিকট গিয়া প্রণাম করিয়া গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল, "বাবা ঠাকুর! আপন-কার প্রণামী অগ্রেই পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছি।" বেণীরায় সেই প্রণামী লইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া আসিলেন; বিবাহকার্য্যের কোনই বিঘ্ন হইল না। বেণীরায় সাঁতোড়ের সান্যালদিগের কুটুম্ব ছিলেন। তজ্জন্য সাঁতোড়ের সান্যাল ও কায়েতগণ বহুসংখ্যক তাঁহার দলে যোগ দিয়াছিল। তন্মধ্যে যুগলকিশোর সান্যাল এবং কায়স্থ চণ্ডীপ্রসাদ রায় সর্ব্বপ্রধান।

মানসিংহ যখন পদ্মার দক্ষিণ পারে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার ভ্রাতা ঠাকুর ভানুসিংহ বেণীরায়ের বিনাশার্থ সসৈন্যে সাঁতোড়ে উপস্থিত হইলেন। সাঁতোড়, ভাদুড়িয়া ও নিকটবর্ত্তী অন্যান্য পরগণার জমিদারগণ তলপ মত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। সমস্ত জমিদারই হিন্দু ছিলেন। তাঁহারা কহিলেন "বেণীরায়কে সদ্ভাবে বশীভূত করাই সহজ এবং হিতকর। বলপূর্ব্বক বিনাশ

করিতে চেষ্টা করিলে বহুলোকের অনিষ্ট হইবে এবং উদ্দেশ্য সহসা সফল হইবে না।" বেণীরায়ের বৃত্তান্ত শুনিয়া ভানুসিংহের ভক্তি হইল। তিনি তাঁহাকে সদ্ভাবে বশ করাই সংকল্প করিলেন। ঠাকুর ভানুসিংহ দূত দ্বারা বেণীরায়কে জানাইলেন যে "পাঠান রাজত্বসময়ে মুসলমানেরা বহু অত্যাচার করিয়াছে। আপনিও তদনুরূপ প্রতিফল দিয়াছেন। এখন মোগল সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে। ইহারা হিন্দুদিগের প্রতি সম্পূর্ণ অনুকূল। তীর্থরাজ প্রয়াগে মুকুন্দরাম ব্রহ্মচারী তপস্যা করিতেন। হঠাৎ তাঁহার মনে বিষয়বাসনা উদ্রেক হওয়ায় তিনি আত্ম-গ্লানিতে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে কামনা-কুণ্ডে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনিই জন্মান্তরে সম্রাট্‌ আকবররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার সাম্রাজ্যে মুসলমান-গণ আর হিন্দুর প্রতি অত্যাচার করিতে পারে না। বরং মুসলমান অপেক্ষা এখন হিন্দুদেরই প্রাধান্য হইতেছে। তাঁহার সহ আপনকার শত্রুতা করা অনুচিত। বিশেষতঃ আপনি সুপণ্ডিত কুলীন ব্রাহ্মণ। আপনি সহজেই বুঝিতে পারেন যে, একজন মুসলমানের অপরাধে অন্যান্য মুসলমানদিগকে হিংসা করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ। আপনি ব্রাহ্মণ গুরু, আমি ক্ষত্রিয়। আমি সহসা আপনকার অনিষ্ট করিতে চাই না। আপনি শান্তি গ্রহণ করিলে, আমি আপনাকে সমুচিত পুরস্কার দিতে সম্মত আছি।" বেণীরায় সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন। ভানুসিংহ বেণীরায়কে এক পরগণা জমিদারী রূপে এবং ১২০০/ বিঘা জমি তাঁহার কালীদেবীর দেবত্র রূপে দিতে স্বীকার করিয়া রাজা মানসিংহের দ্বারা সম্রাটের সনন্দ আনাইয়া দিলেন। বেণীরায় তদবধি শান্ত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলেন। বেণীরায়ের অনুরোধে ভানুসিংহ যুগলকিশোর সান্যাল এবং চণ্ডীপ্রসাদ রায়কেও জমিদারী দিয়াছিলেন আর চণ্ডীরায়কে নবাবী দর্বারে পেস্কার নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

বেণীরায় নিঃসন্তান মৃত হইলে, তাঁহার প্রধান চেলা যুগলকিশোর সান্যাল সেই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন। তাঁহার সন্তানেরাই জেলা বগুড়ার সের-পুরের সান্যাল নামে অদ্যাপি জমিদারী ভোগ করিতেছেন। যবনমর্দ্দিনী কালী-মূর্ত্তিও সেরপুরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরে ভূমিকম্পে সেই মূর্ত্তি নষ্ট হইয়াছে। বেণীরায়ের দ্বিতীয় শিষ্য চণ্ডীপ্রসাদ রায়ও জমিদারী পাইয়া পাবনা জেলার অন্ত-র্গত পোতাজিয়া গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহারই সন্তানেরা পোতাজিয়ার রায়। ইহারাই বারেন্দ্র কায়স্থ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন জমিদার এবং সম্মানিত।

যুগলকিশোর ও চণ্ডীপ্রসাদকে পাঠানেরা "কাল জোগ্‌লা" ও "কাল চণ্ডিয়া" বলিত। আর যে সকল কুলীন ব্রাহ্মণ বেণীরায়ের দলে ছিলেন, তাঁহারা এবং তৎসংস্পৃষ্ট কুলীনেরা "বেণী পঠীর কুলীন" নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সন্তানেরা অদ্যাপি বেণীপঠীর কুলীন নামেই পরিচিত। পণ্ডিত ডাকাইত ও তাঁহার চেলাদিগের বীরত্ব, চতুরতা, দয়া এবং প্রতিহিংসা-প্রকাশক বহু গল্প এখনও রাজসাহী, পাবনা এবং বগুড়া জেলায় শুনিতে পাওয়া যায়। তাহার সহ তুলনায় ইংরেজী "রবিন হুডের কার্য্যকলাপ" তুচ্ছ হইয়া পড়ে। সেই সকল গল্প সংগ্রহ করিলে একখানি বৃহৎ পুস্তক হইতে পারে। এখন বাঙ্গালীরা যেমন ঐক্য-হীন, পূর্ব্বে বোধ হয় তদ্রূপ ছিল না। বেণীরায়ের পত্নী অপহৃত হইলে, বহুলোক তাঁহার দলভুক্ত হইয়া প্রতিহিংসাব্রতী হইয়াছিল; তাহাদিগকে দমন করা নবাব এবং সম্রাটের পক্ষেও কঠিন কার্য্য ছিল। তখনকার জমিদারগণ কোন বিপদে পড়িলে তাঁহাদের প্রজাগণ প্রাণপণে সাহায্য করিত। তখন কোন ব্যক্তির বিপদ্ শুনিবা মাত্র তাহার জ্ঞাতি কুটুম্বগণ তাহার সহায়তা জন্য বিনা প্রার্থনায় অগ্রসর হইত। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের বিপদে পার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত হিন্দুই উদ্ধারার্থ সাহায্য করিত। এখন ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে জাতীয় ঐক্য স্থাপন জন্য দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা হয় বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ কিছুই হয় না।

(৪) কোচবেহারের মহারাজের সহ সন্ধিস্থাপন রাজা মানসিংহের চতুর্থ কার্য্য। ঠাকুর ভানুসিংহ সদ্ভাবে এই কার্য্য সাধন জন্য দুইজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকে কোচবেহারে দূতরূপে পাঠাইয়াছিলেন এবং নিজে দিনাজপুর পর্য্যন্ত সসৈন্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিছুদিন পর রাজা মানসিংহও তথায় উপস্থিত হইলেন। দিনাজপুরের নবাব তাঁহাদের রসদ ও অপর আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি যোগাইতে-ছিলেন। কোচবেহারাধিপতি মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ সেই বিপ্র দূতদ্বয়ের পরামর্শে রাজা মানসিংহের শরণাগত হইলেন এবং নিজ ভগিনী পদ্মেশ্বরীকে রাজা মানসিংহের সহ বিবাহ দিলেন। মানসিংহ কোচবেহার রাজ্যের সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন এবং বার্ষিক ৮০০০০৲ আশী হাজার নারায়ণী টাকা (এই টাকার মূল্য ৸০ আনা ছিল) নালবন্দি বা নর্ম্মা দিয়া নিরুপদ্রবে কোচবেহার রাজ্য ভোগ করিতে লক্ষ্মীনারায়ণকে অনুমতি দিলেন। এইরূপে পদ্মার উত্তর পারে দুই কার্য্য বিনা রক্তপাতেই সুসম্পন্ন হইল। সম্রাটের আদিষ্ট চারি কার্য্য সমাধা

করিয়া রাজা মানসিংহ দিল্লী যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে বন্দীকৃত রাজা প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার মৃত দেহ ঘৃতভাণ্ডে ভরিয়া তাহাই লইয়া মানসিংহ জাহাঁগীরের নিকট গিয়া নিজ কার্য্যসমূহের নিকাশ দিয়াছিলেন।

তিনি দিনাজপুরের নবাব প্রাণনাথ রায়কে, তাঁহার শাসিত প্রদেশের করদ রাজা স্বীকার করিয়া রাজা উপাধি দিয়াছিলেন। তাঁহার বার্ষিক কর ৬০০০৲ টাকা ধার্য্য করিয়াছিলেন। কোচবেহারের মহারাজ রাজা প্রাণনাথের সহ পাগড়ী বদল করিয়া বন্ধুত্ব করিয়াছিলেন।

রাজা মানসিংহ রাজপুতনার অন্তর্গত অম্বর (আম্বের) রাজ্যের রাজা ছিলেন। ইঁহারা সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় এবং ভগবান্ রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র কুশের সন্তান বলিয়া পরিচিত (কাছোয়া বা কুশাবহ বংশ)। এই বংশীয় রাজারা মোগল সম্রাট্‌দিগের নিতান্ত অনুগত এবং অনুগৃহীত ছিলেন। ইঁহাদের সুন্দরী কন্যা প্রায় সমস্তই বাদশাহের ঘরে বিবাহ দিতেন এবং ইঁহারা বংশানুক্রমে বাদশাহের সেনাপতি ছিলেন। এই বংশীয় রাজারা এবং যোধপুরের রাথোর বংশীয় রাজারা সময়ে সময়ে বাদশাহের অধীনে শুবাদারী করিতেন। সেবাই জয় সিংহ বা দ্বিতীয় জয় সিংহের সময়ে জয়পুর নগর নির্ম্মিত হইলে, তাহাতেই রাজধানী হইয়াছে। তদবধি এই রাজ্যটি জয়পুর রাজ্য নামে খ্যাত হইয়াছে। কিন্তু মানসিংহ যশোহর হইতে যে শিলাদেবী আম্বেরে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি আম্বেরেই আছে। দেবীর পুরোহিত চারিজন বৈদিক ব্রাহ্মণ সপরিবারে আম্বেরে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশধরগণ এখনও তথায় পুরোহিতরূপে বিদ্যমান আছে। মানসিংহের ক্ষত্রিয়া পত্নীর গর্ভসম্ভূত পুত্র জগৎ সিংহের বংশ বিলুপ্ত হইয়াছে। কোচবেহারের রাজকুমারী পদ্মেশ্বরীর গর্ভে মানসিংহের যে পুত্র হইয়াছিল, তাহার সন্তানেরাই এখন জয়পুরে রাজত্ব করিতেছে।

এই সময়ে বাঙ্গলা দেশের পার্শ্ববর্ত্তী বার জন রাজা এবং অভ্যন্তরে বার জন করদ রাজা বা বার ভূঁইয়া ছিলেন। তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত এই যে—

১। মণিপুর রাজ্য অতি প্রাচীন। ইহার রাজারা চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। এই বংশীয় শেষ রাজা চিত্রসেনের পুত্র ছিল না। তাঁহার একমাত্র কন্যা চিত্রাঙ্গদাকে মধ্যম পাণ্ডব অর্জ্জুন বিবাহ করিয়াছিলেন। তৎপুত্র বভ্রুবাহন মাতামহের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। সেই বংশই অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

এই রাজারা মগধের বৌদ্ধ সম্রাটদের অধীন ছিলেন এবং বল্লাল সেনের করদ বশী রাজা ছিলেন। এখন ইংরেজের অধীন হইয়াছেন। এই বংশ কখনই বিশেষ পরাক্রান্ত বা কোন বিষয়ে বিশেষ প্রসিদ্ধ হয় নাই।

২। ত্রিপুরা রাজ্য—ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্ব পার হইতে ব্রহ্মদেশের জঙ্গল পর্য্যন্ত এই রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এই রাজ্যে চন্দ্রবংশীয়েরা বহুকাল হইতে রাজত্ব করিতে-ছিলেন। মগধরাজ চন্দ্রগুপ্ত ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম দিকে কাশীধাম পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানে ক্ষত্রিয়কুল নষ্ট করিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত নদের পূর্ব্ববর্ত্তী দেশে ক্ষত্ররাজ্য বিদ্যমান ছিল। ত্রিপুরার রাজা পাণ্ডবদের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। এই রাজবংশ সময়ে সময়ে বিলক্ষণ পরাক্রান্ত হইয়াছিল। এই রাজারা বারংবার পাঠান, মোগল, মগ ও আরাকানরাজের সহ যুদ্ধ করিয়াছেন। সময়ে সময়ে তাঁহাদের রাজত্ব আসাম হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। কমলাপুরে (কমিল্লা) এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। শাঃজাদা সুজার নবাবী সময়ে কমলা-পুর মোগলেরা দখল করায় আগরতলায় রাজধানী হইয়াছে। প্রায় দেড় শত বৎসর হইল গোপীপ্রসাদ বর্ম্মা নামক রাজমন্ত্রী বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সেই রাজবংশ ধ্বংস করতঃ স্বয়ং রাজা হইয়াছিলেন। এখন সেই গোপীপ্রসাদের বংশই রাজা আছেন। গোপীপ্রসাদের বংশীয়েরা কখনও প্রতিভশালী হন নাই। ইঁহারা ত্রিপুরা রাজ্যের কিয়দংশ ইংরেজের অধীনে বশী রাজা রূপে ভোগ করেন। আর কতক স্থান জমিদারী স্বত্বে দখল করেন। রাজতালিকা নামক গ্রন্থে এই রাজ্যের ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। রাজতরঙ্গিণী নামক কাশ্মীরের ইতিহাস এবং রাজতালিকা নামক ত্রিপুরার ইতিহাস দৃষ্টে জানা যায় যে, ইতিহাস লিখিবার রীতি হিন্দুদের মধ্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল না।

৩। শ্রীহট্ট রাজ্য—অতি প্রাচীন কাল হইতে এই রাজ্যে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজারা রাজত্ব করিতেছিলেন। এই বংশীয় অতিরথ নামক রাজা বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করায় প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী রাজাদের সাহায্যে তাঁহাকে তাড়া-ইয়া দিয়াছিল। তিনি শ্যাম দেশে গিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ এখনও শ্যাম দেশে রাজত্ব করিতেছে। প্রজারা অতিরথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরথকে রাজা করিয়াছিল। তদ্বংশীয়েরা বহুদিন শ্রীহট্টে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা সময়ে সময়ে ত্রিপুরার রাজাকে এবং আসামের রাজাকে কর দিতে

বাধ্য হইতেন। এই বংশের শেষ রাজা দিগিন্দ্র দেবের কোন সন্তান ছিল না। অদ্বৈত গোস্বামীর বংশজাত দ্বারকানাথ গোস্বামী রাজার গুরু ছিলেন। রাজা অন্তিম কালে নিজ রাজ্য গুরুকে দান করিয়াছিলেন। গোঁসাই রাজা হইয়া অনেকগুলি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বাঙ্গলা দেশ হইতে লইয়া গিয়া এই রাজ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন। মৈমানসিংহ জেলার যে অংশ ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্ব দিকে আছে, সেই অংশও পূর্ব্বে শ্রীহট্ট রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। অনুমান হয় যে, গোঁসাই রাজা হইবার পূর্ব্বে এই রাজ্যে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের বসতি ছিল না। দ্বারকানাথের পর তৎপুত্র শ্যামসুন্দর গোস্বামী রাজা হইয়া শাক্তদিগের উপর ঘোর উৎপীড়ন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে শাঃ জেহান দিল্লীর সম্রাট্ ছিলেন এবং তৎপুত্র সুজা বাঙ্গলার শুবেদার ছিলেন। কতিপয় শাক্ত ব্রাহ্মণ গিয়া সুজার নিকট শ্যামসুন্দরের বিরুদ্ধে নালিশ করায় সুজা শ্রীহট্ট রাজ্য জয় করিয়া শুবে বাঙ্গলার সামিল করিয়াছিলেন। সুজা সেই সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের পশ্চিমাংশ—যাহা এখন জেলা কমিল্লার অন্তর্গত—তাহাও দখল করিয়া বাঙ্গলা দেশের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। এই নবাধিকৃত প্রদেশ হইতে বার্ষিক চৌদ্দ লক্ষ টাকা সুজার আয় হইত। শ্যাম সুন্দর রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া, ঢাকা জেলার অন্তর্গত উথুলি গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। তদ্বংশীয়েরা উথুলির গোঁসাই নামে পরিচিত। বোধ হয়, ধর্ম্মবিদ্বেষ জনিত অত্যাচার মোগল অপেক্ষা গোস্বামীদের অনেক বেশী ছিল।

৪। জয়ন্তী রাজ্য—এই রাজ্যে খসিয়া নামক অসভ্য অনার্য্য জাতির বসতি ছিল। এই রাজ্য কখন সভ্য বা পরাক্রান্ত হয় নাই। এই রাজ্য অনেক সময়েই ত্রিপুরা রাজ্যের অধীন ও করদ ছিল। ইহাতে রীতিমত শাসনপ্রণালী ছিল না। স্থানে স্থানে যে সকল সামন্ত বা সর্দ্দার ছিল, তাহারাই প্রায় স্বাধীন ভাবে থাকিত। এখন এই রাজ্য ইংরেজের অধীন হইয়া কতক সভ্য হইতেছে।

৫। অচ রাজ্য—এই রাজ্যে "নাগ" জাতীয় অনার্য্য জাতির বসতি ছিল। অদ্যাপি তাহাদিগকে "নাগা" বলে। চিরস্থির বস্তুর নাম 'নগ" (ন গচ্ছতি ইতি নগ)। এই শব্দে আকাশ, পর্ব্বত এবং বৃক্ষ বুঝায়। আবার সেই নগ সম্বন্ধীয় সমস্ত পদার্থকেই "নাগ" বলা যায়। নাগ শব্দে স্থির বায়ু, হস্তী, মহাসর্প এবং পার্ব্বত্য লোক বুঝায়। সংস্কৃত ভাষায় এমন অনেক শব্দ আছে, যাহা অনেক বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য ভাষাতেও এইরূপ শব্দ অপ্রাপ্য

নহে। সেই সকল শব্দের সাবধানে অর্থ না করিলেই অনর্থক ভ্রম জন্মে। "পৃথিবী অনন্ত নাগের উপর আছে" এই কথার প্রকৃত অর্থ এই যে, পৃথিবী অসীম স্থির বায়ুর উপর আছে; "উলপী নাগকন্যা" এই বাক্যের অর্থ এই যে "উলপী নাগ বা নাগা উপাধিধারী লোকের কন্যা"। এই সকল স্থলে নাগ শব্দে সর্প বা হস্তী বলিয়া অর্থ করা অনুচিত। অচ রাজ্য কখন রীতিমত সুশাসিত রাজ্য ছিল না। এই নাগরাজের কন্যা উলপীকে মধ্যম পাণ্ডব অর্জ্জুন বিবাহ করিয়াছিলেন। নাগেরা সুযোগ পাইলেই পার্শ্ববর্ত্তী স্থান লুঠ করিত। আবার পার্শ্ববর্ত্তী রাজারাও সময়ে সময়ে এই রাজ্য লুঠ করিতেন। এই রাজ্য অনেক সময়েই আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্যের অধীন থাকিত। এক্ষণে এই দেশ ইংরেজের অধীন, কিন্তু জঙ্গলবাসী নাগাগণ পূর্ব্ববৎ স্বাধীন ও অসভ্য অবস্থাতেই আছে।

৬। আসাম দেশ—ইহার প্রাচীন নাম প্রাগ্জ্যোতিষ বা প্রাগ্দেশ। ইহার পশ্চিমাংশের নাম কামরূপ। ইহার আসাম নাম কোন্ সময়ে কি কারণে হইয়াছে, তাহা জানা যায় না। বক্তিয়ার গিল্জীর আসাম আক্রমণের পূর্ব্বাবধি এই দেশের নাম আসাম হইয়াছিল। তজ্জন্য অনুমান হয় যে, বৌদ্ধ রাজত্ব কালেই আসাম নামটি সৃষ্ট হইয়াছিল। মহাভারতে এই দেশে কিরাত জাতির বাস বলিয়া উক্ত আছে। তখন ভগদত্ত এই দেশের রাজা ছিলেন। রাজা দুর্য্যোধনের মহিষী ভানুমতী সেই ভগদত্তের কন্যা। এখন এই দেশে ব্রাহ্মণ, রাজবংশী, কল্তা কায়েত, ভুটিয়া, তার্ত্তার, আকা, নাগা ও মগ জাতির বসতি দেখা যায়। বৌদ্ধ দমনের পর রাজবংশীরাই এই দেশের রাজা হইয়াছিল। সময়ে সময়ে সেই রাজবংশী রাজারা বিলক্ষণ পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের রাজত্ব জেলা রঙ্গপুরের পূর্ব্ব হইতে চীনের প্রাচীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ব্রহ্মদেশের উত্তর ভাগে ভামো ও প্রোম অঞ্চলে অনেক বড়ুয়া মগ দেখা যায়। তাহারা আসামদেশীয় রাজবংশীর সন্তান। বড়ুয়া শব্দে বড় লোক বা সম্ভ্রান্ত। রাজার শ্বশুরগোষ্ঠী সকলেই বড়ুয়া গণ্য হইত। রাজার দৌহিত্রগোষ্ঠী ঈশর। রাজার সহিত কুটুম্বিতা-বিহীন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের উপাধি কারজী বা কার্য্যী। ব্রাহ্মণ ভিন্ন সকল হিন্দুই রাজবংশী মধ্যে গণ্য। স্ত্রীজাতি এই দেশে সম্পত্তিবিশেষ মধ্যে গণ্য ছিল, সুতরাং তাহাদিগকে পুরুষেরা ইচ্ছামত দান বিক্রয় ও বন্ধক দিতে পারিত। সতীত্ব ধর্ম্ম এখানে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। ধর্ম্ম কাহারও একচাটিয়া

নহে। বিধর্ম্মীদিগকে সনাতন ধর্ম্মে গ্রহণ করিতে শাস্ত্রে বিধান আছে। বৌদ্ধদিগকে সনাতন ধর্ম্মে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু তাহারা সকলেই শূদ্র হইয়াছে।

হিন্দুদের নানা জাতি, নানা শ্রেণী এবং তাহার অসংখ্য শাখা প্রশাখা হওয়াতে এখন কোন বিধর্ম্মীকে কোন্ শ্রেণীতে গ্রহণ করা হইবে, তাহা নির্ব্বাচন করা যায় না। এই জন্য বিধর্ম্মীকে হিন্দু ধর্ম্মে গ্রহণ করিবার প্রথা অপ্রচলিত হইয়াছে। চৈতন্যপ্রভুর বৈষ্ণব মতে ব্রাহ্মণেরা "অধিকারী" আর সকল জাতীয় লোকই "বৈষ্ণব"; এই দুইটি মাত্র ভাগ ছিল এবং সেই দুই ভাগের আর কোন শাখা প্রশাখা ছিল না। এজন্য তিনি কতিপয় মুসলমানকে বৈষ্ণব রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পর বৈষ্ণব মধ্যেও জাতিবিচার আরম্ভ হওয়ায় বিধর্ম্মীকে বৈষ্ণব করা অসম্ভব হইয়াছে। নানকের শিখ (শিষ্য) ধর্ম্মেও ব্রাহ্মণ ও শিষ্য এই দুইটি মাত্র শ্রেণী ছিল। তজ্জন্য নানক অনেক মুসলমানকে শিষ্য করিয়াছিলেন। পরে শিখের মধ্যেও জাতিভেদ আরম্ভ হওয়ায় বিধর্ম্মী গ্রহণ করা রহিত হইয়াছে। আসামে ব্রাহ্মণ ও রাজবংশী ভিন্ন হিন্দুর অন্য বিভাগ নাই। এজন্য তথায় বিধর্ম্মীকে হিন্দু করিবার প্রথা বরাবর প্রচলিত আছে। এখানে হিন্দু বলিলেই রাজবংশী বুঝায়। এখানে মুসলমানকে হিন্দু করিবার রীতি এই যে,—ব্রাহ্মণ কিংবা অধিকারীর উপদেশ মত মুসলমান ভক্ত কয়েক বার হরিবোল হরিবোল বলিয়া গোবর-জলে স্নান করে। তাহার পর দাড়ী মোড়াইয়া ভক্ত শূকরের রক্ত খায় এবং মাটীতে পড়িয়া দেববিগ্রহ প্রণাম করে। তাহার পর আবার হরিবোল বলিতে বলিতে তুলসীজলে স্নান করিয়া ব্রাহ্মণ ও অধিকারীকে প্রণাম করে, দেববিগ্রহ প্রণাম করিয়া নির্ম্মাল্য মস্তকে লয়; অবশেষে দেবতার প্রসাদ ও চরণামৃত সেবন করিলেই সে বিশুদ্ধ হিন্দু অর্থাৎ রাজবংশী হয়। মুসলমান ভিন্ন অন্য জাতি হিন্দু হইতে দাড়ী মোড়াইতে হয় না, শূকরের রক্ত খাইতে হয় না এবং গোবরজলেও স্নান করিতে হয় না। তাদৃশ ভক্তেরা তুলসীজলে স্নান করিয়া কয়েক বার হরিবোল বলে। তাহার পর দেবতা, ব্রাহ্মণ ও অধিকারীকে প্রণাম করিয়া প্রসাদ ও চরণামৃত গ্রহণ করিলেই অমনি বিশুদ্ধ হিন্দু গণ্য হয়। আর সেই রাজবংশী লেখা পড়া জানিলেই কায়েত হয়, বড় চাকরী পাইলেই কারজী হয়, রাজার কুটুম্ব হই-

সেই বড়ুয়া হয়। ব্রাহ্মণের ঔরসে রাজবংশী রমণীর গর্ভজাত সন্তান "অধিকারী" হয়। তাহারা ব্রাহ্মণ হয় না, উপনয়ন ধারণ করে না, কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর রাজবংশীর পৌরোহিত্য করিতে পারে। নূতন কোন লোক ব্রাহ্মণ হইবার কোন বিধান হিন্দু শাস্ত্রে নাই। সুতরাং তাহা এখানে হয় না এবং কোন স্থানেই কোন কালে হয় নাই।

ভারতবর্ষে এবং আফগানিস্তানে এখন যত মুসলমান আছে, ইহাদের অন্যূন চৌদ্দ আনা অংশই হিন্দুসন্তান। তাহারা নানা কারণে বাধ্য হইয়া একবার মুসলমান হইয়াছিল। পুনরায় সনাতন ধর্ম্মে আসিতে না পারিয়া অগত্যা মুসলমান হইয়া রহিয়াছে। তাহাদের দ্বারা হিন্দুদের বহুল অনিষ্ট হইয়াছে এবং হইতেছে। পেশোয়ারের নিকটবাসী গোক্ষুর জাতি তিন শত বৎসর যাবৎ স্বধর্ম্ম রক্ষার্থ মুসলমান সহ যুদ্ধ করিয়াছে। পরে মহম্মদ গোরী তাহাদিগকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন। তাহারা সেই আক্রোশে পরে গোরীকে হত্যা করিয়াছিল। কিন্তু পুনরায় হিন্দু হইতে না পারিয়া অগত্যা তাহারা মুসলমান হইয়া রহিয়াছে। ইহাদিগকে এখন "কাক্কর" বলে। কাক্কর শব্দটি গোক্ষুর শব্দেরই অপভ্রংশ। আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তান পূর্ব্বে ভারতবর্ষেরই অংশ ছিল। তথায় এখনও অনেক লোক হিন্দু আছে। যাহারা মুসলমান হইয়াছে, তাহাদিগকে পাঠান বলে। তাহারাও হিন্দুসন্তান। চিত্রল (চৈত্ররথ), বাল্‌খ (বাহ্লীক), কাবুল (কুভা), হিরাবতী (হিরাত), খান্দার (গান্ধার), শিবি (সিবি), শাল্ব (বেলুচিস্তান), গজনী (গজনীর) প্রভৃতি সমস্তই হিন্দুরাজ্য ছিল। আসামের ন্যায় ব্যবস্থা না থাকাতেই আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান এবং ভারতবর্ষ মুসলমানপূর্ণ হইয়াছে এবং পরাধীনতার প্রধান কারণ হইয়াছে। আসামে পুনরায় স্বধর্ম্ম গ্রহণের নিয়ম থাকায় তথায় মুসলমান রাজ্য স্থায়ী হয় নাই। কালাপাহাড় আসাম জয় করিয়াছিলেন, মীরজুম্লা আসাম জয় করিয়াছিলেন; তাঁহারা বহু লোককে বলপূর্ব্বক মুসলমানও করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা ফিরিবা মাত্র আসাম আবার স্বাধীন হইয়াছিল এবং পতিত হিন্দুরা পুনরায় হিন্দু হইয়াছিল। আসাম কিছু দিন কোচবেহারাধিপতির করদ হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন বরাবর প্রপন্ন ছিল। অবশেষে ব্রহ্মদেশের রাজা আসাম অধিকার করিলে, আসামরাজ ইংরেজের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ইংরেজেরা মগদিগকে কামরূপ হইতে তাড়া-

ইয়া তাহা নিজ অধিকারভুক্ত করিয়াছেন এবং আসামরাজকে বৃত্তিভোগী করিয়াছেন। আসামের পূর্ব্বভাগ ব্রহ্মরাজ্যেরই অধীন ছিল। এখন তাহাও ইংরেজরাজ্যভুক্ত হইয়াছে।

৭। কোচবেহার—এখন যাহাকে তিব্বত বলে, ইহার প্রাচীন নাম ভূতবর্ষ বা কিম্পুরুষবর্ষ। তাহার উত্তরে কৈলাস পর্ব্বত, পূর্ব্বে চীন, দক্ষিণে হিমাচল এবং পশ্চিমে গন্ধর্ব্ববর্ষ বা চিত্রল। মানস সরোবর হইতে ইহার মধ্য দিয়া ব্রহ্মপুত্র নদ পূর্ব্বমুখে প্রবাহিত হইয়া অবশেষে দক্ষিণমুখ হইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছে। চীন দেশের একাক্ষরী ভাষায় বিদেশীয় শব্দ লেখা দুষ্কর। ভূতবর্ষ চীনের অধীন হইলে চীন ভাষায় নামগুলি বিকৃত হইয়া ভূতবর্ষের নাম ভোট, কৈলাসের নাম কিউন্‌লন্‌ এবং ব্রহ্মপুত্র নদের নাম সামপু হইয়াছে। তিব্বতের অধিপতি বা মহাগুরুকে বৌদ্ধেরা দলই লামা অর্থাৎ মহাযোগী বলে। যেমন কাশীর রাজা বলিলে মহাদেবকে বুঝায় আবার রামনগরের রাজাকেও বুঝায়, তেমনি ভূতপতি বলিতে মহাদেব এবং দলই লামা উভয়কেই বুঝায়। সেই ভূতপতি (মহাদেব বা দলই লামা) নিজরাজ্যের দক্ষিণ প্রান্ত পরিদর্শন করিতে আসিয়া চিক্‌না পাহাড়ে হরিয়া ম্যাচের দুই পত্নী হীরা ও জিরাকে পরম সুন্দরী দৃষ্টে নিজের সেবাদাসী করিয়াছিলেন। তাহাতে হীরার গর্ভে বিশু সিংহ এবং জিরার গর্ভে ইশু সিংহ নামক দুই পুত্র হয়। ভূতরাজ সেই দুই পুত্রকে নিজরাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তে রাজত্ব দিয়াছিলেন। কোচবেহারের মহারাজ এবং জলপাইগুড়ীর রায়কত সেই বিশুসিংহের বংশীয় আর বিজনী ও সিডলীর রাজারা ইশুসিংহের বংশধর। তন্মধ্যে কোচবেহারের মহারাজগণই বিশেষ পরাক্রান্ত এবং প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

৮। চিক্‌না পাহাড়ের দক্ষিণে কমটাপুরে নীলধ্বজবংশীয় রাজবংশী জাতীয় রাজাদের রাজত্ব ছিল। তাহার দক্ষিণ-পশ্চিমে ভিতর গড়ে ভবচন্দ্র রাজার বংশধরেরা রাজত্ব করিতেন। ভবচন্দ্র নামক পাগলা রাজা ও তাঁহার মন্ত্রী গবচন্দ্রের গল্প প্রায় সমস্ত বাঙ্গলা দেশেই শুনা যায়। জলপাইগুড়ীর সাড়ে পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে ভিতর গড়ে তাহার বাস ছিল। ভিতর গড় ও বাহির গড়ের প্রাচীর পরীখা এবং অভ্যন্তরস্থ পুষ্করিণী দৃষ্টে স্পষ্ট জানা যায় যে, ঐ রাজ্য বিলক্ষণ বিস্তৃত ও বিভবশালী ছিল। এই রাজারাও রাজবংশী ছিলেন।

৯। বিশু সিংহ ও ইশু সিংহ এবং তাঁহাদের উত্তরাধিকারিগণ দেখিলেন, তাঁহা-

দের পার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত রাজা এবং প্রধান লোকেরাই রাজবংশী অর্থাৎ কোচ। সুতরাং তাঁহারা সেই কোচদিগের প্রধান লোক সহ কুটুম্বিতা করিয়া তাহাদের সমাজে মিলিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা আপনাদিগকে শিববংশী বলিয়া পরিচয় দেন এবং রাজবংশী বা কোচ বলিলে অপমান বোধ করেন। অথচ কোচ সহ বিবাহ আদান প্রদানে বা আহার বিহারে কোন অপমান জ্ঞান করেন না। ক্ষত্রিয়দের সহ বিবাহ আদান প্রদানও কোচবেহারের মহারাজা-দের দেখা যায়। ইঁহাদের কোন কোন আচার ব্যবহার ঠিক ক্ষত্রিয়ের সদৃশ আবার আর কতগুলি ব্যবহার অন্ত্যজ জাতির তুল্য।

১০। কমটাপুর ও ভিতর গড় রাজ্য কোচবেহার-রাজ্যভুক্ত হইয়াছে। এক সময়ে এই রাজ্য বিলক্ষণ প্রবল হইয়াছিল। ভূটান, আসাম, মোরঙ্গ এবং উত্তর বাঙ্গলার কিয়দংশ সময়ে সময়ে কোচবেহারের অধিকৃত হইত। পূর্ব্বে এই সমস্ত স্থান বেহার প্রদেশের অংশ বলিয়া গণ্য ছিল। এই জন্য বেহারের যে অংশ মুসলমানদের অধিকৃত, তাহার নাম শুবে বেহার বা মোগলান বেহার। আর যে অংশ কোচ রাজার অধিকৃত তাহার নাম কোচবেহার। এই রাজ্যেও আসা-মের ন্যায় কেবল রাজবংশী ও ব্রাহ্মণ এই দুই জাতি ছিল। থ্যান, কৈবর্ত্ত, হাড়ী, বেলদার প্রভৃতি জাতীয় লোক স্থানে স্থানে অল্পই দেখা যায়। এখানেও হিন্দু বলিলেই রাজবংশী বুঝায়। কিন্তু এখানে মুসলমানদিগকে হিন্দু করিয়া লইবার প্রথা ছিল না। নবাব মীর জুম্লা এই দেশ জয় করিয়া কতকটি রাজবংশীকে মুসলমান করিয়াছিলেন। তদবধি তাহারা নস্য উপাধিধারী মুসলমান হইয়া আছে। কিন্তু তাহারা মুসলমান ধর্ম্মের মর্ম্ম কিছুই জানিত না এবং তাহাদের আচার ব্যবহার সমস্তই রাজবংশীদের ন্যায় ছিল। রেল হওয়ার পর এখানকার মুসলমানেরা কিয়ৎ পরিমাণে যাবনিক ব্যবহার গ্রহণ করিতেছে।

এই বংশীয় জলপাইগুড়ীর রায়কত এবং সিডলীর চৌধুরীরা এখন ইংরেজ রাজ্যের অধীনে জমিদার হইয়াছেন। কোচবেহার ও বিজনীর মহারাজগণ কতক ভূমি করদ রাজা রূপে আর কতক ভূমি জমিদাররূপে ভোগ করিতেছেন। এই রাজ্যের পৃথক্ ইতিহাস হইয়াছে, সুতরাং এই সামাজিক ইতিহাসে তাহার বিস্তৃত বিবরণ লেখা অনাবশ্যক।

১১। জাজপুর—উড়িষ্যার উত্তরাংশ এবং রাঢ়দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ লইয়া

এই রাজ্য সংগঠিত ছিল। এথাকার রাজারা ক্ষত্রিয় ছিলেন, তাঁহারা বল্লালসেনের বশী রাজা ছিলেন। তাঁহারা বাঙ্গলার নবাব ও গৌড় বাদশাহের সহ বহু যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অবশেষে উড়িষ্যার রাজারা এই রাজ্যের রাজধানী সহ অধিকাংশ দখল করিয়াছিলেন। রাজা সুধীর সিংহ অবশিষ্ট রাজ্য রক্ষার জন্য গৌড় বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করিয়া বর্দ্ধমানে রাজধানী করিয়াছিলেন। বিদ্যাসুন্দর কাব্যে বীরসিংহ নামক বর্দ্ধমানের যে রাজার উল্লেখ আছে, তিনি এই বংশীয় রাজা। নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁর সময়ে বর্দ্ধমানের রাজার মালগুজারী বাকীর জন্য সমস্ত রাজ্য নীলাম হওয়ায় বর্দ্ধমানের বর্ত্তমান মহারাজের পূর্ব্বপুরুষ লালজী রায় তাহা ক্রয় করিয়াছিলেন। পুরাতন রাজবংশের কোন বংশধর এখন দেখা যায় না। পুরাতন রাজধানী বর্দ্ধমানও এখন জনশূন্য হইয়াছে। এখন যে বর্দ্ধমান নগর আছে, তাহার পূর্ব্ব নাম গোহাট। বর্দ্ধমান রাজ্য লালজী খরিদ করা অবধি গোহাটের নামই বর্দ্ধমান হইয়াছে। (বর্দ্ধমানের বর্ত্তমান রাজবংশের বৃত্তান্ত পৃথক্ লেখা হইল)।

১২। আরাকান—আরাকানে বাঙ্গলা ভাষা প্রচলিত নাই এবং এখানকার রাজাকে বাঙ্গালী বলা যায় না। তাঁহাদের দ্বারা বাঙ্গালী সমাজের কোন হিতাহিত হয় নাই। কিন্তু এই রাজ্যের সহ বাঙ্গলা দেশের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। নয়াখালি ও চট্টগ্রাম জেলা সময়ে সময়ে আরাকানের অধীন হইয়াছে। এই রাজারা পর্টুগীজদিগের সহায়তায় অতিশয় প্রবল হইয়া বকদ্বীপের দক্ষিণ ভাগ পুনঃ পুনঃ লুট করিতেন। তজ্জন্য অধিবাসীরা পলায়ন করাতে সেই সকল স্থান সুন্দরবন নামক নিবিড় জঙ্গল হইয়াছে। ইহার পর পর্টুগীজেরা আরাকানে আপনাদের প্রভুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করায় আরাকানী মগদের সহ তাহাদের বিবাদ হয়। পর্টুগীজেরা সম্পূর্ণ পরাস্ত হইল। তাহাদের কতক হত, কতক পলায়িত হইল, অবশিষ্টেরা অধীন প্রজারূপে চট্টগ্রামে বাস করিয়াছিল। বাদশাজাদা সুজা আরাকানে আশ্রয় লইয়া নিহত হইয়াছিলেন। চট্টগ্রামের প্রভুত্ব লইয়া ত্রিপুরার রাজার সহ আরাকানরাজের বারংবার যুদ্ধ হইয়াছে। নবাব শায়স্তা খাঁ নয়াখালি ও চট্টগ্রাম মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন এবং পর্টুগীজ ফিরিঙ্গীদিগকে * ঢাকার ফিরিঙ্গীবাজারে অধিবিষ্ট করিয়াছিলেন।

* পর্টুগীজদিগকে পুর্ব্বে হাব্‌রী বলিত। স্পেন ও পর্টুগাল দেশকে হাব্রিয়া বলিত। ফিরিঙ্গী শব্দে শ্বেত অঙ্গ বিশিষ্ট।

আরাকানের রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু জয়কালীর পূজা করিতেন। সেই দেবীর সম্মুখে ব্রাহ্মণ ব্যতীত সকল জাতীয় বন্দীদিগকেই নরবলি দিতেন। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান, কুকি, রাক্ষস, সর্প, ব্যাঘ্র, গো, মহিষ, হস্তী, সিংহ, ভল্লুক, গণ্ডার প্রভৃতি সমস্ত প্রাণীই বলি দিবার রীতি ছিল। দেবীর পুরোহিতদিগকে ফুঙ্গী বলিত। অন্যান্য হিন্দু দেব-দেবীরও পূজা হইত। তজ্জন্য ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিযুক্ত ছিল। মগেরা সর্ব্বপ্রকার প্রাণীর মাংসই খাইত। বলিদানকৃত মনুষ্য-মাংসও খাইত। ব্রাহ্মণকন্যা ব্যতীত সকল জাতীয় মনুষ্যের কন্যাই মগেরা বিবাহ করিত। মগরমণীরা সকল জাতীয় পুরুষকেই পতি বা উপপতিরূপে গ্রহণ করিত। তাহাতে উৎপন্ন সন্তান বিশুদ্ধ মগ বলিয়া গণ্য হইত। জারজ সন্তানের মর্য্যাদা কিছুমাত্র কম হইত না। কখন কখন ব্রাহ্মণ ধরিয়া তাহার সহ রাজকুমারী-দিগের কিংবা সম্ভ্রান্ত মগদিগের কন্যাগণের বিবাহ দিত। তাহাদের সন্তানেরাও মগ বলিয়া গণ্য হইত। ফলতঃ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহারও জাতিবিচার ছিল না। পরিশেষে খৃষ্টীয় ১৭৫৩ সালে ব্রহ্মদেশের রাজা আরাকান রাজ্য দখল করিয়া তথাকার রাজবংশ ধ্বংস করিয়াছিলেন। তাহার ৫০ বৎসর পরেই আবার ইংরেজেরা আরাকান দেশ অধিকার করিয়াছেন। তদবধি এই দেশ ইংরেজের অধিকৃত আছে।

বার ভুঁইয়া অর্থাৎ বাঙ্গালা দেশের অন্তর্গত বারটী করদ রাজার বিবরণ।

১। ভাদুড়িয়া—তাহার বিস্তারিত বিবরণ লেখা হইয়াছে।

২। সাঁতোড়—ইহার বিবরণ যত দূর প্রাপ্য, তাহাও বিস্তারিত লেখা হইয়াছে।

৩। বর্দ্ধমান—এখানকার বর্দ্ধমান রাজবংশ পঞ্জাবী ক্ষেত্রি বা ক্ষত্রিয়। ইঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ শ্যামল রায়, কতিপয় ক্ষেত্রি ও সারস্বত ব্রাহ্মণ সহ নানা তীর্থ করিয়া অবশেষে উড়িষ্যার জগন্নাথ ক্ষেত্রে গিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রত্যাগমন-কালে বর্দ্ধমান রাজ্যে বাণিজ্যের সুবিধা দেখিয়া গোহাটের বাজারে দোকান করিয়াছিলেন। তাহাতে সঙ্গতি হইলে টাকা লগ্নী করিতে লাগিলেন। শ্যামল রায়ের বংশ ক্রমশঃ অত্যন্ত ধনী হইল। বর্দ্ধমানের মহারাজা কৃষ্ণরাম রায়ও তাঁহার নিকট ঋণী হইলেন। সেই ক্ষেত্রি মহাজন আবুরায় ও বাবুরায় ক্রমশঃ বর্দ্ধমান রাজ্য ক্রয় করিয়া আপনারাই বর্দ্ধমানের মহারাজা হইলেন। প্রাচীন রাজবংশীয়েরা

নাগপুরে চলিয়া গেলেন। তদবধি প্রাচীন বর্দ্ধমান জনশূন্য হইল এবং গোহাটের নামই বর্দ্ধমান হইল। বর্দ্ধমানের মহারাজার অধীন চিত্রবরদা নামক স্থানের সামন্ত শোভা সিংহ নামক একজন ক্ষত্রিয় বিদ্রোহী হইয়া উড়িষ্যার পাঠানদিগের সাহায্যে রাজা কৃষ্ণরামকে বিনাশ করিয়া বর্দ্ধমান রাজ্য অধিকার করিল। সে রাজকুমারীকে নিজ ভোগ্যা করিতে উৎসুক হইল। পিতৃহা শত্রু শোভা সিংহকে বিনাশ করিতে রাজকুমারীর ইচ্ছা হইল। তিনি সে ভাব গোপন করিয়া শোভা সিংহের দুষ্ট প্রস্তাবে সম্পূর্ণ সম্মতি দিলেন।

পরে সুযোগ মত শোভাকে হত্যা করিয়া স্বয়ং আত্মহত্যা করিলেন। পাঠানদিগের নায়ক রহিম খাঁ বর্দ্ধমান রাজ্য দখল করিয়া ক্রমে রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিল। অল্পকাল পরেই পাঠানেরা পরাজিত হইয়া উড়িষ্যায় পলায়ন করিল। কৃষ্ণরামের পুত্র পুনরায় বর্দ্ধমানে রাজা হইলেন। তিনি আরো বহু জমিদারী ক্রয় করিয়াছিলেন। তিনি করদ রাজা বলিয়া সনন্দ পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মুর্শিদকুলী খাঁ তাঁহার মালগুজারী বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং ক্ষমতা হ্রাস করিয়াছিলেন। তথাপি তখনও তাঁহাদের গড়খাই ছিল, সৈন্য ছিল এবং বিচারাধিকার ছিল। ইংরেজাধিকারের পর লর্ড কর্ণোয়ালিস বর্দ্ধমানের মহারাজের ও অন্যান্য সমস্ত রাজা মহারাজের রাজস্ব অতিমাত্র বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং সর্ব্ব-প্রকার ক্ষমতা রহিত করিয়াছেন। তদবধি এখানকার মহারাজও সাধারণ জমিদার হইয়াছেন। তাঁহার রাজাধিরাজ মহারাজ উপাধি আছে বটে, কিন্তু সাধা-রণ জমিদার অপেক্ষা ক্ষমতা কিছুমাত্র বেশী নাই। এই বংশে এগার পুরুষ বরা-বর দত্তকপুত্র দ্বারা বংশরক্ষা হইতেছে। তজ্জন্য সম্পত্তি ভাগ হয় নাই এবং সম্পত্তি বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হয় না।

৪। তাহিরপুর—তাহিরপুরের রাজারা নন্দনাবাসি-গাঁই সিদ্ধশ্রোত্রিয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। মনুসংহিতার সর্ব্বোৎকৃষ্ট টীকাকারক কল্লূক ভট্ট এই রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ। এই বংশীয় উদয়নারায়ণ রায় গৌড়বাদশাঃ গণেশের শ্যালক ছিলেন। তিনিই প্রথম রাজা উপাধি পাইয়াছিলেন। রাজা জীবন রায়, সম্রাট্ যদুনারায়ণের দেওয়ান ছিলেন। রাজা কংশনারায়ণের বৃত্তান্ত পূর্ব্বেই লেখা হই-য়াছে। শরীকী বিভাগ হওয়ায় এই বংশীয় রাজাদের প্রত্যেকের অংশ ক্ষুদ্র হইয়াছে। অনেক শরীকের অংশ বিক্রীত হইয়াছে। কোন কোন শরীকের

অংশ দৌহিত্রে পাইয়াছে। মূল রাজবংশের সম্পত্তি অতি অল্পই আছে। এই রাজ্য পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ছিল, এখন রাজসাহী জেলার অন্তর্গত হইয়াছে।

৫। পুঁঠিয়া—গৌড় বাদশাহের সেনার রসদ যোগাইবার জন্য ঠাকুর কমলাকান্ত বাগছি একটি পরগণা চাকরাণ পাইয়াছিলেন। তজ্জন্য সেই পরগণার নাম লস্করপুর। কমল ঠাকুরের বাড়ী ঐ পরগণা মধ্যে পুঁঠিয়া গ্রামে পূর্ব্বাবধি ছিল। ইনি সাধু বাগছির সন্তান এবং অতি মান্য কুলীন ছিলেন। সম্পত্তি প্রাপ্তির পর তদ্বংশীয়দের চরিত্রে নানারূপ দোষ জন্মিল। সুরাপান ও লাম্পট্য হেতু অনেক কুকার্য্য অনুষ্ঠিত হইল। রাজা রামচন্দ্র রায়, তাঁহার বন্ধু সাঁতোড়ের ধেনুয়া-রামকৃষ্ণ, মধুরায়, ডাকুরায় ও অরবিন্দ রায় মত্ত অবস্থায় কালীপূজা উপলক্ষে মহিষের পরিবর্ত্তে গরু বলি দিয়াছিলেন। সেই জন্য তিরস্কার করায় পুরোহিতকে এবং রাজার জননীকেও হত্যা করা হইল। এই সকল মহাপাপ করা হেতু তাঁহারা পাঁচুড়িয়া অর্থাৎ পঞ্চমহাপাতকী নামে ঘৃণিত হইয়াছিলেন। মধু, ডাকু, অরবিন্দ সমাজচ্যুত হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। রামকৃষ্ণ স্বহস্তে ধেনু বধ করিয়াছিলেন, সেই জন্যই তাঁহার নাম ধেনুয়া-রামকৃষ্ণ হইয়াছিল। তিনি দেশত্যাগী হইলেন। রাজা রামচন্দ্র ঠাকুর নানারূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ব্রাহ্মণসমাজে গৃহীত হইলেন বটে, কিন্তু অতিশয় হেয় থাকিলেন। ইহাকেই লোকে "সাধুর ভরা তল" বলে। এই পুরাতন রাজবংশের বহু শরীক হওয়ায় অনেক শরীকের সম্পত্তি ক্ষুদ্র হইয়াছে, কাহারও বা সম্পত্তি বিক্রীত হইয়াছে। আবার বড় বড় শরীকগণ নূতন সম্পত্তি ক্রয় করিয়া সঙ্গতি বর্দ্ধিত করিয়াছেন। পাঁচ-আনীর শরীকের 'মহারাজ' এবং চারি-আনীর 'রাজা' উপাধি আছে। অপর ক্ষুদ্র অংশীদিগকেও স্থানীয় লোকে রাজা বলে বটে, কিন্তু গবর্ণমেণ্টে ঠাকুর উপাধি।

৬। সিন্দূরী—পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ভীম ওঝা, সম্রাট্ বল্লাল সেনের পুরোহিত ছিলেন। গৌড় নগরের নিকট কালিয়া গ্রামে তাঁহার বসতি ছিল। বল্লালের হড্ডিকা-সংস্রব ঘটিলে তিনি কালিয়া গ্রাম ত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান পাবনা জেলার পূর্ব্বদক্ষিণ অংশে ছাতক নামক গ্রামে বসতি করিয়াছিলেন। তাঁহার সন্তানেরা কালিয়াই গোষ্ঠী নামে খ্যাত। তিনি যখন পূর্ব্ববঙ্গে বাড়ী করিয়াছিলেন,

তখন পূর্ব্ববঙ্গে আর কোন শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ছিল না। এজন্য তদ্বংশীয়েরা বাঙ্গাল ওঝা নামে পরিচিত হইতেন। ভীমের পৌত্র অনন্তরাম বাঙ্গাল ওঝা, রাজা লক্ষ্মণ সেনের গুরু ছিলেন। তিনি সিন্দুরী ও শাখিনী এই দুই পরগণা নিষ্কর-রূপে গুরুদক্ষিণা পাইয়া বহুসংখ্যক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ এই স্থানে স্থাপন করিয়াছিলেন। তদ্‌বংশীয়দের তুল্য পুরাতন জমিদার বাঙ্গলা দেশে আর দেখা যায় না। পাঠান রাজ্যারম্ভে ইঁহারা রায় উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। গৌড় বাদশাহদিগের সময়ে বসন্ত রায় আট পরগণার রাজা হইয়াছিলেন। ইঁহারা কুলীন ব্রাহ্মণ এবং সমৃদ্ধ রাজা ছিলেন। মুসলমান রাজধানী হইতে বহুদূরবর্ত্তী থাকায় আপন চত্বরে তাঁহাদের স্বাধীন রাজার ন্যায় সর্ব্ববিষয়ে প্রাধান্য ছিল। বসন্ত রায়ের পুত্র রাজীব রায়, গয়াতীর্থ হইতে প্রত্যাগমনকালে রাঢ়দেশ হইতে শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক একজন রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণকে তাহার মাতা ও ভগিনীদ্বয়সহ সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। শিবচন্দ্রের দুইটি ভগিনী পরম সুন্দরী ছিল। রাজা সেই শিবচন্দ্রের "চট্টোপাধ্যায়" উপাধি স্থলে "মৈত্র" উপাধি করিলেন। তাঁহার দুই ভগিনীকে স্বয়ং বিবাহ করিলেন। সেই পরিচয়ে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের ঘরে শিবচন্দ্রের বিবাহ দিলেন এবং তাঁহাকে একটি গ্রাম তালুক করিয়া দিলেন। তাঁহারই সন্তানেরা শিবপুরের মৈত্র নামে খ্যাত। শিবচন্দ্র, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের পরিচয় কিছুই জানিতেন না। তজ্জন্য ঘটকগণ এবং ভট্টগণ বিদ্রূপ করিয়া কবিতা বাঁধিয়াছিল। *

শিবচন্দ্রের বিবাহসময়ে অনেকে আপত্তি করায় রাজীব রায় কহিলেন "কাশ্যপগোত্র কুলীন ব্রাহ্মণ রাঢ়ী হইলেই চাটুর্য্যে হয়, বারেন্দ্র হইলেই মৈত্র হয়। শিবচন্দ্রকে যখন বারেন্দ্র করা হইল, তখন ইহার মৈত্র উপাধি হওয়াই উচিত। তাঁহার কথায় ফটিক দত্ত নামক একটি কায়স্থ কর্ম্মচারী কহিল "মহারাজের এ হুকুম সাফ বোধ হয় না।" রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন "আমি সাফ করিতে

---

* ঘটকের কবিতা—"খাটখুটু ঠাকুরটি গলায় রুদ্রাক্ষমালা, গাঁই গোত্র কিছু নাই রাজীব রায়ের শালা।"

ভট্ট কবিতা—"গঙ্গাপারের মৈত্র ঠাকুর গলায় রুদ্রাক্ষমালা, পরিচয় মধ্যে কেবল রাজীব রায়ের শালা।"

পারি না, তুমি ধোবা হইয়া সমস্ত সাফ কর।" * তিনি ফটিককে ধরিয়া ধোবার সহ আহার ব্যবহার করাইয়া ধোবা জাতিতে অবনত করিলেন। তদ্দৃষ্টে ভয় পাইয়া আর কেহ কোন আপত্তি করিল না।

গঙ্গারাম মৈত্র নামক একজন কুলীন ব্রাহ্মণ পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি একটি মুসলমান-কন্যাকে বৈষ্ণবী করিয়া নিজের সেবাদাসী করিয়াছিলেন। তাহার ভ্রাতা আবদুলকেও তিনি বৈষ্ণব করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি তাহাদের নাম ভূষণা ও রূপদয়াল রাখিয়াছিলেন। তাহারা তাঁহার ঘরেই থাকিত। তিনি তাহাদের স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু জল গ্রহণ করিতেন। মুসলমান কাজী এই বৃত্তান্ত জানিয়া রূপদয়ালকে হরিমন্ত্র ত্যাগ করিতে বলিলেন। রূপদয়াল কহিল "মনুষ্যের ভাষা বিভিন্ন, কিন্তু ঈশ্বর এক। যে আল্লা, সেই হরি।" কাজী কহিল "তবে তুমি আল্লা না বলিয়া হরি বল কেন?" রূপদয়াল কহিল "আমি পারসী আরবী জানি না; সমস্ত কথাই যখন বাঙ্গলা ভাষায় বলি, তখন ঈশ্বরের নাম বলিতেও হরি বলাই উচিত। যে ব্যক্তি সমস্ত কথাই পারসী আরবীতে বলে, তাহার পক্ষে ঈশ্বরকেও আল্লা বলা কর্ত্তব্য"। কাজী তর্কে পরাস্ত হইয়া, আবদুলকে হরিমন্ত্র ত্যাগে জিদ করিলেন। আবদুল সম্মত হইল না দেখিয়া, কাজী তাহার প্রাণদণ্ড করিলেন। ভূষণা ভ্রাতৃশোকে জলে ডুবিয়া মরিল। গঙ্গারাম উদাসীন হইয়া বৃন্দাবন গেলেন।

আট বৎসর পর গঙ্গারাম দেশে আসিয়া সংসারী হইতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে কোন ব্রাহ্মণ, সমাজে গ্রহণ করিতে সম্মত হইল না। গঙ্গারাম, রাজীব রায়ের শরণাগত হইল। রাজীব রায় বহু ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন এবং সভা করিয়া কহিলেন "এই গঙ্গারাম মৈত্র, ভূষণা ও রূপদয়ালসহ যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে, অদ্বৈতপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুও হরিদাসের সহিত ঠিক তদ্রূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। হরিদাস যেরূপ হরিভক্ত ছিল, রূপদয়ালও ঠিক সেইরূপ ছিল। যখন অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের সন্তান সুব্রাহ্মণ আছে, তখন গঙ্গারামকে সমাজে গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। আর জন্ম দ্বারাই জাতি হয়। কর্ম্ম দ্বারা কেবল পাপ পুণ্য হয় মাত্র। কর্ম্মজ পাপ প্রায়শ্চিত্ত করিলেই খণ্ডন হয়। গঙ্গারাম প্রায়-

---

* ভট্ট কবিতা—"জাতির কর্ত্তা রাজীব রায় মুলুকের শুবা, তার হুকুম তুচ্ছ ক'রে দত্ত হ'লেন ধোবা।"

শ্চিত্ত করিলে আপনারা তাঁহাকে সমাজে গ্রহণ করুন"। অধিকাংশ শাক্ত ব্রাহ্মণেরা রাজার অনুরোধ স্বীকার করিল না। তাহারা কহিল,—

"কেন ভাই গঙ্গারাম, আগে কল্লি হেন কাম,
কেন খালি ভূষণার পানী?
ঘরে দিলি আব্দুলে ভাত, হাড়ীতে না ছোয় পাত,
তোরে কিসে ফিরে কুলে আনি॥"

বৈষ্ণবগণ গঙ্গারামকে প্রায়শ্চিত্তান্তে সমাজে গ্রহণ করিতে সম্মত হইল। গঙ্গারাম প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ছাতিয়ান গ্রামনিবাসী কবিভূষণ চৌধুরীর কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহ সংস্রব-বিশিষ্ট কুলীনেরাই "ভূষণা পঠীর" কুলীন। উপরি উক্ত তিনটি উদাহরণ দ্বারাই সিন্দুরীয় রাজাদের সামাজিক প্রাধান্য স্পষ্ট জানা যায়। কিন্তু নবাব বা বাদশাহের দর্বারে তাঁহাদের বিশিষ্ট সম্মান ছিল না। একমাত্র নাথাই ফৌজদার ভিন্ন আর কেহ কোন বাদশাহী পদবী প্রাপ্ত হন নাই।

রাজা দেবীদাস, নামান্তরে ঠাকুর কুশলী, কুলীন ভঙ্গে কাপ হইয়াছিলেন। তিনি কালাপাহাড়ের সমকালবর্ত্তী লোক। তিনি গৌড় বাদশাহের ক্রোধ-ভাজন হইয়াছিলেন। কিজন্য সেই আক্রোশ হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে নানাপ্রকার কল্পিত গল্প আছে, তাহা উদ্ধৃত করা আমি প্রয়োজনীয় বোধ করি না। বাদশাঃ, উমরু নামক সেনাপতির অধীনে এক দল সেনা ছাতক আক্রমণ জন্য পাঠা-ইয়াছিলেন এবং তৎপ্রতি আদেশ করিয়াছিলেন যে "আঠার পুত্র সহ রাজা দেবীদাসের মাথা কাটিয়া আনিও এবং তাহাদের রমণীগণকে দাসীরূপে বিক্রয় করিও; কিন্তু যদি কেহ মুসলমান হয়, তবে তাহাকে সসম্মানে রক্ষা করিও এবং তাহাকে আয়মা দিও।" রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র কার্ত্তিক রায়, তিন দিন নগর রক্ষা করিয়া যুদ্ধে নিহত হইলে, উমরু ছাতক দখল করিলেন। রাজ-পরিবারগণ বিষ পানে জীবন শেষ করিল। রাজপুত্রদের মধ্যে ঠাকুর কেশব-নাথ রায় ও ঠাকুর কাশীনাথ রায় মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়াছিলেন। তাঁহাদের সন্তান পাবনা জেলায় আমীনপুরের মিঞা এবং ঢাকা জেলায় এলাচি-পুরের মিঞা। রাজভক্ত ভোলা নাপিত, নিজের তিন পুত্রকে রাজপুত্র বলিয়া বন্দী করিয়া, তিন জন রাজকুমারকে নিজ পুত্র বলিয়া রক্ষা করিয়াছিল। তাঁহা-

দের নাম ঠাকুর কালিদাস, ঠাকুর চণ্ডীদাস ও ঠাকুর নরোত্তম। বর্ত্তমান সমস্ত কালিয়াই গোষ্ঠীই এই তিন জনের সন্তান। এইজন্য ইঁহাদিগকে নাপ্তিয়া কালিয়াই বলে।

ঠাকুর কালিদাস, মোগলদিগের বাঙ্গলা দেশ আক্রমণ কালে তাহাদের সাহায্য করিয়া পৈতৃক রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ছাতকে রাণীদের অপমৃত্যু হেতু কালিদাস ছাতকে বাস না করিয়া বাগ নামক স্থানে বাস করিয়াছিলেন। তদ্বংশীয়েরা অদ্যাপি তথাতেই বাস করিতেছে। ছাতক নগর ঘোর জঙ্গল হইয়াছে। কালিদাসের বংশধরগণ এখন বাগের রায় নামেই পরিচিত।

হরুঠাকুর (হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী) রাজসরকারের পূজারী ব্রাহ্মণ ছিল। সে কাশ্যপগোত্রীয় কষ্টশ্রোত্রিয় রাঢ়ী ব্রাহ্মণ ছিল। ঠাকুর কার্ত্তিক রায়ের ছয় মাস বয়স্ক একটি শিশুপুত্র ছিল। রাণীরা বিষপানের পূর্ব্বে হরুঠাকুরকে ডাকিয়া সেই শিশুর প্রতিপালনের ভার তাহার উপর অর্পণ করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য প্রচুর টাকা এবং অলঙ্কার হরুঠাকুরকে দিয়াছিলেন। হরুঠাকুর সেই শিশুকে নিজ পুত্র বলিয়া রক্ষা করিয়াছিল এবং তাহার নাম ভবানীপ্রসাদ রাখিয়াছিল। হরুঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্ররূপেই ভবানীপ্রসাদের উপনয়ন হইয়াছিল এবং রাঢ়ী ব্রাহ্মণের কন্যার সহ তাহার বিবাহ হইয়াছিল। হরুঠাকুর মৃত্যুকালে ভবানী-প্রসাদের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করিয়া তাহাকে নিজের শ্রাদ্ধাদি করিতে নিষেধ করিল। ভবু নিজ পরিচয় শুনিয়া অমনি জমিদার হইতে ব্যগ্র হই-লেন। তখন টাকা দ্বারা জমিদারী খরিদের রীতি ছিল না। নবাবে চাকরী ও ডাকাতী এই দুইটি মাত্র উপায়ে তৎকালে জমিদার হওয়া যাইত। ভবানী-প্রসাদ পারসী জানিতেন না, সুতরাং প্রথম উপায় তাঁহার সাধ্য ছিল না। এজন্য তিনি কতকগুলি অনুচর যোটাইয়া ডাকাতী আরম্ভ করিলেন। তিনি চৌদ্দ বৎসর অবিচ্ছিন্ন ডাকাতী করিয়া সমস্ত পরগণা চাঁদপ্রতাপ অধিকার করিয়া "রাজা ভবানীপ্রসাদ রায়" এই উপাধি ধারণ করিলেন।

এই রাজ্যাভিষেক সময়ে ভবানীপ্রসাদ পণ্ডিতগণকে ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন যে "তাঁহার পিতার নাম কি বলিতে হইবে এবং তাঁহার গোত্রাদি কি বলিতে হইবে?" তখন পণ্ডিতেরা পাঁতি দিলেন যে "হরুঠাকুর যদি নিজের অর্থ দ্বারা তোমাকে পালন করিত, তবে তাহাকেই তোমার পিতা

বলা যাইত। কিন্তু সে তোমার পৈতৃক ভৃত্য ছিল এবং তোমারই পৈতৃক অর্থ দ্বারা তোমাকে পালন করিয়াছে ও নিজের জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছে। সুতরাং তাঁহাকে চাকর ভিন্ন পিতা বলা যায় না। কিন্তু যখন তোমার উপনয়ন বিবাহাদি রাঢ়ী ব্রাহ্মণ ও কাশ্যপগোত্র বলিয়া সেই বিধানে হইয়াছে, তখন তুমি কাশ্যপগোত্রীয় রাঢ়ী ব্রাহ্মণরূপেই গণ্য।" সেই ব্যবস্থা মতেই অভিষেকাদি যজ্ঞ হইল। সেই রাজা ভবানীপ্রসাদের সন্তানগণ জেলা ঢাকার অন্তর্গত জমিদার—রোয়াইলের রায় ও মহাদেবপুরের রায়। ইঁহারা রাজা ভবানীর বংশ বলিয়া পরিচিত। এই বংশের উপলক্ষেই লোকে "হারায়ে মারায়ে কাশ্যপগোত্র" বলে। প্রকৃত পক্ষে ইঁহারা বাৎস্যগোত্রীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। এখন কাশ্যপগোত্রীয় রাঢ়ী ব্রাহ্মণ হইয়াছেন।

বারেন্দ্র ঘটকেরা এই বংশের সম্বন্ধে বলেন "রাজা দেবীপ্রসাদের পুত্র ঠাকুর কার্ত্তিক রায়, তৎপুত্র রাজা ভবানীপ্রসাদ রায় রাঢ়ী।" আবার রাঢ়ীয় কুলজ্ঞেরা রাজা ভবানীপ্রসাদ ও তাঁহার বংশধরগণের কুলমর্য্যাদা প্রকাশ করেন, কিন্তু ভবানীপ্রসাদের পিতৃকুলের বা মাতামহকুলের কোন বৃত্তান্ত তাঁহাদের পুথিতে নাই। ভট্ট কবিগণ ঠাকুর কুশলীর বংশ সম্বন্ধে গান করেন যে—

"এক ঘর ভাঙ্গিয়া তার হলো সাত বাড়ী।
তিন ঘর বারেন্দ্র তার দুই ঘর রাঢ়ী॥
দুই ঘর মুসলমান, নষ্ট অন্য জন।
বসন্ত রায়ের বংশ বঙ্গের ভূষণ।"

অন্যান্য রাজবংশের বংশবৃদ্ধি অতি কম। প্রায়শঃ দত্তক পুত্র দ্বারা বংশরক্ষা করিতে হইয়াছে। কিন্তু কালিয়াই গোষ্ঠীর বংশ ধারাবাহিকরূপে বৃদ্ধি হইয়াছে। এখনও কালিয়াই গোষ্ঠীর জমিদারী প্রচুর আছে। কিন্তু বহু গোষ্ঠী অন্য খুব বড় জমিদার কেহই নাই।"

৭। গুগুং—সোমেশ্বর নামে একটি বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ তপস্বী, গুগুং-দুর্গাপুরে এক কালীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া অর্চ্চনা করিতেন। তাঁহার সেই বিগ্রহের নিকট পূজা দিয়া অনেক লোকের কঠিন ব্যারাম আরাম হওয়ায় পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা তাঁহাকে গুরু বলিয়া মানিত। তাঁহার পুত্র সেই সকল শিষ্যদের সাহায্যে পার্শ্ববর্ত্তী

স্থান অধিকার করিয়া রাজা হইয়াছিলেন। সেই সময়ে গারো, কুকি, খসিয়া প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা বাঙ্গলাদেশের সীমান্ত প্রদেশে উৎপাত করিত। সুসঙ্গের রাজার দ্বারা সেই উৎপাত নিবারণ হইতে পারিবে বিবেচনায়, বাঙ্গলার নবাব তাঁহাকে রাজা উপাধি দিয়া তাঁহার রাজত্ব, ক্ষমতা ও সম্মান বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। তদবধি এই বংশের করদ রাজত্ব বহুদিন পর্য্যন্ত চলিতেছিল।

ইংরেজ কোম্পানির অধিকার সময়ে লর্ড কর্ণোয়ালিস্ ইঁহাদের জঙ্গলময় রাজ্য রীতিমত জরিপ করিতে পারেন নাই। তজ্জন্য ইঁহাদের লভ্য কিংবা ক্ষমতার বিশেষ হানি হয় নাই। প্রায় ৪০ বৎসর হইল বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ইঁহাদের অধিকৃত জঙ্গল ও পর্ব্বত খাস করিয়া লইয়াছেন এবং হাতী ধরিয়া বিক্রয় করিবার ক্ষমতা রহিত করিয়াছেন। তদবধি ইঁহাদের মুনাফা অল্প হইয়াছে এবং ইঁহারা সাধারণ জমীদারের তুল্য হইয়াছেন। সোমেশ্বর প্রথমে কোন্ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা ঠিক বলা যায় না। কিন্তু রাজা হওয়া অবধি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সহ বিবাহ আদান প্রদানে বারেন্দ্র শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণরূপে গণ্য হইয়াছেন। ধনবানের কুলমর্য্যাদা সহজেই বৃদ্ধি হয়। ইঁহারা বহু কুলকার্য্য করিয়া অতি শ্রেষ্ঠ সিদ্ধশ্রোত্রিয় হইয়াছেন। কুলশাস্ত্রে এই বংশ উদয়াচল এবং আটপঠী কুলীনের নায়ক বলিয়া খ্যাত।

৮। বাহিরবন্দ—পূর্ব্বে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেরা যেমন বুদ্ধিমান্, তেমনি বীর্য্যবান্ বলিয়া গণ্য ছিল। কাঁকিনার রাজারা বারেন্দ্র কায়স্থ। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ কোচবেহার রাজ্যের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। আর ভুবন সিংহ নামক একজন উত্তররাঢ়ী কায়স্থ, আসাম রাজ্যের প্রধান সেনাপতি হইয়াছিল। রাঙ্গামাটিয়া গৌরীপুর ভুবন সিংহের চাকরান বা করদ রাজত্ব ছিল *। আসাম ও কোচবেহারের সৈন্যগণ বারংবার বাঙ্গলা দেশের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত প্রদেশ লুঠপাট করিত। তাহাদের দৌরাত্ম্য নিবারণ জন্য গৌড়

---

* আসামের নিকট উত্তররাঢ়ী কায়স্থ ছিল না। পূর্ব্বে দূরদেশে বিবাহ আদান প্রদান দুঃসাধ্য ছিল। বিশেষতঃ আসামরাজের সহ বাঙ্গালার নবাব ও বাদশাহের বিবাদ ছিল। এই জন্য ভুবন সিংহের বংশীয়েরা আসামের কলতা-কায়েত সমাজে মিলিয়াছেন। এই বংশ এখনও গৌরীপুরের রাজা।

বাদশাহ, জগৎ রায় নামক একজন শ্রোত্রিয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকে বাহিরবন্দ, ভিতর-বন্দ, পাতিলাদহ ও স্বরূপপুর এই চারি পরগণার করদ রাজা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আসামী সেনাপতি বিষ্ণুদেব বড়ুয়া বাহিরবন্দ আক্রমণ করিতে আসিলে, জগৎ রায় দুই বিপ্রদূত সহ তামার টাটে পাঁচটি হরীতকী আশীর্ব্বাদী পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে "আততায়ী নিবারণ উদ্দেশ্য ভিন্ন ব্রাহ্মণের সহ যুদ্ধ করিতে কোন হিন্দুর অধিকার আছে কি না?" আসামী পণ্ডিতেরা কহিলেন "গৌড় বাদশাঃ মুসলমান, এই রাজ্য তাঁহারই অধিকৃত। ব্রাহ্মণ জগৎ রায় তাঁহার চাকর মাত্র; সুতরাং তাহা লুণ্ঠনে দোষ নাই। বাঙ্গালী পণ্ডিতেরা কহিলেন "জগৎ রায় চাকর নহেন। তিনি বংশানুক্রমে ভোগ দখলের স্বত্বাধিকারী রাজা। গৌড়ের মুসলমান বাদশাঃ রাজার নিকট নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব পান মাত্র। লাভ নোক্‌সান জন্য ফলভাগী রাজা জগৎ রায় ব্রাহ্মণ। সুতরাং এই রাজ্য লুণ্ঠন করিলে ব্রহ্মস্ব হরণ করা হইবে।" আসামী পণ্ডিতেরা বাঙ্গালী পণ্ডিত সহ তর্কে পরাস্ত হইলেন। বিষ্ণুদেব সসৈন্যে ফিরিয়া গেলেন। সেই মীমাংসা শুনিয়া কোচবেহারের রাজাও বাহিরবন্দ আক্রমণ করেন নাই।

ইংরেজ রাজ্যারম্ভের পর বাহিরবন্দ রাজা ও রাজবংশ বিলুপ্ত হইয়াছে। এই রাজ্যের শেষ মালিক রাণী সত্যবতীর নিকট হইতে বলিহারের রাজা ভিতর-বন্দ পরগণা পাইয়াছেন। বাহিরবন্দ পরগণা কাশীমবাজারের রাজা পাইয়াছেন। পাতিলাদহ কলিকাতার প্রসন্নকুমার ঠাকুরের এবং স্বরূপপুর রাণী রাসমণির জমিদারী ভুক্ত হইয়াছে।

৯। চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের বৃত্তান্ত এই পুস্তকেই স্থানে স্থানে লিখিত হইয়াছে।

১০। যশোহর—এই বংশের বৃত্তান্তও লিখিত হইয়াছে। এই দুই রাজবংশ বঙ্গজ কায়স্থ ছিল। এই উভয়ই এখন বিলুপ্ত হইয়াছে।

১১। দিনাজপুর—রঙ্গপুর জেলার বর্দ্ধনকুঠীর রাজারা অতি পুরাতন জমিদার। ইঁহারা বারেন্দ্র কায়স্থ। কিন্তু ইঁহাদের রাজোপাধি মুসলমান বা ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত নহে। ইঁহাদের প্রচুর সম্পত্তি বা বিক্রম ছিল না। ইহাদের কোন প্রসিদ্ধ কীর্ত্তি নাই, এজন্য ইঁহাদিগকে বারভুঁইয়া মধ্যে গণ্য করা হয় না। দেবকীনন্দন ঘোষ নামে একজন উত্তররাঢ়ী কুলীন কায়স্থ, এই বর্দ্ধন-

কুঠীর রাজার চাকরী করিতেন। তাঁহার পুত্র হরিরাম, নামান্তরে দিনরাজ ঘোষ কল্যাণী নামে একটি যুবতীকে বিবাহ করিয়া গৌড়বাদশাঃ গণেশনারায়ণ খাঁর প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। কল্যাণীর উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনটি বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়।

(১) কল্যাণী এক সন্ন্যাসীর পালিত কন্যা। তাহার পূর্ব্বপুরুষের কোন বৃত্তান্ত জানা যায় না। সন্ন্যাসীর অনুরোধে সম্রাট্ গণেশ, দিনরাজকে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দিনরাজ স্বীয় গুণে সম্রাটের প্রিয়পাত্র এবং উন্নত পদস্থ হইয়াছিলেন।

(২) কল্যাণী, সম্রাট্ গণেশ খাঁর দাসীগর্ভজাতা কন্যা। গণেশ তাহাকে হরিরামের সহিত বিবাহ দিয়া, দিনরাজ ঘোষ নাম দিয়া উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

(৩) কল্যাণী বর্দ্ধনকুঠীর রাজা আজাবলের কন্যা। তাহাকে বিবাহ করিয়া হরিরাম বর্দ্ধনকুঠীর জমিদারীর সাত আনা অংশ পাইয়াছিলেন। তাহার পর গৌড়বাদশাহের চাকরী করিয়া উন্নত হন।

কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, কল্যাণীর কল্যাণেই দিনরাজের উন্নতির সোপান হইয়াছিল। তিনি ক্রমে ক্রমে সম্রাট্ যদুনারায়ণ খাঁর পেস্কার হইয়াছিলেন। যদু মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে দিনরাজ কর্ম্ম এস্তাফা দিলেন। যদু কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বিনীতভাবে কহিলেন "মহারাজ যত দিন ব্রাহ্মণ গুরু ছিলেন, তত দিন আমি হুজুরকে দেবতা জ্ঞানে সেবা করিয়াছি। এখন আপনি স্পর্শ করিলে আমার অন্নজল নষ্ট হইবে। সে কথা আমি বলিতে পারিব না। সুতরাং আমার দূরে থাকাই উচিত।" যদু সেই কথা শুনিয়া লজ্জিত হইয়া কহিলেন "তোমার মত বিশ্বস্ত ও সুযোগ্য লোককে আমি ত্যাগ করিতে পারি না। তুমি দূরে থাকিতে চাও, আমি তাহাই করিতেছি। আমি তোমাকে উত্তর বাঙ্গলার নবাব নিযুক্ত করিলাম। তুমি নবাব ও সেনাপতি হইয়া পার্ব্বত্য জাতির উৎপাত হইতে সেই দিক্ রক্ষা কর।" এই নবাবীপ্রাপ্তি অবধি দিনরাজের ঘোষ উপাধি লুপ্ত হইয়া রায় উপাধি হইল। দিনরাজ যেখানে গিয়া বাস করিয়াছিলেন, তাহারই নাম "দিনরাজপুর" হইয়াছিল। উত্তর বাঙ্গলার লোকে শব্দের আদ্য "র"কার উচ্চারণ করে না। এজন্য তাহারা ঐ স্থানকে দিন-আজ-

পুর বলিত। তাহা হইতেই দিনাজপুর জেলার নাম হইয়াছে। সেই স্থান বর্ত্তমান দিনাজপুর সহর হইতে প্রায় দশ ক্রোশ উত্তরে ছিল।

দিনরাজের পর তৎপুত্র শুকদেব রায় নবাব হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সর্ব্বদা বিপদ্‌গ্রস্ত ছিলেন, তজ্জন্য সুখী হইতে পারেন নাই। কোচবেহারের মহারাজ অতি প্রবল হইয়া বারংবার দিনাজপুর রাজ্য লুঠ করিয়াছিলেন। অবশেষে রাজধানী দিনাজপুর লুঠ করিয়া অগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত করিয়াছিলেন। কালাপাহাড়ের ভয়ে শুকদেব জঙ্গল মধ্যে লুক্কায়িত থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে মোগলেরা বাঙ্গলাদেশ অধিকার করিলে, মোগল ও উজবক সর্দ্দারেরা দিনাজপুর প্রদেশের দক্ষিণভাগে বহুদূর পর্য্যন্ত আপনাদের জাগীরভুক্ত করিয়া লইয়াছিল। ফলতঃ শুকদেবের অধিকৃত স্থান অল্প ছিল, শত্রু অনেক ছিল, সুতরাং অবস্থা মন্দ ছিল।

তদভাবে তৎপুত্র প্রাণনাথ রায় কোন সনন্দ না লইয়া স্বকৃত নবাব হইলেন। তিনি ভাগ্যবান্ লোক ছিলেন। তিনি সৈন্য বৃদ্ধি করিয়া কোচদিগকে পরাজয় করিয়া, নিজ এলাকার উত্তর ভাগ পুনরায় অধিকার করিয়াছিলেন। মোগল ও উজ্‌বক সর্দ্দারগণ বিদ্রোহ অপরাধে জাগীর হইতে বিচ্যুত হইলে, প্রাণনাথ, কতক পরগণা শুকদেবের সনন্দ ক্রমে, কতক বা বলপূর্ব্বক নিজ এলাকাভুক্ত করিয়াছিলেন। জেলা দিনাজপুর সম্পূর্ণ, এবং রঙ্গপুর, বগুড়া, রাজসাহী, মালদহ ও পূর্ণিয়া এই পাঁচ জেলার কতক অংশ তাঁহার শাসনাধীন ছিল। তিনি নবলক্ষের রাজা বলিয়া বিখ্যাত অর্থাৎ তাঁহার বার্ষিক মুনাফা নয় লক্ষ টাকা ছিল। যখন সমস্ত জিনিষ সস্তা ছিল, যে সময়ে কোচবেহারের মহারাজের মোট রাজস্ব সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ছিল, সেই সময়ে প্রাণনাথ রায়ের নয় লক্ষ টাকা লভ্য থাকায় বোধ হয় তিনিই তখন বাঙ্গলা দেশের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান জমিদার ছিলেন।

নবাব প্রাণনাথ রায় যে স্থানে কোচ সেনা পরাজয় করিয়াছিলেন, সেই স্থানেই রাজধানী করিয়াছিলেন। সেই স্থানের নাম তিনি "বিজয়নগর" রাখিয়াছিলেন। কিন্তু দিনাজপুরের নবাবের বসতি জন্য ঐ স্থানের নামই দিনাজপুর হইয়াছিল। তাহাই বর্ত্তমান দিনাজপুর সহর। পুরাতন দিনাজপুর কান্তনগরের নিকটে ছিল।

কোচদিগের সহ প্রাণনাথের বিবাদ সর্ব্বদা চলিতেছিল। তজ্জন্য বোধ হয়

সৈনিক ব্যয়ও প্রচুর পড়িত। রাজা মানসিংহ সহ কোচবেহারাধিপতির যুদ্ধোদ্যম হইলে নবাব প্রাণনাথ রায়, ঠাকুর ভানুসিংহের ও রাজা মানসিংহের সমস্ত রসদ যোগাইয়াছিলেন এবং সৈন্য দ্বারাও সাহায্য করিয়াছিলেন। পরে যখন মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ সহ মানসিংহের সন্ধি ও কুটুম্বিতা হইল, তখন রাজা মানসিংহ প্রাণনাথকে তাঁহার শাসনাধীন স্থানের করদ রাজা বলিয়া সনন্দ দিলেন এবং কোচবেহারাধিপতির সহ রাজা প্রাণনাথের পাগড়ী বদল করাইয়া উভয়ের বন্ধুতা করাইয়া দিলেন। তদবধি দিনাজপুর ও কোচবেহারের রাজবংশে বরাবর বন্ধুতা চলিয়া আসিতেছে। এই সন্ধি হওয়ার পর রাজা প্রাণনাথের আর কোন প্রবল শত্রু থাকিল না। সুতরাং তিনি দান বিতরণ, জলাশয় খনন ও দেবমন্দির নির্ম্মাণ প্রভৃতি বহু সৎকর্ম্মে প্রচুর ব্যয় করিয়াও যথেষ্ট টাকা সংস্থান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

প্রাণনাথ রায়ই সর্ব্বপ্রথমে ভূমিতে বংশানুক্রমিক স্বত্ববান্ রাজা বলিয়া সনন্দ পাইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা পিতামহ কেবল নবাব অর্থাৎ অস্থায়ী শাসনকর্ত্তা মাত্র ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় দিনাজপুরের ইতিহাসে হরিরাম ঘোষের নবাবী প্রাপ্তি অবধিই তাঁহাকে ও তৎপুত্র শুকদেব রায়কে রাজা বলিয়া লিখিত হইয়াছে। কোন হিন্দু বড় লোক উজির, দেওয়ান্, নবাব বা ফৌজদার নিযুক্ত হইলে তাঁহাকে রাজা বলিবার রীতি ছিল। আর বৃহৎ জমিদার—যাঁহার গবর্ণমেণ্টে রাজা উপাধি নাই, তাঁহাকেও রাজা বলিবার রীতি ছিল। বোধ হয় সেই রীতিক্রমেই সংস্কৃত ইতিহাসে প্রাণনাথের পূর্ব্ববর্ত্তী নবাবদিগকেও রাজা বলিয়া লেখা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা বাদশাহী সনন্দ প্রাপ্ত রাজা ছিলেন না। মানসিংহ জাহাঁগীর বাদশাহের নিকট যে কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি স্পষ্ট জানাইয়াছেন যে "রাজস্ব বৃদ্ধি ও সুশাসন জন্য দিনাজপুরের নবাবকে সেই প্রদেশের রাজা নির্ব্বাচন করা হইয়াছে"। প্রাণনাথের রাজত্ব গঙ্গার ধার হইতে কোচবেহার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং মালগুজারী একলক্ষ টাকা মাত্র ছিল।

প্রাণনাথ রায়ের পুত্র রাজা রামনাথ রায় অতি ভাগ্যবান্ লোক ছিলেন। তিনি জঙ্গল মধ্যে প্রচুর টাকা পাইয়া সম্পত্তি আরো বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। সম্রাট্ জাহাঁগীর ও শাঃজেহান মানসিংহ কৃত বন্দোবস্তে কোন আপত্তি করেন নাই। ঔরংজীব সম্রাট্ হইয়া রাজা রামনাথকে দিল্লীতে তলপ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার রাজত্ব প্রাপ্তির

কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। রাজা কহিলেন "দিনাজপুর প্রদেশের অবস্থা অতি-মন্দ। তাহা হইতে লক্ষ টাকা মালগুজারী কদাচ শুবাদারের নিকট ইর্শাল হইত না। শুবাদার আমাকে স্থায়ী স্বত্ব দিয়া মালগুজারী অতিশয় বেশী করিয়াছেন, তাহা দেওয়া আমার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়াছে।" যে সকল কারণে রাম-নাথের আয় বৃদ্ধি ও ব্যয় কম হইয়াছিল, সম্রাট্ তাহা জানিতে পারিলেন না। তিনি আমদানী বহিতে দেখিলেন যে, মানসিংহ কৃত বন্দোবস্তের পূর্ব্বে দিনাজপুর প্রদেশ হইতে কথন ত্রিশ হাজার টাকার বেশী ইর্শাল হয় নাই। সুতরাং এই বন্দোবস্তই লাভজনক জানিয়া সম্রাট্ তাহাই স্থির রাখিলেন এবং সনন্দ ও খেলাত দিয়া রামনাথকে বিদায় করিলেন। রামনাথ দিল্লী যাওয়া কালে পথিমধ্যে বৃন্দা-বনে মানস করিয়াছিলেন যে "নিজের রাজত্ব স্থায়ী থাকিলে তিনি বৃন্দাবনের মন্দির অপেক্ষা উত্তম মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ স্থাপন করিবেন"। সেই প্রতিজ্ঞা মত রাজা রামনাথ কান্তজীর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। রাজা রামনাথ রায়, মন্দির সমাপ্ত করিয়া বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই কান্তজীর মন্দির এই রাজবংশের একটি মহাকীর্ত্তি এবং বাঙ্গালী শিল্পের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। সন ১৩০৩ সালের ভূমিকম্পে এই মন্দির স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

দেওয়ান মুর্শিদকুলী খাঁ রাজা রামনাথের মালগুজারী বৃদ্ধি ও ক্ষমতা হ্রাস করিয়াছিলেন। মালগুজারী বাকীর জন্য রাজার ভ্রাতা কুমার রাধানাথ রায়কে ধরিয়া মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন। তিনি মুসলমান হইলে বাকী রাজস্ব মাফ হইল এবং তিনি পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত সূর্য্যপুর পরগণা জমিদারী রূপে পাইলেন। কৃষ্ণগঞ্জের মুসলমান রাজারা সেই রাধানাথ রায়ের বংশধর।

রাজা রামনাথের পুত্র বৈদ্যনাথের সহ নাটোরের প্রথম রাজা রামজীবনের বিবাদ ঘটিয়াছিল। কিন্তু রামজীবনের ভ্রাতা রঘুনন্দন সহ রাজা বৈদ্যনাথের বন্ধুতা হওয়ায় বিবাদ মীমাংসা হইয়াছিল। রাজা বৈদ্যনাথের সহ পুনরায় কোচবেহারের মহারাজার বন্ধুতা হইয়াছিল। বৈদ্যনাথের রাজত্বকালে নবাব মীরকাশীম, রাজার মালগুজারী বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। পরিশেষে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ রাজস্ব অত্যন্ত বৃদ্ধি করেন এবং সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা রহিত করেন। তদবধি দিনাজপুরের রাজা সাধারণ জমিদার-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

রাজা বৈদ্যনাথের পুত্র রাজা রাধাকান্ত নিতান্ত নির্ব্বোধ ছিলেন, তজ্জন্য লোকে তাঁহাকে "গাধাকান্ত" বলিত। তাঁহারই সময়ে একটি পরগণা ভিন্ন সমস্ত জমিদারী নীলাম হইয়াছিল। গাধাকান্ত ঘরে বাহিরে সর্ব্বজন কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া সংসার ত্যাগ করতঃ গঙ্গাবাস করিতে গিয়াছিলেন। তৎপুত্র গোবিন্দনাথ নাবালক থাকায় সুযোগ্য অভিভাবকেরা বিবিধ উপায়ে অধিকাংশ সম্পত্তি পুনরায় উদ্ধার করিয়াছিলেন। তাহাই এ পর্য্যন্ত আছে। তিন ঘর বুনিয়াদি কায়স্থ রাজবংশ মধ্যে চন্দ্রদ্বীপের ও চন্দনার (যশোহরের) রাজবংশ বিলুপ্ত হইয়াছে। একমাত্র দিনাজপুর রাজবংশই বিদ্যমান আছে, তজ্জন্য কায়স্থ সমাজে এই রাজবংশের সম্মান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

১২। রাজশাহী—কেদারেশ্বর মুখটি নামক একজন বংশজ রাঢ়ী ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি বিবাহ করেন নাই। তাঁহার একটি বৈষ্ণবী সেবাদাসী ছিল। কেহ বলেন, সেই বৈষ্ণবী কায়স্থকন্যা, কেহ বলেন গোপ-কন্যা বা মুসলমান-কন্যা। পূর্ব্বে মুসলমান-কন্যা বহুসংখ্যক বৈষ্ণবী হইত, বিশেষতঃ হিন্দুর উপপত্নী হইলে মুসলমান-কন্যারা প্রায় সকলেই বৈষ্ণবী হইত। মুসলমান ধর্ম্ম মতে স্ত্রীজাতির পরমাত্মা নাই, সুতরাং পরকাল নাই। মৃত্যু দ্বারাই তাহাদের শরীর ও জীবন শেষ হয়। তাহাদের সৎকর্ম্ম বা কুকর্ম্মে কেবল ঐহিক প্রশংসা বা নিন্দা হইতে পারে, তদ্ভিন্ন অন্য কোন ফল নাই। এই জন্য কোন মুসলমান পুরুষ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলে মুসলমান রাজ্যে তাহার কঠিন দণ্ড হইত, অথচ মুসলমান রমণী অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাহার কোন দণ্ড হইত না। মুখটি ঠাকুরের সেবাদাসী যে কোন জাতীয়া বৈষ্ণবী হউক, তাহার পুত্র লালা রামগোবিন্দ, গৌড় বাদশাহের খাসমুনসী হইয়া রাঢ়দেশে রাজশাহীদিগর নামে চারি পরগণা একত্র করিয়া একচাকলারূপে পাইয়াছিলেন। তাঁহার রাজা উপাধি হইয়াছিল। সাঁওতাল, ধাঙ্গড় ও চুহাড়দিগের আক্রমণ নিবারণ জন্য ইহাদের সৈন্য রাখিতে হইত, এজন্য ইহাদের বৃহৎ জমিদারীর রাজস্ব অতি কম ছিল। এই রাজবংশ ধনবান্ এবং পরাক্রান্ত ছিল। ইঁহাদের স্থাপিত কালীমন্দির দৃষ্টে অনুমান হয় যে, রাজা হওয়ার পর ইহারা সর্ব্বথা বৈষ্ণব ছিলেন না। কালা-পাহাড়ের দৌরাত্ম্যে ইহারা জঙ্গলে পলাইয়াছিলেন। মোগল রাজ্যারম্ভে ইহারা পুনরায় পূর্ব্ব জমিদারী পাইয়াছিলেন। ইঁহারা আপনাদিগকে রাঢ়ীব্রাহ্মণ বলিতেন।

কিন্তু রাঢ়ীব্রাহ্মণেরা তাহা স্বীকার করিতেন না। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা কখন "লালা" উপাধি ধারণ করিতেন না। এই বংশের লালা উপাধি দ্বারাই স্পষ্ট জানা যায় যে, ইঁহারা সুব্রাহ্মণ মধ্যে গণ্য ছিলেন না। অথচ ইঁহারা দরিদ্র রাঢ়ী ব্রাহ্মণের কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করিতেন এবং তদ্রূপ রাঢ়ীব্রাহ্মণের পুত্রসহ কন্যার বিবাহ দিতেন। এই বংশীয় রাজা উদয়নারায়ণ, মুর্শিদকুলী খাঁর অত্যাচারে রাজ্য-চ্যুত হইলে তাহাদের জমিদারী ও রাজা উপাধি নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রামজীবন রায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাই নাটোর রাজবংশের প্রথম সম্পত্তি জন্য নাটোরের রাজাদিগকে রাজশাহীর রাজা বলে।

এই বারভূঁইয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনটি মুসলমান সর্দ্দারের উল্লেখ দেখা যায়; যথা—(১) ডুমরাই, (২) ভাওয়াল, (৩) আটিয়া। তাঁহাদের বিবরণ এই যে (১) নবাব তোগবলবেগ পূর্ব্ববঙ্গ অধিকার করিলে, নাজিরুদ্দীন গিল্‌জীকে পূর্ব্বদক্ষিণ বাঙ্গালার শরীক নিযুক্ত করিয়া ডুমরাই ও নখিলা এই দুই পরগণা জাগীর দিয়াছিলেন। এই বংশীয়েরা বহুকাল যশোর ও ফরিদপুরের কতক অংশে জাগীরদার ও জমিদাররূপে প্রভুত্ব করিয়াছিলেন। অবশেষে ইঁহাদের সমস্ত সম্পত্তি সীতা-রাম রায় দখল করিয়াছিলেন।

(২) বৈদ্য রাজবংশ নিঃশেষ সময়েই ফজলগাজী নামক একজন মুসল-মান সর্দার ভাওয়াল পরগণা জাগীর পাইয়াছিল। এই বংশীয়েরা অতিশয় গোঁড়া মুসলমান ছিল এবং প্রায় কেহই লেখা পড়া জানিত না। জয়দেবপুরের মুখো-পাধ্যায়েরা ইহাদের বংশানুক্রমে দেওয়ান ছিলেন। সুযোগ্য মুসলমান না পাওয়ায় ইহারা অগত্যা হিন্দু কর্ম্মচারী রাখিয়াছিল। মোগল অধিকারে ইহাদের জাগীরে রাজস্ব ধার্য্য হওয়ায় ইহারা জমিদার হইয়াছিল। মুর্শিদকুলীখাঁর আমলে বাকি রাজস্ব জন্য ইহাদের জমিদারী নীলাম হওয়ায়, জয়দেবপুরের মুখোপাধ্যায়গণ তাহা খরিদ করিয়া "রায়" উপাধি গ্রহণ করেন। এই পরগণায় অধিকাংশ জঙ্গল ছিল। ক্রমে ক্রমে অধিকাংশ জঙ্গল পরিষ্কৃত হইয়া বসতি হওয়ায় এবং কাষ্ঠের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় এই পরগণার মুনাফা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। তজ্জন্য এখানকার জমিদার ক্রমশঃ রাজা, মহারাজা উপাধি পাইয়াছেন। নীলকরদের সহ রীতিমত যুদ্ধ করিয়া এই রাজবংশ অতিশয় সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। এই বংশের বদা-ন্যতাও প্রসিদ্ধ।

(৩) আটিয়া—বর্ত্তমান জেলা মৈমানসিংহ মহকুমা টাঙ্গাইলের অন্তর্গত পরগণা আটিয়া একজন মুসলমান ফকীরের জাগীর ছিল। সেই পরগণার মধ্যে বাথুলির বিশ্বাসগণ সম্ভ্রান্ত তালুকদার ছিলেন। সেই বিশ্বাসদের বাটীতে "কচুয়া" নামে একটি দরিদ্র মুসলমান বালক গোরুর রাখালী করিত। রৌহার ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য্য সেই বিশ্বাসদিগের কুটুম্ব এবং জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কচুয়াকে দেখিয়া তাহার সুলক্ষণ দৃষ্টে বলিলেন যে "এই বালক রাজা হইবে। যদি বিশ্বাসেরা এখন ইহার উপকার করেন, তবে কচুয়া ও তদ্বংশীয় জমিদার দ্বারা বিশ্বাসদের বহু প্রত্যুপকার হইবে।" বিশ্বাসেরা সেই কথা বিশ্বাস করিয়া কচুয়াকে পারসী পড়িতে দিল এবং নিজ ব্যয়ে তাহাকে এবং তাহার জননীকে পালন করিতে লাগিল। কচুয়া পারসী শিখিলে তাহার নাম "কচে আলি" হইল। কচে আলি আটিয়ার ফকীরের চাকরী পাইল। ফকীরের অন্তিম সময়ে সে এবং তাহার মাতা ফকীরের যথাসাধ্য সেবা শুশ্রূষা করায় ফকীর তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি কচে আলি ও তাহার মাতাকে দিয়াছিলেন। কিন্তু বাদশাহী সচিব কচে আলিকে নিষ্কর জাগীর ভোগ করিতে না দিয়া পরগণার উপর মালগুজারী ধার্য্য করিলেন। তদবধি কচে আলি জমিদার হইয়া খাঁ উপাধি ধারণ করিলেন এবং বাথুলির বিশ্বাসদিগকে প্রধান কার্য্যকারক নিযুক্ত করিলেন। মোগল সম্রাটদের অধীনে কচে আলি খাঁর সন্তানেরা ফৌজদার ও মনসবদার ছিলেন এবং আটিয়া পরগণার সীমা প্রচুর বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। মুর্শিদ কুলী খাঁর কঠোর মালগুজারী বন্দোবস্তে বাঙ্গলা ও বেহারের প্রায় সমস্ত মুসলমান জমিদারেরই জমিদারী নীলাম হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু বাথুলির বিশ্বাসদিগের প্রযত্নে আটিয়ার জমিদারের সম্পত্তি রক্ষা পাইয়াছিল। দেলদুয়ারের মিঞারা সম্ভ্রান্ত সৈয়দ। তাঁহারা আটিয়ার খাঁদিগের দৌহিত্র সূত্রে এই বৃহৎ পরগণার কিয়দংশ পাইয়া জমিদার হইয়াছেন। ইংরেজ রাজত্বে আটিয়া পরগণার কতকাংশ ঢাকার নবাবদিগের অধিকারভুক্ত হইয়াছে। আর অল্প কিছু অংশ ধনবান্ হিন্দুরা খরিদ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে আটিয়ার খাঁ সাহেবেরা অনেক অতিরিক্ত জমিদারী তালুক ইত্যাদি ক্রয় করিয়া সে ক্ষতিপূরণ করিয়াছেন। হিন্দুদের সহ এই বংশীয়দের যতদূর সদ্ভাব আছে এবং ছিল, অন্য কোন মুসলমান বড় মানুষের সহ হিন্দুদের ততদূর হয় নাই। আর দেলদুয়ারের মিঞাদের তুল্য সম্ভ্রান্ত মুসলমান বাঙ্গলা, বেহার, উড়িষ্যায় আর দেখা যায় না। করটিয়ার মিঞারাই কচে আলি খাঁর পুত্রের বংশধর।

রাজা তোড়রমল কৃত বন্দোবস্ত।

রাজা তোড়রমল পঞ্জাবী ক্ষেত্রি বা ক্ষত্রিয় ছিলেন। তিনি দিল্লীতে সামান্যরূপ বাণিজ্য ব্যসসায় করিতেন। আকবরের নাবালকী সময়ে নবাব খানখানান বেহ্‌রাম খাঁ খাদ্যদ্রব্যে বিষ দিয়া আকবরকে অপহত্যা করিতে উদ্যোগ করিয়াছিলেন। বেহ্‌রামের এক দাসী তোড়রমলের উপপত্নী ছিল। তোড়র সেই দাসীর যোগে সেই চক্রান্ত জানিয়া আকবরের জননী নিয়ামত বেগমকে সংবাদ দিয়াছিলেন। তদন্তে চক্রান্ত ধরা পড়িল, সুতরাং সম্রাটের প্রাণরক্ষা হইল। ইহাতেই তোড়রমলের উন্নতি হইল এবং আকবরের হিন্দুপ্রীতি সঞ্চার হইল। তিনি হিন্দুদের প্রতি যতই অধিকতর বিশ্বাস করিতে লাগিলেন, ততই বেশী উপকার পাইতে লাগিলেন। তাঁহার মুসলমান জ্ঞাতিকুটুম্বেরা বিদ্রোহী হইলেও আকবর হিন্দুদের সহায়তায় রক্ষা পাইয়াছিলেন। আকবরের হিন্দুয়ানী, মুসলমানী ও খৃষ্টানী বহু পত্নী ও উপপত্নী ছিল, কিন্তু আকবর কখন হিন্দু বেগমের ঘরে ভিন্ন অন্যের ঘরে নিদ্রা যাইতে সাহসী হইতেন না। ইহাই মোগল রাজত্বে হিন্দুদিগের উন্নতির কারণ। রাজা তোড়রমল আকবরের দেওয়ান হইয়া ঠিক হিন্দুরীতিক্রমে জরিপ জমাবন্দি করিয়াছিলেন এবং হিন্দু রাজ্যশাসনপ্রণালী অধিকাংশ মোগল দর্বারে প্রচলিত করিয়াছিলেন। তৎকৃত বন্দোবস্তের বিস্তৃত বিবরণ যাহা পাইয়াছি, তাহা এই যে—

(১) আম্বের, যোধপুর প্রভৃতি প্রদেশীয় মহারাজগণ—যাঁহারা মোগল সম্রাটের অধীন ছিলেন, রাজা তোড়রমল তাঁহাদিগকে বশী রাজা গণ্য করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের রাজ্যের জরিপ জমাবন্দি না করিয়া কেবল তাঁহাদের উপর একটি নির্দ্দিষ্ট কর ধার্য্য করিয়াছিলেন, অধিকন্তু তাঁহারা সম্রাটের আবশ্যক মতে কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সেনা সহ সম্রাটের আদিষ্ট যুদ্ধকার্য্যে সাহায্য করিতে বাধ্য ছিলেন। যিনি যে পরিমাণ সৈন্য দিতে বাধ্য ছিলেন, তিনি সেই পরিমাণ সেনার মন্‌সবদার উপাধি পাইতেন।

(২) অপর জমিদারগণকে তোড়রমল করদ রাজা গণ্য করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের জমিদারী জরিপ করিয়া বিভিন্ন প্রকার জমির পৃথক্ পৃথক্ পরিমাণ নিরূপণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে যেরূপ "হাত" জরিপে ব্যবহৃত হইয়াছিল,

তাহার দৈর্ঘ্য ইংরেজী ২২½ ইঞ্চি *। সেই হাতের ১০০ হাত দীর্ঘ এবং ১০০ হাত প্রস্থ ভূমিকে এবং কুলা, কুড়া বা বিঘা বলা যাইত। দীর্ঘে বেশী প্রস্থে কম হইলেও যদি মোট পরিমাণে ১০০০০ বর্গহস্ত হইত, তাহাও এক কুড়া বলিয়া গণ্য হইত। এক কুড়ার ১/২০ বিশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ৫০০ বর্গ হস্তে এক বিশোয়া হইত। আবার তাহার ১/২০ অংশে অর্থাৎ ২৫ বর্গহস্তে এক ধুল বা ধুর হইত। একহাত দীর্ঘ এক হাত প্রস্থ জমিকে অর্থাৎ এক বর্গহস্ত ভূমিকে এক কৌণী ধরা হইত। থাক বস্তার নিয়মে জরিপ করিয়া নক্শা তৈয়ারি করা হইয়াছিল এবং তাহার চিঠাপৈঠা তৈয়ারি করা হইয়াছিল। সেই চিঠাপৈঠাতে জমিদারের প্রত্যেক প্রজার কি প্রকারের কত পরিমাণ জমি আছে, তাহা লিখিত হইয়াছিল। বিল, পুষ্করিণী, দীঘী, ইন্দারাগুলি জলা জমি বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। নদী ও বৃহৎ হ্রদগুলি জলকর নামে অভিহিত হইত।

(৩) ভারতবর্ষীয় জমিতে সাধারণতঃ দুই বৎসর ভাল রূপ শস্য হয়। তৃতীয় বর্ষে শস্য কিছু কম হয় এবং চতুর্থ বর্ষে অত্যন্ত কম হয়। ফলতঃ সকল বৎসরে শস্য সমান হয় না। গড় পরতায় চারি বৎসরের লভ্য একুন করিয়া তাহার ¼ চতুর্থাংশ রাজা তোড়রমল প্রত্যেক কৃষিক্ষেত্রের বার্ষিক লভ্য ধরিয়াছিলেন। সেই লভ্যের ⅙ ষষ্ঠাংশ তিনি প্রজার দেয় রাজস্ব ধার্য্য করিয়াছিলেন। জলকর, ফলকর, বনকর ও ধনকরের পাঁচ বৎসরের লভ্যের ⅕ পঞ্চমাংশ বার্ষিক লভ্য ধরিয়া তাহার ⅙ ষষ্ঠাংশ রাজস্ব ধার্য্য করিয়াছিলেন। শিল্পী, বণিক্, দালাল, মহাজন, গোপ, চিত্রকর, বেশ্যা, গায়ক প্রভৃতি ব্যবসায়ীদিগের লভ্যের নাম ধনকর। এইরূপ রাজস্ব যাহা জমিদার মোট আদায় করিবেন, তাহার নাম সুমার জমা (মোট সংস্থা)। হিন্দু শাস্ত্রমত করদ রাজারা মোট সংস্থার ১/১০ ভাগ পাইতেন। রাজা তোড়রমল সেই স্থলে সুমার জমার ⅓ তৃতীয়াংশ জমিদারের প্রাপ্য নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। বাকি ⅔ ভাগ সম্রাটের প্রাপ্য ছিল।

(৪) জমিদারের অধীনে যে সকল তালুকদার ছিল, তাহারা উপরি উক্ত নিয়মে নিজ প্রজার নিকট যাহা আদায় করিবে, তাহার ⅓ তৃতীয়াংশ তাহারা পাইবে। অবশিষ্ট ⅔ অংশ জমিদারকে দিবে। আবার জমিদার সেই টাকার

* সেই ২২½ ইঞ্চি হাতই তখন প্রচলিত ছিল। তদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, তখন মনুষ্যদের আকৃতি বৃহৎ ছিল।

⅙ তৃতীয়াংশ নিজে পাইবেন, বাকি ⅚ ভাগ অর্থাৎ তালুকদারী জমির সুমার জমার ⁴⁄₉ ভাগ সম্রাটের প্রাপ্য ছিল।

ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ প্রজার সহ দেওয়ান তোড়রমলের বন্দোবস্ত দেখিয়া অনুমান করেন যে, আকবরের সময়ে জমিদার তালুকদার প্রভৃতি মধ্যবর্ত্তী ভূম্যধিকারী ছিল না। কিন্তু তাহা ভুল। আকবর ও অন্যান্য মুসলমান সম্রাটের আমলে সমস্ত দেশই জমিদার ও তালুকদারগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইত। সম্রাট্‌দের খাস দখলী কোন ভূমি ছিল না। তোড়রমল যে প্রজা সহ রাজস্ব ধার্য্য করিয়াছিলেন, জমিদারগণের সংস্থা নিরূপণ করাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। অধিকন্তু জমিদার ও তালুকদারগণ প্রজার নিকট অতিরিক্ত খাজনা না লইতে পারে, ইহাও অন্যতর অভিপ্রায় ছিল। রাজা তোড়রমল যেমন জমিদার, প্রজা এবং সম্রাটের হিতকর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী কেহই তদ্রূপ করিতে পারেন নাই। এমন কি, আধুনিক ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট বারংবার প্রজা ভূম্যধিকারী সম্বন্ধীয় আইন সংশোধন করিয়াও ততদূর উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত করিতে সমর্থ হন নাই। এখন বহুব্যয় করিয়া মকদ্দমা করতঃ প্রজা ও জমিদার সর্ব্বস্বান্ত হয়, অথচ যথোচিত সুফল লাভ করিতে পারে না। তোড়রমল-কৃত বন্দোবস্তে অতি সহজে বিনা ব্যয়ে সম্রাট্, জমিদার এবং প্রজার উচিত স্বার্থ রক্ষা হইত।

ইংরেজী ইতিবৃত্তবেত্তারা আরো বলেন যে, মোগল সাম্রাজ্যে জমিদারেরা কেবল করসংগ্রাহক কর্ম্মচারী মাত্র ছিল। ইংরেজের আমলে লর্ড কর্ণোয়ালিস্ সাহেব জমিদারদিগকে মালিকী স্বত্ব দিয়াছেন। তাহাও ভুল। জমিদারেরা পূর্ব্বেও পুরুষানুক্রমিক ভূম্যধিকারী ছিলেন এবং তাঁহাদের ক্ষমতা অনেক বেশী ছিল। তখন শান্তিরক্ষার ভার জমিদারের উপর ছিল এবং তাঁহাদের বিচারাধিকার ছিল। তৎকালে তাঁহারা সর্ব্বাংশেই করদ রাজা ছিলেন। কিন্তু জমি দান বিক্রয়াদি দ্বারা হস্তান্তর করিবার স্পষ্ট ক্ষমতা জমীদার বা প্রজার ছিল না। কেননা জমিদারগণের যে সকল ক্ষমতা ছিল, তাহাতে হস্তান্তর করিতে ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে না। আবার প্রজাদিগকে জমি হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা দিলে তাহারা মহাজন কিংবা বিপক্ষ জমিদারের নিকট জমি বিক্রয় করিয়া অনেক অনিষ্ট ঘটাইতে পারিত। এই জন্য হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা স্পষ্টরূপে কাহাকেও প্রদত্ত হইত না। অথচ যেখানে কোন আপত্তির কারণ না থাকিত, সেখানে

প্রজা জমি হস্তান্তর করিলে জমিদারগণ গ্রহীতাকে প্রজারূপে স্বীকার করিয়া লইতেন। তেমনই জমিদার নিজ জমিদারী অন্য কোন সুযোগ্য লোককে দিলে, নবাব ও সম্রাট্‌গণ গ্রহীতাকে জমিদার বলিয়া সনন্দ দিতেন। এইরূপে নির্দ্দোষ হস্তান্তর প্রচলিত ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট জমিদারগণের রাজকীয় ক্ষমতা সমস্তই হরণ করিয়াছেন, সুতরাং জমিদারী সমস্ত বা আংশিক হস্তান্তর করিতে কোন বাধা দেওয়া আবশ্যক হয় না। শুবে বাঙ্গলা ও বেহারের বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ শেষ হইবার পূর্ব্বেই রাজা তোড়রমল দিল্লীতে আহূত হইয়াছিলেন। নায়েব দেওয়ান রাজা কংশনারায়ণ রায় বন্দোবস্ত শেষ করিয়া চিঠাপৈঠা এবং নক্‌সা সম্রাটের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। তাহাতে শুবে বাঙ্গলার রাজস্ব ৬৭,০০,০০০ সাতষট্টি লক্ষ এবং শুবে বেহারের রাজস্ব ৪০,০০,০০০ চল্লিশ লক্ষ, মোট এক কোটি সাত লক্ষ টাকা সম্রাটের বার্ষিক প্রাপ্য হইয়াছিল। সম্রাট তুষ্ট হইয়া রাজা কংশনারায়ণকে খেলাত ও দেওয়ানী সনন্দ দিয়াছিলেন।